বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য

মুহম্মদ মতিউর রহমান

লেখক পরিচিতি

মুহম্মদ মতিউর রহমান-এর জন্ম ৩রা পৌষ, ১৩৪৪(১৯৩৭ ইং) সন, সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শাহজাদপুর থানার চর বেলতৈল গ্রামে। পিতা মরহুম আবু মুহম্মদ গোলাম রব্বানী, মাতা মরহুমা মোছাম্মৎ আছুদা খাতুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৬২ সনে এম.এ. (বাংলা) পাশ করেন।

কর্মজীবনে তিনি সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, ঢাকা, সা'দৎ কলেজ, করোটিয়া, টাঙ্গাইল, ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা, দৈনিক সংগ্রাম, দুবাই চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, দুবাই, ইউ.এ.ই.-তে চাকরি করেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাহিত্য কথা (১৯৭০) ভাষা ও সাহিত্য (১৯৭০), সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৭১), মহৎ যাদের জীবন কথা (১৯৮৯), ইবাদতের মূলভিত্তি ও তার তাৎপর্য (১৯৯০), ফররুখ প্রতিভা (১৯৯১), বাংলা সাহিত্যের ধারা (১৯৯১), বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন (১৯৯২), ইবাদত (১৯৯৩), মহানবী (স) (১৯৯৪), ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৯৫), মহানবীর (স) আদর্শ সমাজ (১৯৯৭), ছোটদের গল্প (১৯৯৭), Freedom of Writer (১৯৯৭)।

অনুবাদ ঃ ইরান (১৯৬৯), ইরাক (১৯৬৯), আমার সাক্ষ্য (১৯৭১)।

সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ প্রবাসী কবিকণ্ঠ (১৯৯৩), প্রবাসকণ্ঠ (১৯৯৪), ভাষা সৈনিক সংবর্ধনা স্মারক (২০০০)।

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ ঃ সাহিত্য-চিন্তা, সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ, স্মৃতিকথা, মানবাধিকার ও ইসলাম।

শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মুহম্মদ মতিউর রহমান ১৯৯৬ সনে "বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল", দুবাই কর্তৃক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

বাংলা সাহিত্যে
মুসলিম ঐতিহ্য
মুহম্মদ মতিউর রহমান
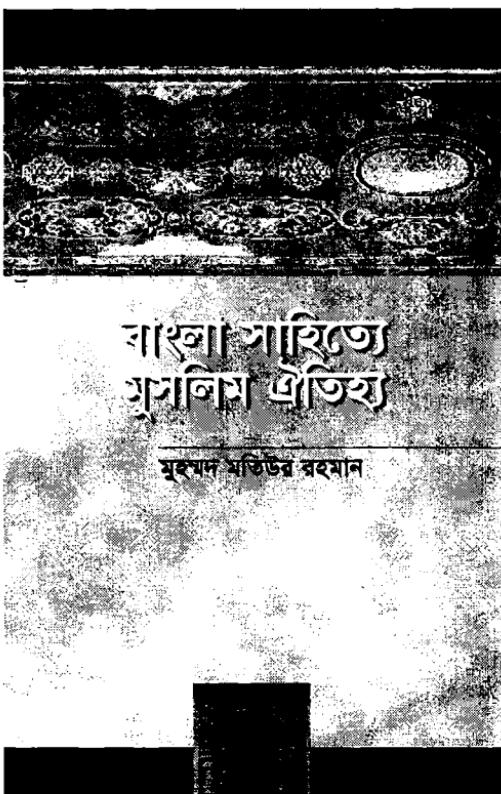
বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য

মুহম্মদ মতিউর রহমান

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে বৌদ্ধ পাল রাজাদের আমলে। সে সময় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোহা বা চর্যাপদে বৌদ্ধধর্ম, ভাব ও আচার-আচরণের বিষয় স্থান লাভ করে। পরবর্তীতে রচিত মঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণব কাব্য ইত্যাদিতে হিন্দুধর্ম, দর্শন ও জীবনাচার প্রতিফলিত হয়। মুসলিম আমলে ইসলামী ভাব, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে লেখা আর একটি বলিষ্ঠ জীবনবাদী সাহিত্য-ধারার বিকাশ ঘটে। মুসলিম শাসনামলের সাড়ে পাঁচ শো বছরে এ ধরনের এক বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ বিশাল সাহিত্যের যথাযথ সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন হয়নি। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থটি কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ নয়, বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা এবং বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে এ ধারার উল্লেখযোগ্য কয়েকজন লেখক সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা ভাষার উদ্ভব পাল যুগে হলেও পরবর্তীতে সেন আমলে দেশীয় ভাষা বাংলা চর্চার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয় এবং বাংলা সাহিত্যের সকল নিদর্শন ধ্বংস করা হয় বা অবলুপ্ত হয়। ঐ সময়কার একমাত্র সাহিত্য-নিদর্শন চর্যাপদ যা আবিষ্কৃত হয় বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ১৯২১ সনে নেপালের রাজ-দরবার থেকে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবজন্ম ঘটে মুসলিম শাসনামলে মুসলিম রাজা-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায়। অতএব, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য আমাদের গর্ববোধ যেমন রয়েছে তেমনি এই ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে আমাদের নিরলস তৎপরতার বিষয় আলোচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে গ্রন্থটি কোন ধারাবাহিক আলোচনা নয়, নির্বাচিত কয়েকজনকে নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসাবে লেখা। তাই স্বভাবতই এ বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা এখানে অনুপস্থিত।

লেখক নিজে একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ হিসাবে ছাত্রছাত্রী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের চাহিদার কথা বিবেচনা করে গ্রন্থটি রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। আশা করি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রমে সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে এটি উপাদেয় বিবেচিত হবে।

এ কে এম নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

সূচী

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য

কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা তাঁদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন তাঁদের সৃষ্টি-কর্মে। অনুভূতি ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই প্রত্যেকের সৃষ্টি-কর্মেই একটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। অনুভূতির সাথে অভিজ্ঞতার সম্পর্ক অবিভাজ্য। অভিজ্ঞতার মধ্যেই ব্যক্তিগত অনুভূতির জন্ম, অথবা বলা যায়, অনুভূতির পুষ্প-কোরক বিকশিত হয় অভিজ্ঞতার কাননে। অভিজ্ঞতা আবার দুই রকম। একটি হলো ব্যক্তিগত ও সমকালীন, অন্যটি সমষ্টিগত ও চিরন্তন। কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টি-কর্মে এ দুই রকম অভিজ্ঞতারই প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। তবে মহৎ ও বড় কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা ব্যক্তি ও সমকালীন অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সমষ্টিগত ও চিরন্তন বা যুগাতীত অভিজ্ঞতার জারক-রসে তাঁদের সৃষ্টি-কর্মকে সুসমৃদ্ধ করে তোলেন। তাই তাঁদের আবেদনও ব্যক্তি বা সমকালকে অতিক্রম করে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী বা কালাতীতকে স্পর্শ করে।

মহৎ বা কালজয়ী কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে সমষ্টিগত জীবন-ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি ঘটান। সমকালীন জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁরা যুগ-চিত্ত বা যুগধারাকে উপলব্ধি করেন। বর্তমানটাই সব নয়; বহু যুগের, দীর্ঘ বিস্তৃত অতীতের অভিজ্ঞতা, সাধনা-সংগ্রাম ও অর্জনের উপর বর্তমানের চির চঞ্চল ভিৎ সংস্থাপিত। আজ যা বর্তমান, কাল তাই অতীত। এভাবে আমাদের জীবন ও অভিজ্ঞতা গড়িয়ে চলছে অন্তহীন ভবিষ্যতের দিকে। ভবিষ্যতও প্রতিনিয়ত তার অবগুণ্ঠন মুক্ত করে দিয়ে বর্তমান হয়ে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাই এক অর্থে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোন সুনির্দিষ্ট সীমরেখা নেই। এক চিরায়ত মহাকাল সর্বব্যাপী হয়ে সব কিছুকে ধারণ করে আছে। এই মহাকালের অনন্ত বিস্তার ও অভিজ্ঞানকে বলা যায় ঐতিহ্য। মানুষ যেমন তার নিজেকে অস্বীকার করতে পারে না, ঐতিহ্যকে অস্বীকার করাও তেমনি দুঃসাধ্য। তবে এ ঐতিহ্যকে কেউ সজ্ঞানে সচেতন উপলব্ধির মধ্যে প্রবলভাবে অনুভব করেন, কেউ হয়ত

এ সম্পর্কে উদাসীন থাকেন, সজ্ঞান উপলব্ধির মধ্যে তাঁরা প্রবলভাবে এটাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এটা ব্যক্তিগত শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও চর্চার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। তবে ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। যাঁরা সজ্ঞানে এটা অনুসরণ করেন তারা অবশ্যই মহৎ ও উন্নত সৃষ্টি উপহার দিতে সক্ষম হন আর যারা এটাকে অস্বীকার করেন মূলতঃ তাঁদের সৃষ্টি প্রায়শই সাময়িকতার উর্ধে উঠতে সক্ষম হয় না। এ সম্পর্কে ইংরেজ সমালোচক Sampson-এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"An artist of the first rank accepts tradition and enriches it; an artist of the lower rank accepts tradition and repeats it; an artist of the lowest rank rejects tradition and strives for originality".

অর্থাৎ প্রথম সারির শিল্পীরা ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেন ও তাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন, দ্বিতীয় সারির শিল্পীরা ঐতিহ্য গ্রহণ করেন ও তার পুনরাবৃত্তি করেন এবং তৃতীয় সারি অর্থাৎ নিম্নস্তরের শিল্পীরা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নিজেদের মৌলিকত্ব বিকাশে যত্নবান হন।

মৌলিকত্ব বিকাশ বা স্বকীয়তা প্রকাশের প্রচেষ্টা কোন খারাপ বা নিন্দনীয় কাজ নয়। ঐতিহ্যকে স্বীকার বা অনুসরণ করেও এটা সম্ভব। কিন্তু ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে এটা করার অর্থ নিজের অস্তিত্বের মূল ভিত্তিটাকেই অস্বীকার করা। গাছের গোড়া কর্তন করে তার শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব বৃদ্ধির প্রত্যাশা করা যেমন অবান্তর, ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে স্বকীয়তা বিকাশের চেষ্টাও অনেকটা তেমনি পন্ডশ্রমের সমতুল্য। তাই দেখা যায়, সকল দেশে সব যুগে সব বড় কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীই কোন না কোন ঐতিহ্যের শুধু অনুসারীই নয়, নিজ নিজ ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে তাঁরা তাঁদের অমর সৃষ্টি-কর্মে ব্রতী হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বাংলাদেশে ইসলাম-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা প্রয়োজন। বাংলাদেশে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত গুপ্ত রাজবংশের রাজত্বকাল। এ সময় হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বিশেষ প্রচার ও প্রসার ঘটে। গুপ্তযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব হয়নি। সুতরাং ঐ যুগে বাংলা-সাহিত্যে প্রতিফলিত ঐতিহ্যের আলোচনার প্রশ্নও অবান্তর। গুপ্ত যুগের অবসান ঘটলে বৌদ্ধ পাল রাজাদের রাজত্বকাল শুরু হয়। পাল আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। তবে এই আমলে রচিত চর্যাপদ ছাড়া বাংলা সাহিত্যের আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। চর্যাপদ রচনা করেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। এতে বাংলাদেশের নদী-নালা, প্রকৃতি, মানুষ, মানুষের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, দুঃখ-বেদনা-আনন্দের কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং সর্বোপরি গূঢ়ার্থে বৌদ্ধধর্মের কথা নানা উপমা, রূপক ও ইঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এ সময় বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্পকলায়

বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময়কার সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে হিন্দুধর্মের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, হিন্দু-বৌদ্ধধর্মের একটা মিলিত বা সংকর প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ সাধারণ জন-জীবনে তথা গ্রামীণ বা লোকজ সমাজ-সংস্কৃতিতে এ মিশ্র বা সংকর প্রভাব ছিল অনেকটা ব্যাপক। ফলে শুধু সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রেই নয়, ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রেও একটি সমন্বিত ধারার সৃষ্টি হয়, যেটা সূক্ষ্ম অর্থে বৌদ্ধ ধর্মও নয়, হিন্দু ধর্মও নয়। বরং উভয় ধর্মের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের সাথে লোকজ চিন্তা-ভাবধারা, রীতি-নীতি, আচার-অনুশীলন সংমিশ্রিত হয়ে এটা এক নতুন ধর্মমতের রূপ লাভ করে। স্থান-কাল ভেদে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হলেও মূলতঃ এটার সাধারণ পরিচয় হলো এটা লোকজ ধর্ম। অতএব, পাল-যুগে বাংলাদেশের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তিনটি ধারা বা ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। তা হলো ঃ

এক) বৌদ্ধ ঐতিহ্য
দুই) হিন্দু ঐতিহ্য
তিন) লোকজ ঐতিহ্য

অষ্টম শতাব্দী থেকে আর একটি ক্ষীণ ধারা বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে ক্রমশঃ অনুপ্রবিষ্ট হতে শুরু করে, তা হলো ইসলামী ধারা। প্রথমতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আরব বণিকদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকা বিশেষতঃ চট্টগ্রাম ও দ্বীপাঞ্চল এলাকাগুলোতে ধীরে ধীরে ইসলামের প্রচার শুরু হয়। দ্বিতীয়তঃ আরব দেশ থেকে বিভিন্ন সময় ধর্ম-প্রচারক, পীর-দরবেশ-আউলিয়াগণ ঐ সময় থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এসে ইসলামের প্রচার শুরু করেন। তবে সঠিক তত্ত্ব-তথ্যের অভাবে ঐ সময় ইসলামের প্রচার-প্রসার কতটা হয়েছিল এবং তৎকালীন বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তার প্রভাব কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ঐ সময় ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়তো তেমন ব্যাপকতা লাভ করেনি, ফলে তৎকালীন সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তার সুস্পষ্ট কোন প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়নি। অথবা এও হতে পারে যে, পরবর্তীকালে সেন আমলে ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছু যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তখন সেই সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের সব কিছুও হয়ত ধ্বংস করা হয়েছিল। সেন-ব্রাহ্মণদের জাতিগত স্বভাব, অন্য ধর্মের প্রতি তাদের বিদ্বেষপরায়ণতা ও হিংসাত্মক মনোভাবই এরূপ অনুমান-আন্দাজের একমাত্র ভিত্তি।

একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে আগত সেন বংশীয় আর্য-ব্রাহ্মণগণ বাংলায় রাজত্ব বিস্তার করেন। তারা বৌদ্ধ ধর্ম, বৌদ্ধদের শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য নৃশংসভাবে ধ্বংস করে। বৌদ্ধদেরকেও পাইকারীভাবে হত্যা করে। অনেকে প্রাণভয়ে পার্বত্য অরণ্যানী অঞ্চল ও দেশের বাইরে বর্মা, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, চীন প্রভৃতি দেশে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করে। অনেকে নিরুপায় হয়ে নিজ ধর্ম ত্যাগ

করে নীচ জাতীয় হিন্দু হিসাবে জীবন রক্ষা করে। ফলে পাল আমলের সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-ভাস্কর্য-স্থাপত্য ইত্যাদি অনেক কিছু থেকেই আমরা বঞ্চিত হই।

সেন আমলে রাজ-ভাষা ছিল সংস্কৃত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কারো সংস্কৃত চর্চা ও বেদ পাঠের অধিকার ছিল না। ফলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শ্রেণীর হিন্দুদের (অহিন্দুদের তো প্রশ্নই উঠে না) ধর্ম-চর্চা, বেদ-পাঠ, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা বা জ্ঞান-চর্চার কোন সুযোগই ছিল না। অপরদিকে সংস্কৃত ব্যতীত অন্য ভাষার চর্চা নিষিদ্ধ করা হয়। সাধারণ মানুষ ধর্ম-চর্চা, জ্ঞান-চর্চা, মাতৃভাষার চর্চা ও মেধা বিকাশের সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। একমাত্র ব্রাহ্মণদের পদসেবা ও বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের আদেশ শিরোধার্য করাই সাধারণ মানুষের ধর্ম-কর্ম-কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হতো। এ অবস্থা সম্পর্কে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান বলেন ঃ

"দেশের জনসাধারণ এইভাবে প্রথমে মাতৃভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ হারাইল। মাতৃভাষার পরিবর্তে যে ভাষার মহিমা তাহাদের কাছে কীর্ত্তিত হইল সে ভাষারও চর্চ্চা করিবার অধিকার সকলে পাইল না। নূতন বিদেশী ভাষা (সংস্কৃত) দেশের জনসাধারণকে শিখাইবার উপযুক্ত শিক্ষায়তন স্থাপিত হইল না। যাহা হইল তাহা শুধু শ্রেণী বিশেষের জন্য। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় জনসাধারণের কোন বক্তব্য না থাকায় চিন্তা হইতে তাহারা অব্যাহতি পাইল। শাস্ত্র বাক্য ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়া বিনা তর্কে মানিয়া লইবার অভ্যাসের ফলে বুদ্ধি ও কল্পনার উৎকর্ষ হইতে পারিল না। সুতরাং দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে তাহাদের কোনরূপ কৃতিত্বই সম্ভব হইল না।" (নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস ৩য় প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-২১৩)।

সেন আমলে বহিরাগত সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট চর্চা হয়। বলা বাহুল্য, সেটা শুধু ব্রাহ্মণদের দ্বারা, অন্য কারো এই ভাষার চর্চা করার কোন অধিকার ছিল না। আবার সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষা চর্চার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা ছিল। দেশীয় ভাষা বাংলা সম্পর্কে আর্য-ব্রাহ্মণদের নিষেধাজ্ঞা ছিল এরূপ ঃ 'নম্লেচ্ছ ভাষা শিক্ষেত'– অর্থাৎ ম্লেচ্ছ ভাষা শেখা নিষেধ। অতএব, সেন আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও বিকাশ ঘটার আদৌ কোন সুযোগ ছিল না। অবশ্য শাসক ও পুরোহিত শ্রেণীর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও মাতৃভাষা বা মুখের ভাষাকে নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করে রাখা যায় না। তাই দেখা যায়, সমাজের নিম্নস্তরে দেশীয় ভাষার চর্চা হয়েছে এবং এক ধরনের সাহিত্যের বিকাশও ঘটেছে, তবে তা ছিল নিতান্ত অরুচিকর, অমার্জিত ও প্রায়ই স্থূল যৌন উত্তেজনাকর অশ্লীলতায় পূর্ণ।

সেন আমলে বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে সংস্কৃত সাহিত্যকেই বুঝাতো এবং যার চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল ব্রাহ্মণ শাসক, পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত ও কবিদের মধ্যে। সেন রাজাদের মধ্যে বল্লাল সেন ও তদ্বীয় পুত্র লক্ষণ সেন সংস্কৃত ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন

এবং তাঁরা প্রত্যেকে একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি শরণ, ধোয়ী, উমাপতিধর, গোবর্ধন, জয়দেব প্রমুখ সকলেই সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করেন। গোবর্ধন 'আর্যাসপ্তদশী' জয়দেব 'গীতগোবিন্দ', কবীন্দ্র ধোয়ী 'পবনদূত' ইত্যাদি কাব্য রচনা করে অমরত্ব লাভ করেন। লক্ষ্মণ সেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ভারতখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত হলায়ূধ। তিনি ব্রাহ্মণ সর্বস্ব এবং মৎস্যসূক্ত ভিন্ন মীমাংসাসর্বস্ব ও পণ্ডিতসর্বস্ব রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য পন্ডিতদের মধ্যে পুরোষত্তম, পশুপতি ও ঈশান বিখ্যাত। এভাবে দেখা যায়, সেন আমলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হয়। সে ভাষা-সাহিত্যের সাথে সাধারণ জনগণের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই ভাষা-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ, আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। এমন কি, সাধারণ হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়ও এতে বিধৃত হয়নি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করার কোন সুযোগই তখন ছিল না। তাই যথার্থই সেন আমলকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য চরম বন্ধ্যাত্ব ও অন্ধকার যুগ রূপে আখ্যায়িত করা হয়।

আরব বণিকদের মাধ্যমে ভারতের উপকূলবর্তী এলাকায় মহানবীর (স) সময় থেকেই ইসলাম প্রচার শুরু হয়। ঐ সময় মালাবার রাজ্যের (বর্তমান কেরালা) হিন্দু রাজা চেরুমল স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহানবীর (স) দরবারে হাজির হয়ে সদলবলে ইসলাম কবুল করেন। (দ্রষ্টব্য ঃ শায়খ জয়নুদ্দীন/তুহ্ফাতুল মুজাহিদীন ফী বা'যে আহওয়ালিল বারতাকালীন)। আরব বণিকগণ তখন বাংলাদেশের দ্বীপাঞ্চল হয়ে সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত তাদের বাণিজ্য পোত নিয়ে যেতো। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত আব্বাসীয় খলীফা হারুন আল রশীদের (৭৮৬-৮০৯ ঈসায়ী) নামাঙ্কিত মুদ্রা থেকে বাংলাদেশের সাথে তৎকালীন বাংলাদেশের সাথে আরব বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ মেলে। (দ্রষ্টব্য ঃ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক/পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম)। ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ও আট শতকের গোড়ার দিকে তৎকালীন ভারত তথা বাংলাদেশের সাথে আরব বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। (দ্রষ্টব্য ঃ ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়/ বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৮৭-৮৮)। আরব ভৌগোলিকদের বর্ণনায় বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে সমন্দর নামক একটি বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইবনে খুরদাবা (মৃত্যুঃ ৩০০ হিজরী) তাঁর 'আল মাসালিক ওয়াল সামালিক' গ্রন্থে বলেনঃ "কামরুত (কামরূপ) থেকে সমন্দরে চন্দন কাঠ মিষ্ট পানির মাধ্যমে (নদীপথে) পনের-বিশ দিনের মধ্যে আনীত হয়।" আল ইদ্রিসী (মৃত্যু ঃ ৫৪৯ হিজরী) তাঁর 'নুযহাতুল মুশতাক' গ্রন্থে বলেন ঃ "সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্য-কেন্দ্র ও সমৃদ্ধশালী স্থান।" (দ্রষ্টব্য ঃ বাংলাদেশে ইসলাম/আব্দুল মান্নান তালিব, পৃ. ৬৬-৬৭)।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডক্টর আব্দুল করীম এ সমন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে অভিন্ন বলে প্রমাণ করেছেন। (ডক্টর আব্দুল করীম/চট্টগ্রামে ইসলাম, পৃ. ৪-১৫)। ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুর রহীম বাংলার উপকূল ভাগে আরব বণিকদের আগমন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর বলেছেন, চাটগাঁয়ের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীন, এমন কি,

চাটগাঁ নামটাও তাদেরই দেয়া। 'শাতি-উল-গঙ্গ' (গঙ্গার শেষ প্রান্ত বা উপদ্বীপ) তা থেকে কালক্রমে চাটগাঁও-এ রূপান্তরিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য ঃ ড. মু. আ. রহীম/Social and Cultural History of Bengal)। এভাবে আরব বণিকদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে ইসলামের প্রচার হয়েছে।

অন্যদিকে, ৭১২ ঈসায়ীতে ১৭ বছরের তরুণ মুসলিম সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধুতে মুসলিম শাসন কায়েমের পর পাঞ্জাবসহ পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম শাসন ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হয়। এরপর ইসলাম প্রচারক অলিআল্লাহ, পীর-দরবেশগণ উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় দ্বীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ভারত অভিযান ও উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে মহানবীর (স) দুটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে, এ হাদীসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই বিভিন্ন মুসলিম যোদ্ধা ও আউলিয়া-দরবেশগণ এদেশে আগমন করেন। প্রসঙ্গত উক্ত হাদীস দুটি এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

হযরত সওবান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে দুটি সেনাদলকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। এর একটি হচ্ছে হিন্দ আক্রমণকারী সেনাদল, অন্যটি হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালামের সহযোগী সেনাদল।" (নাসায়ী, কিতাবুল জিহাদ ও মুসনাদে আহমদ)।

দ্বিতীয় হাদীসটির বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে হিন্দ অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। অতএব, সে সময় অবধি আমি জীবিত থাকলে তাতে অবশ্যই আমার ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করতে দ্বিধা করবো না। এতে যদি আমি নিহত হই তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হব, আর যদি আমি নিরাপদে ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাব।" (নাসায়ী)

উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের প্রেক্ষিতে, আগেই উল্লেখ করেছি, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকেই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম-প্রচারকগণ আগমন করেন। তবে তাঁদের বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তবে তা কতটা ইতিহাস-নির্ভর এবং কতটা কিংবদন্তী-নির্ভর সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়াও অনেকটা দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশে এ সব ধর্ম-প্রচারকদের সম্পর্কে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি ঃ

"একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বকালে চট্রগ্রাম জেলা, ময়মনসিংহ জেলার মদনপুর, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও, পাবনা জেলার (বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলা) শাহজাদপুর, বগুড়া জেলার মহাস্থান, মালদহ জেলার পাভুয়া ও দেওকোট এবং বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট প্রভৃতি স্থান ছিল ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র। এ আমলে যে সকল সুফী ও মুজাহিদ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন তন্মধ্যে প্রধান কয়েকজন হচ্ছেন ঃ (১) শাহ সুলতান বল্‌খী, (২) শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, (৩) বাবা আদম শহীদ, (৪) মখদুম শাহদৌলা শহীদ, (৫)

শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিজী (৬) শাহ নেয়ামতুল্লাহ বুতশিকন, (৭) শাহ মাখদুম রূপোশ ও (৮) শায়খ ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ।" (বাংলাদেশে ইসলাম/ আব্দুল মান্নান তালিব, পৃ. ৭৭)।

একদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ফলে মানুষ শান্তি, সাম্য, কল্যাণ ও তৌহিদের বিপ্লবী মুক্তি-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে লাগলো অন্যদিকে, শতধা-বিচ্ছিন্ন, দুঃসহ অনাচার, মনুষ্যত্বহীন রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও সর্বোপরি ব্রাহ্মণ শাসক ও পুরোহিতদের অমানুষিক অত্যাচারে জন-জীবন তখন অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এ সময়কার জন-জীবনের দুঃসহ চিত্রের একটা পরিচয় ফুটে উঠেছে ত্রয়োদশ শতকের বৌদ্ধ কবি রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ' কাব্যের 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কবিতায়। কবি বলেনঃ

জাজপুর পুরবাদি, সোল শঅ ঘর বাদি
বৌদি লয় কন্নএ নগুন।
দক্ষিণা মাগিতে জায়, জার ঘরে নাহি পায়
শাপ দিয়া পোড়ায় ভুবন॥
মালদহে লাগে কর, ন চিনে আপন পর
জালের নাহিক দিশপাশ।
বলিষ্ঠ হইআ বড় দশ বিশ হৈয়্যা জড়,
সদ্ধমীরে করএ বিনাশ॥
বেদে করি উচ্চারণ রেব্যাঅ অগ্নি ঘন ঘন,
দেখিআ সভায় কম্পমান।
মনেত পাইআ মর্ম, সভে বোলে রাখ ধর্ম,
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ॥
এইরূপে দ্বিজগণ, করে ছিষ্টি সংহরণ,
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম, মনেত পাইয়া মর্ম
মায়াত হইল অন্ধকার॥

বাংলার জনগণের যখন নানা দিক দিয়ে এরূপ দৈন্যদশা তখন দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে শিহাবুদ্দিন মুহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করে উত্তর ভারতে মুসলিম রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, মুহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু জয়ের পর (৭১২ ঈসায়ী) সেখানে মুসলমানদের শাসন কায়েম হয়। ধীরে ধীরে সেটা পাঞ্জাবসহ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রসারিত হয়। মোহাম্মদ ঘোরীর পর কুতুবুদ্দীন আইবেক দিল্লীর শাসনকর্তা হয়ে বিহার অধিকার করে মুসলিম শাসনকে তৎকালীন গৌড়-অধিপতি লক্ষণ সেনের রাজ্য-সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কুতুবুদ্দীন আইবেকের সহযোগিতায় তুর্কী বীর ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ খলজী ১২০৪ ঈসায়ীতে মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ লক্ষণ সেনের নদীয়াস্থ রাজ-প্রাসাদ অতর্কিতে

আক্রমণ করে বাংলায় মুসলিম রাজত্ব কায়েম করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীন সিরাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে খল্‌জীর জীবন-বৃত্তান্ত ও অসম সাহসিকতার সাথে তাঁর বাংলা অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। (এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্যঃ ডক্টর আব্দুল মমিন চৌধুরী ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ও আব্দুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম)।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পর সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এক ব্যাপক ও সর্বাত্মক পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম শাসনামলে বাঙালীরা ধর্মের ক্ষেত্রে পেল অসংখ্য জাতি-ভেদ বিশিষ্ট, মানুষের মনগড়া প্রথা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম বা ধর্মসমূহের পরিবর্তে স্রষ্টার মনোনীত এক উন্নত সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিপূর্ণ মানবিক ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম। সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তারা পেল ইসলামের সাম্য, শান্তি, ন্যায়নীতি ও সকল প্রকার অন্যায়, পাপাচারমুক্ত এক কল্যাণময় সমাজ, যেখানে মানুষ একমাত্র তার মহান স্রষ্টার গোলাম, অন্য কারো নয়। এভাবে, মানুষের এক অসাধারণ মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। সংস্কৃতি বলতে আগে যেখানে ছিল অশ্লীল গান-বাজনা, অবাধ যৌন-সম্ভোগ ও কামোত্তেজনাকারী নানাবিধ কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং নীতি-নৈতিকতাবিবর্জিত আচার সেখানে তার পরিবর্তে ইসলাম নিয়ে এল স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস, পরকালের প্রতি আস্থাপূর্ণ এক পরিচ্ছন্ন, নির্মল, সুরুচিপূর্ণ সুষ্ঠু জীবনাচারবিশিষ্ট এক উন্নত মানবিক সংস্কৃতি যার স্পর্শে সমগ্র জীবনায়নে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সংঘটিত হলো। মুসলিম শাসনের পূর্ব পর্যন্ত সংস্কৃতির নামে যেসব গান-বাজনা হতো সে সম্পর্কে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ

"These songs, however, generally speaking related to pastural life with all its crude love-makings. The tantrics not only became steeped in sexual vices but were dreaded for inhuman cruelties committed in the name of religion.... Vicious Tantrics offered human sacrifices to Kali and danced with swords in hands before her image in horrid ecstacy."

এ ধরনের পাপাচারক্লিষ্ট, শোষণ-নিপীড়নমূলক একটি দুর্দশাগ্রস্ত সমাজে মুসলমানদের শাসন কায়েম হবার সাথে সাথে সমাজের সর্বক্ষেত্রে যে একটি পরিবর্তনের শুভ সূচনা হলো তাতে সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হলো। তারা প্রাণভরে এই পরিবর্তনকে অভিনন্দন জানালো। এ সময়কার একটি কবিতায় এর খানিকটা পরিচয় বিধৃত হয়েছে। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

ধর্ম্ম হৈলা জবনরূপি   মাথা এত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরুচ কামান
চাপিয়া উত্তম হয়   ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম॥

নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেত দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা এক মন
আনন্দেত পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বার
আদম হৈল সুলপানি
গণেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা
আগুনি চন্ডিকা তিহুঁ হৈলা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হল্যা বিবি নূর
জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে এক মন
প্রবেশ করিল জাজপুর।

এভাবে মুসলিম শাসনামলের শুরুতে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মে যে পরিবর্তনের হাওয়া প্রবাহিত হয় তার একটি বর্ণনা উপরোক্ত কবিতায় পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবজন্ম ঘটে। সেন আমলে যে ভাষার কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল, যে ভাষায় সাহিত্য চর্চা নিষিদ্ধ ছিল, মুসলিম শাসনামলে সে ভাষা ও সাহিত্য অর্গলমুক্ত হয়ে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের অপূর্ব সুযোগ লাভ করে। মুসলিম রাজা-বাদশাগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এ সম্পর্কে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ

"ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ ভাষা গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইঁহারা 'সর্ব্বনেশে' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্য ইঁহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এদিকে গৌড়েশ্বরগণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীর-এর ন্যায় পদাবলী প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইত।... এই সমৃদ্ধ সভাগৃহে বঙ্গভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল?... আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর সুকুমার সেন যে সত্য আড়াল করার চেষ্টা করেছেন, ডক্টর দীনেশ চন্দ্র কিছুটা ইতস্ততঃ করে হলেও সে সত্য উদ্‌ঘাটনে কুণ্ঠাবোধ করেননি। পরে অবশ্য তিনি নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সাথেই বলেন ঃ "It was the Muslim Sultan rather than the Hindu raja that encouraged

vernacular literature."— অর্থাৎ 'হিন্দু নৃপতিগণ নয়, মুসলিম সুলতানগণই মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ প্রদান করেছেন।' তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরো বলেনঃ

"হিন্দু রাজাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকলে বাংলা ভাষা রাজ-দরবারে স্থান লাভ করার কোন সুযোগই পেতো না। এমনিভাবে মুসলমান শাসক ও আমির-ওমরাহ্‌র পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহের ফলে হিন্দু জমিদাররাও বাঙ্গালী কবিদের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে অনুপ্রাণিত হন।" (দীনেশ চন্দ্র সেন ঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৭৩–৭৫)।

এ প্রসঙ্গে ঐতিহসিক ডক্টর এম.এ. রহীম বলেন ঃ "এটা খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা যে, মুসলমান শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায়, যাদের নিজেদেরই একটা সমৃদ্ধিশালী ভাষা ছিল, তারা তাদের প্রজাসাধারণের ভাষা বাংলাকে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় ইসলামের উদারতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং মুসলিম শাসকদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে। ইসলাম সকল মানুষের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরেছে এবং মুসলমান শাসকবৃন্দ এই মহান আদর্শ সমুন্নত রেখেছিলেন।" (ডক্টর এম.এ. রহীমঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃ. ২৫০)

মুসলমান শাসক তথা ইসলামের এ ঔদার্য অনেক হিন্দু ঐতিহাসিক উল্লেখে দ্বিধা করলেও ডক্টর দীনেশচন্দ্র তা অকপটে স্বীকার করে তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ সময়ে হিন্দু সমাজের ধোপা, নাপিত, ঝাড়ুদার, গোয়ালা, মালী প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরাও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে নিজেদের খ্যাতিমান করার সুযোগ পায়। শুধু মুসলিম কবিগণ নয়, অমুসলিম এমন কি, উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের হাতে নিগ্রহ ভোগকারী অন্তজ শ্রেণীর কবিরাও মুসলিম শাসকদের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। দীনেশ চন্দ্রের এরূপ স্পষ্ট ভাষণের ভিত্তি হলো সেকালের রীতি অনুযায়ী কবিগণ যাঁর বা যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেছেন তাঁদের পরিচয় ও প্রশস্তি তাঁরা তাঁদের কাব্যে উল্লেখ করেছেন। এরূপ কয়েকটি প্রশস্তির বর্ণনা নীচে উদ্ধৃত হলো।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৪৯৩ ঈসায়ীতে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের আদি পর্ব থেকে স্ত্রী পর্ব পর্যন্ত বাংলায় অনুবাদ করেন। সেখানে কবির বর্ণনা ঃ

নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক সেনাপতি হওন্ত লস্কর।
লস্কর পরাগল খাঁন মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ূ গতি॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটি গ্রামে চলিয়া গেল হরষিত হৈয়া॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খাঁন মহামতি॥
পুরাণ শুন স্ত নিতি হরষিত মতি॥

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতিও মুসলিম শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে তাঁর কাব্যের ভণিতায় লেখেন ঃ

সে যে নাসিরা সাহ্ জানে   যারে হানিল মদন বাণে॥
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর   কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

বিদ্যাপতি অন্যত্র বলেন ঃ
বেকতেও চোরি গুপত কর কতিখান বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মহলম জুগপতি চিরজীব জীবথু গ্যাসদেব সুলতান॥

গ্যাসদেব সুলতান মূলতঃ সুলতান গিয়াস উদ্দিন। অর্থাৎ কবি বিদ্যাপতি উপরোক্ত উভয় মুসলিম নৃপতিরই যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

পঞ্চদশ শতকের অন্যতম প্রধান কবি কৃত্তিবাস ওঝা তৎকালীন মুসলিম শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর কবিতায় বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ

রাজ পন্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥
...   .
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥
...   .
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলেন অনুরোধ।

এভাবে মুসলমান রাজার আদেশে কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করেন। ইতোপূর্বে সেন আমলে রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা মহাঅপরাধরূপে গণ্য হতো। ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ তাই যথার্থই বলেন ঃ "মুসলমানদের আগমনে বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহারা বাংলা ভাষা চর্চার এবং বাংলা সাহিত্য প্রণয়নে অশেষ উৎসাহ দিয়াছিল।" (ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ ঃ বাংলা নাটকের ইতিহাস/কলিকাতা ঃ পৃ. ৫)।

এ প্রসঙ্গে আরো তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধৃত করতে চাই। ডক্টর হাসান জামান বলেন ঃ "মুসলিম আমলের পূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোনও নজীর পাওয়া যায় না। অবশ্য বৌদ্ধ যাজকেরা বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে বাংলার লৌকিক ও কথ্য ভাষায় ধর্ম প্রচার ও ধর্মগ্রন্থ রচনা করতেন। খ্রীস্টীয় সপ্তম ও দশম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে সংঘর্ষে বৌদ্ধদের সে ধর্ম-সাহিত্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাধারণ লোকের মুখের ভাষাকে ব্রাহ্মণেরা ইতর বা নীচুদরের ভাষা বলতেন। মুসলিম সম্পর্কের ফলে ইসলামের তওহীদ ও সাম্য-নীতির সংস্পর্শে বৌদ্ধ দোঁহার এ বাংলা ভাষা ও তুর্কী মুসলিমের সংযোগে এক

নতুন ভাষার উৎপত্তি হলো, যা বাংলা ভাষার প্রথম, স্পষ্ট ও ঐতিহাসিক সাহিত্যিক রূপ।" (ডক্টর হাসান জামান ঃ সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, পৃ. ২০১)।

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেন ঃ "যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এদেশে আর কয়েক শতকের জন্য হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকতো, তবে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেতো এবং অবহেলিত ও বিস্মৃত-প্রায় হয়ে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো।" (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস-এর ভূমিকা)।

বিশিষ্ট গবেষক সুখময় মুখোপাধ্যায় স্বাধীন সুলতানী আমলের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ "এই পর্বে বাংলা সাহিত্যের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটে। কয়েকজন দিকপাল কবি এই পর্বেই আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সুগঠিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করেন, তাঁদের অনেকেই বাংলার রাজা ও রাজ-কর্মচারীদের কাছে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। কাজেই বাংলার ইতিহাসের আলোচ্য এই পর্বটি সব দিক দিয়েই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই পর্বে যেসব সুলতান বাংলাদেশের শাসন করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ ছিলেন।" (সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল, গ্রন্থকারের নিবেদন, প্রথম সংস্করণ)।

মুসলিম শাসনামলে শুধু ভাষা, সাহিত্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, বাংলার সার্বিক জীবনায়নে যে সর্বাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয় সে সম্পর্কে কতিপয় বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের কতিপয় মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ "যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও আদরের সেই বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল।" (ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃ. ২২)।

এন.এন.ল' সমগ্র উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের যে সার্বিক সুফলের বর্ণনা দিয়েছেন বাংলায় মুসলিম শাসন সম্পর্কে তা সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলেন ঃ "...that the Mohammedan invasion of India marked the begining of momentous changes not only in the social and political spheres, but also in the domain of education and bearing." (N.N.Law : Promotion of Learing during Mohammedan Rule P.XIX).

ডক্টর মুহম্মদ আব্দুর রহীম আরো সুস্পষ্টভাবে বলেন ঃ "মুসলিম বিজয় ছিল বাংলার প্রতি বিরাট আশীর্বাদস্বরূপ। যা বাংলা ভাষাভাষী লোকদেরকে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যমঞ্চে সংঘবদ্ধ করে, বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে দেয়। কেবল এই বিরাট সংহতি এবং মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার গুণেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি উৎসাহিত হয়। যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এদেশে আর কয়েক শতকের জন্য হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকতো, তাহলে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেতো এবং অবহেলিত ও বিস্মৃত হয়ে অতীতের গর্বে নিমজ্জিত

হতো।" (ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, ভূমিকা, পৃ. ৯)

উপরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি, বিকাশ, এর মূলে প্রতিবন্ধকতা ও এর নবজন্ম এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়, জাতিগোষ্ঠী ও শাসন আমলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করার পর বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত মুসলিম ঐতিহ্যকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(এক) ভাষা,
(দুই) বিষয়বস্তু,
(তিন) ভাবানুভূতি বা অনুপ্রেরণা, ও
(চার) আঙ্গিক ও প্রকরণগত বিভিন্ন দিক।

এক। প্রত্যেক ভাষার আসল সম্পদ হলো তার শব্দ-সমষ্টি। যে ভাষার শব্দ-সংখ্যা যত বেশী সে ভাষা মনের বিচিত্র ভাব প্রকাশের জন্য তত বেশী উপযোগী ও সমৃদ্ধ। ভাষায় উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শব্দরাজি থাকার ফলে মনের ভাব যথার্থরূপে প্রকাশ করা সহজ হয়। বাংলা ভাষা শব্দমালার দিক দিয়ে অতিশয় সমৃদ্ধ। কিন্তু একদিনে হঠাৎ করে এটা হয়নি। বাংলা ভাষার মধ্যে রয়েছে আর্য-অনার্য বিভিন্ন ভাষার শব্দ, দেশী-বিদেশী নানা ভাষার শব্দ। এসব শব্দ মিলিয়ে বাংলা ভাষায় বর্তমানে প্রায় সোয়া লক্ষ শব্দ রয়েছে। এ শব্দগুলোর মূল উৎসগুলো প্রধানত নিম্নরূপ ঃ

ক) দেশী শব্দ। মূলত: এদেশের প্রাচীন ভাষাকে ভাষাতত্ত্ববিদগণ নাম দিয়েছেন 'প্রাচীন প্রাকৃত'। নাম থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে এই ভাষা 'আধুনিক প্রাকৃত' নামে অভিহিত হয়। কালক্রমে আধুনিক প্রাকৃত পরিবর্তিত হয়ে এক পর্যায়ে এই ভাষা অপভ্রংশ ভাষা নামে অভিহিত হয়। এই অপভ্রংশ ভাষা থেকেই বাংলা, অহমিয়া, উড়িয়া ও হিন্দী ভাষার উৎপত্তি। বাংলা ভাষার মূল উৎস এই অপভ্রংশ ভাষার শব্দরাজিই 'দেশী শব্দ' নামে পরিচিত। মূলত: এই শব্দগুলোই এদেশের আদি জনগোষ্ঠীর অকৃত্রিম মাতৃভাষার সম্পদ। কালের বিবর্তনে এ শব্দগুলো নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলোর সাথে আমাদের নাড়ীর সম্পর্ক কিছুটা হলেও বিদ্যমান।

খ) সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত আর্য-ব্রাহ্মণদের ভাষা। বাঙালী জাতি অনার্য প্রধান। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ভাষায় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ-উপনিষদ-মহাভারত রচিত হওয়ায় এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত হিন্দু শাস্ত্র ব্রাহ্মণ পন্ডিত ও কবিগণ এ ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করার ফলে এ ভাষার অসংখ্য শব্দ বাংলাসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। যেসব সংস্কৃত শব্দ হুবহু বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে সেগুলোকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ, আর যেসব সংস্কৃত শব্দ ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় আত্মীকৃত হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় তৎসম।

গ) পালি ভাষার শব্দ। পালি ভাষা মূলত: প্রাচীন প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত। এ ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক রচিত হয়। এক সময় ভারতবর্ষ ছাড়াও এশিয়ার একটি বিশাল

ভূখন্ডে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের সুবাদে এবং পালি ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মীয় পন্ডিত ও কবিগণ অসংখ্য গ্রন্থ রচনার ফলে বাংলাসহ ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় পালি ভাষার অসংখ্য শব্দরাজি অনুপ্রবিষ্ট ও আত্মীকৃত হয়।

ঘ) মুসলমানী জবান। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত আরব বণিক ও ইসলাম প্রচারকদের আগমনের ফলে, বিশেষত বাংলাদেশে মুসলিম রাজত্ব কায়েমের ফলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত মুসলিম শাসকদের ভাষা আরবী, ফার্সী, তুর্কী, উর্দু ইত্যাদি ভাষার অসংখ্য শব্দরাজিতে বাংলা ভাষা সুসমৃদ্ধ হয়। বিশেষত মুসলিম আমলের পূর্বে সেন আমলে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চা নিষিদ্ধ থাকার পর মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার নবজন্ম এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা শুরু হওয়ায় মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবী এবং শাসক-সম্প্রদায়ের ভাষা তুর্কী, ফার্সী ভাষার অসংখ্য শব্দরাজি বাংলা ভাষায় সহজেই স্থান করে নেয়। মুসলিম আমলের সাড়ে পাঁচশো বছরে বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী-তুর্কী-উর্দু শব্দের এত ব্যাপক প্রচলন ঘটে যে, এক সময় এ ভাষাকে অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে 'মুসলমানী জবান' বলে আখ্যায়িত করা হয়। সুলতানী আমলে ফারসী রাজভাষা হওয়ায় ফারসী ভাষার শব্দই বাংলা ভাষায় বেশী স্থান করে নেয়। এ জন্য এ ফারসীবহুল বাংলা এক সময় 'ফারসী-বাংলা' হিসাবেও খ্যাতি লাভ করে।

পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল জাতিধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলিম সকলেই এই সুসমৃদ্ধ মুসলমানী বাংলা জবান বা 'ফারসী বাংলা'য় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহিত্য চর্চা করেছেন। ইংরেজ আমলে বৃটিশ আমলাদেরকে দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮০০ ঈসায়ীতে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বাংলা ব্যাকরণ ও পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে কলেজে নবনিযুক্ত হিন্দু সংস্কৃত পন্ডিতগণ বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবী-ফার্সী-তুর্কী-উর্দু ভাষার শব্দরাজি পরিহার করে সে স্থলে দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দরাজি আমদানী করে তাঁরা সংস্কৃতবহুল এক নতুন কৃত্রিম বাংলা ভাষা চালু করেন। এ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করে এবং ব্যাকরণ তৈরী করে ছাত্রদেরকে এ কৃত্রিম বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে থাকেন। ধীরে ধীরে শিক্ষিত মহলে এবং সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে এ ভাষাই চালু হয়। এ নতুন ভাষার নাম হলো সাধু ভাষা। 'যাবনিক শব্দ ও ম্লেচ্ছ স্বর' বর্জিত এ সাধু ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' থেকে পেশ করছিঃ

"অকারাদি ক্ষকারান্তাক্ষরমালা যদ্যপি পঞ্চাশৎ সংখ্যকা এক পঞ্চাশৎ কিম্বা সপ্তপঞ্চাশৎ সংখ্যা পরিমিতা হউক তথাপি এতাবন্মাত্র কতিপয় বর্ণাবলী বিন্যাস বিশেষবশতঃ বৈদিক লৌকিক সংস্কৃত প্রাকৃত পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানা দেশীয় মনুষ্য জাতীয় ভাষা বিশেষবশতঃ অনেক প্রকার ভাষা বৈচিত্র শাস্ত্রতো লোকতর প্রসিদ্ধ আছে। যেমন কুঞ্জরধ্বনি তুল্যধ্বনি নিষাদ স্বর। গোরবানুকারী ঋষভ স্বর।" ইত্যাদি

এরূপ 'যাবনিক শব্দ ও ম্লেচ্ছ স্বর' বর্জিত সংস্কৃতবহুল দুর্বোধ্য ভাষাকেই সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতেরা শুচি-শুদ্ধ সাধু বাংলা বলে চালাবার প্রাণান্ত প্রয়াসে লিপ্ত হলেন। এ নতুন

বাংলা ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমানে এবং তার সূত্রধর হইলেন সংস্কৃত পন্ডিত বাংলা ভাষার সঙ্গে যাদের ভাসুর ভাদ্র বৌয়ের সম্বন্ধ।"

এ সাধু বাংলা সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত লিখেছেন ঃ "আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না।"

ঐতিহাসিক নাজিরুল ইসলামের ভাষায় ঃ "ইংরাজ শাসনের পরিপোষকতায়, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের পন্ডিতদের চেষ্টায় ও বাঙ্গালা ভাষা সংস্কারের জন্য দীনেশ চন্দ্র বর্ণিত "ঘোর কোলাহলের" ফলে, বাঙ্গালা ভাষার চেহারা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। এই ভাষা হইল সংস্কৃত প্রধান সুতরাং বাঙ্গলা যে আর্য ভাষা তাহা বলিতে আর কোন বাধা রহিল না। নূতন ভাষার নাম হইল সাধু ভাষা। বহুকাল পর্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমান এ ভাষার চর্চা করেন নাই। তাঁহারা প্রাচীন গৌড়ের ভাষাতেই পুঁথি রচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও স্কুল-কলেজে স্থান লাভ করিতে পারিল না। তাহার ও গৌড়ের ভাষার স্থান হইল বটতলায়। এইভাবে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙ্গালী মুসলমানের রাজ্য, ধন, মান, সুযোগ-সুবিধা যাহা কিছু সব ত গেলই এমন কি, পাঁচ শত বৎসরব্যাপী বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চা করিয়া যে ভাষাকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন, যে ভাষাকে বন্ধ্যা দশা হইতে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই ভাষার উপর অধিকারও হারাইলেন। কলিকাতা হইল নূতন মহানগরী। এই মহানগরীর মুৎসুদ্ধি, তহশীলদার ও গোমস্তা হইল নূতন জমিদার। এই নগরীর নূতন কলেজের পন্ডিতদের বাঙ্গালা ভাষাই হইল নূতন সরকারের অনুমোদিত নূতন বাঙ্গালা ভাষা। এই নূতন ভাষার নাম হইল সাধু ভাষা "যাবনিক শব্দ ও ম্লেচ্ছস্বর" বর্জ্জিত হইয়া সাধু ভাষা সম্পূর্ণরূপে শুচি ও শুদ্ধি হইয়া গেল।" (নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান ঃ বাঙ্গালা ভাষার নূতন ইতিহাস, তৃতীয় সংস্কর, পৃ. ৪৫০-৫১)

অবশ্য এ সত্ত্বেও সাধারণ বাঙালীর মুখের ভাষা হিসাবে পূর্বতন মুসলমানী জবানই চালু থাকে, বিশেষত বাঙালী মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। তবে শিক্ষিতের হার বাড়ার সাথে সাথে সংস্কৃতবহুল বাংলা ভাষার প্রচলনও বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমন কি, মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণও এ ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বিংশ শতকের শুরু থেকে এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নই তাঁর সাহিত্যে সর্বপ্রথম পুনরায় মুসলমানী জবান ব্যবহার শুরু করেন এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও অর্জন করেন। অতঃপর নজরুল ইসলাম ব্যাপক আকারে অতি বলিষ্ঠ ও সার্থকভাবে বাঙালীর অকৃত্রিম মুসলমানী জবানে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এটা ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ। নজরুল শুধু ভাব ও বিষয়ের ক্ষেত্রেই বিদ্রোহ করেননি; তাঁর ভাষা-বিদ্রোহও ছিল এক অসাধারণ কাজ।

এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পুরাপুরি ঐতিহ্য-সচেতন। ভাষা ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ পাঁচ শো বছরের যে মুসলিম ঐতিহ্য তা অতি বলিষ্ঠ ও সার্থকভাবে তিনি তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করেন। ফলে হিন্দু সম্প্রদায় এমনকি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু তিনি তাতে এতটুকু হতোদ্যম না হয়ে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে সমালোচকদের জবাবে বলেনঃ "

... বিশ্ব-কাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানি ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই।... বাঙলা কাব্য-লক্ষ্মীকে দু'টো ইরানী 'জেওর' পরালে তার জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও খুবসুরতই দেখায়। আজকের কলালক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলঙ্কারই ত মুসলমানী ঢং-এর।" (দ্র. কাজী নজরুল ইসলাম/বড়র পিরীতি বালির বাধ)।

নজরুলের পরে ফররুখ আহমদ এবং আরো অনেকেই তাঁদের সাহিত্য চর্চায় অতি সার্থকভাবে মুসলমানী বাংলা জবানের প্রয়োগে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানের কথ্য ভাষায় এখনো পর্যন্ত এই তথাকথিত মুসলমানী বাংলা জবানের প্রাধান্য রয়েছে। অতএব, বাস্তব জীবনধর্মী সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে দিন দিন এ ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকলে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। বরং বাস্তবতা ও ইতিহাসের দাবী এটাই। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ সুপন্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সুচিন্তিত অভিমতটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

"পরবর্তীকালে উচ্চ বর্ণেরা লৌকিক ভাষাকে মার্জিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইল। সাধারণে লৌকিক ভাষা পালি ব্যবহার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারেরা বলিলেন 'ন-ম্লেচ্ছ ভাষাং শিক্ষেত' ম্লেচ্ছ ভাষা শিখিও না।' তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুর্দশা বৌদ্ধ ধর্ম তাহার নবীন তেজে দন্ডায়মান। কেহ ব্রাহ্মণের কথা শুনিল না। বৌদ্ধ গণতন্ত্রের পক্ষ লইল। পালি ভাষা এক বিপুল সাহিত্যের ভাষা হইল। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

"আর এক যুগ আসিল। এখন রাজশক্তি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ এখন অভিজাত-তন্ত্রের দিকে। বৌদ্ধ এখন ধর্মের দোহাই দিয়া পালিকে ধরিয়া রাখিতে চাহিল; তখন কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষ লইল জৈনধর্ম। তখন লৌকিক ভাষা প্রাকৃত। পালি প্রাকৃতের নিকট তিষ্টিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাত-তন্ত্রের পরাজয় হইল।

"আর এক যুগ আসিল। এ যুগ অন্ধকারময়। এ যুগে উচ্চ শ্রেণীর প্রাকৃত নিম্ন শ্রেণীর অপভ্রংশের নিকট পরাজিত হইল। এই অপভ্রংশ হইল বাংলা, ওড়িয়া, আসামী, হিন্দী, গুজরাতি, মারহাটি প্রভৃতি দেশীয় ভাষাসমূহের জননী।

"তারপর আধুনিক যুগ। এ যুগে পন্ডিতেরা সাধারণের ভাষাকে মাজিয়া-ঘষিয়া সাধু ভাষা করিয়া লইলেন, বিশাল জনসাধারণের ভাষাকে ইতর ভাষা বলিয়া ফেলিয়া

রাখিলেন। বর্তমানে এই ইতর ভাষা পন্ডিতের ভাষার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। পন্ডিতে তাঁহার অন্ধ সংস্কৃত ভক্তির জন্য বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুর্বহ শিকলে বাঁধিতে চাহিতেছেন। আর ইতর ভাষা সেই শিকড় কাটিতে চাহিতেছে। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে কি? যদি ভারতের ভাষা-ইতিহাসের শিক্ষা মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয়ই একদিন এই ইতর ভাষা সাধু ভাষাকে, যেমন লৌকিক-বৈদিককে, পালি সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালিকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতকে ঠেলিয়া দিয়াছিল সেইরূপ ঠেলিয়া ফেলিবে। সাধু ভাষা মৃত ভাষারূপে পুস্তকে ঠাঁই পাইবে। যেমন মিল্টন, জনসন প্রভৃতির ল্যাটিন বহুল ভাষা এখন কেবল কেতাবী ভাষা হইয়া রহিয়াছে, এখনকার সাধু ভাষার অবস্থাও সেইরূপ হইবে। পরিণামে চরমপন্থীরই জয় হইবে। তবে মধ্যম পন্থা বর্তমান পরিবর্তনশীল যুগের উপযুক্ত ভাষা বটে। একেবারে 'নি' হইতে 'সা'তে সুর নামাইতে গেলে অনেকের কানে বেখাপ্পা লাগিবে নিশ্চয়ই।" (দ্র. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ/আমাদের ভাষা সমস্যা)।

ঙ) বিদেশী ভাষা। ইংরেজ আমলে রাজ-ভাষা ফারসীর বদলে হলো ইংরেজী। আমাদের আইন-আদালত, প্রশাসন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা শুরু হলো। ফলে ইংরেজী ভাষার বহু শব্দ আমাদের ভাষায় স্থান লাভ করলো। এভাবে বহির্জগতের সাথে মেলামেশার ফলে পৃথিবীর বহুদেশের অসংখ্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ বাংলায় স্থান পেল। দিনে দিনে এসব শব্দও আমাদের ভাষার সম্পদে পরিণত হয়েছে এবং বাংলা ভাষা তাতে সমৃদ্ধই হয়েছে। যেসব শব্দ আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বা সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবে এসে গেছে বা সহজভাবে বোধগম্য হয়ে উঠেছে সেসব বিদেশী শব্দও এখন আমাদের ভাষারই সম্পদ। ভাষায় জোর করে গ্রহণ-বর্জনের নীতি অচল। যা স্বাভাবিকভাবে গ্রাহ্য, আত্মীকৃত বা বোধগম্য তাই আমাদের নিজস্ব।

বাংলা ভাষায় মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক তথ্য এবং বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত একটি পরিসংখ্যান-এর বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাই। বিশিষ্ট নাট্যকার ও লেখক ডক্টর আসকার ইবনে শাইখ এ সম্পর্কে লিখেছেন। তাঁর লেখা থেকেই এ সম্পর্কিত তথ্য ও পরিসংখ্যানটি পেশ করছি। তিনি লিখেছেন ঃ

"১৯৬৫ সালে তদানীন্তন বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের তত্ত্বাবধানে "The Pattern of Bengali Vocabulary (1740-1864)" শীর্ষক পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণা জরিপের ওপর এক পুস্তিকা প্রকাশ করি। এর তত্ত্বাবধায়ন সাব-কমিটিতে ছিলেন সর্বজনাব সৈয়দ আলী আহসান, প্রফেসর কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক অজিত গুহ, ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ, বাংলা একাডেমীর তদানীন্তন রিসার্চ অফিসার মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম। সে জরিপের কিছু ফলাফল ছিল নিম্নরূপ ঃ

ব্যবহৃত শব্দাবলীর ভাষা উৎস (শতকরা হিসাব)

কাল ও রচনা প্রকৃতি	তৎসম	তৎভব	স্থানীয়	আরবি ফারসী-তুর্কী	ইংরেজী পর্তুগীজ	অন্যান্য	মোট
১৮ শতক	৩১.৫	৩৮.৯	৩.৩	২৬.৩	-	-	১০০.০
১৯ শতক	৭৭.৬	১৯.২	২.২	১.০			১০০.০
গম্ভীর প্রকৃতি	৫৯.৩	২৫.০	২.৫	১৩.২	-	-	১০০.০
প্রহসনমূলক	৬৮.২	২৭.২	২.৮	১.৭	০.১	০.১	১০০.১
পদ্য	৪২.৩	৩৬.০	৩.৬	১৭.৯	০.১	-	৯৯.৯
গদ্য	৮২.২	১৫.৪	১.৬	০.৮	-	-	১০০.০
হিন্দু ধর্মীয়	৭২.৩	২৪.০	২.৪	১.৪	-	-	১০০.১
ইসলামী	১২.০	৩৫.৫	৩.৪	৪৯.০	০.১	-	১০০.০
সব প্রকৃতির	৬২.৩	২৫.৭	২.৬	৯.৪	০.১	-	১০০.১

উপরিউক্ত তালিকা থেকে পাঠকবৃন্দ সময় থেকে সময়ান্তরে এবং রচনা প্রকৃতি অনুসারে ব্যবহৃত শব্দাবলীর ভাষা উৎসের পরিবর্তন ধারা অনুসরণ করতে পারবেন... ।” (বাণী বদলের বাই/আসকার ইবনে শাইখ, দৈনিক ইনকিলাব, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮)।

উপরোক্ত পরিসংখান থেকে জানা যায়, অষ্টাদশ শতকে আমাদের সাহিত্যের ভাষায় যে বিপুল সংখ্যক আরবী-ফার্সী-তুর্কী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, ১৮০০ ঈসায়ীতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হবার পর অকস্মাৎ তা প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছে। অবশ্য এটা সাহিত্যের ভাষার হিসাব। জনগণের, বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের মুখের ভাষায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দু সংস্কৃত পন্ডিতদের দৌরাত্ম্য কিছু মাত্র প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। ভাষার ক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহ্য সাধারণ জনগণের মধ্যে পূর্বের ন্যায়ই বহাল ছিল, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মোহাম্মদ নজিবর রহমান, কাজী নজরুল ইসলাম পুনরায় সাহিত্যের ভাষায় সেটা সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করলেন, চল্লিশের দশকে বিশেষত ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সে ধারা আরো বেগবান হয়েছে এবং ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অকাট্য যুক্তি অনুযায়ী আমাদের জীবনধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির অপরিহার্য তাগিদে জনগণের ভাষাই উত্তরোত্তর ফোর্ট উইলিয়মীয় কৃত্রিম ভাষার উপর বিজয়ী হবে। ষড়যন্ত্র করে আর বিদেশের প্রভাবে ভাষার এই গণতন্ত্রায়ন রোধ করা যাবে না। বাংলা ভাষায় মুসলিম ঐতিহ্য দিন দিন সূর্যালোকের মতই দীপ্ত-সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে আর একটি বক্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়। তাই এখানে তা একটু দীর্ঘ আকারেই উদ্ধৃত হলো ঃ

“বাঙ্গালা ভাষার চর্চা আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য। তবে মাতৃভাষা আমাদের হাতে কি রূপ গ্রহণ করবে তা নিয়ে মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। ... ভাষার

আকার প্রকার এবং জাতি বিচার নিয়ে হিন্দু এবং মোসলেম সাহিত্যিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর সাহিত্যিকেরাই অসংখ্য আরবী, ফার্সী এবং উর্দু শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করতেন পরিপূর্ণ মনের ভাব অভিব্যক্ত করার জন্য।

"সাহিত্যের ভাষা কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় একেবারে বদলে দিয়েছেন। তিনি আরবী, ফার্সী এবং উর্দু শব্দসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে, তাদের জায়গায় সংস্কৃতমূলক শব্দের আমদানী করেছেন। ফলে পন্ডিতি বাঙ্গালা তথা বর্তমান বাঙ্গালা হিন্দু সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। ... হিন্দুদের জাতীয় সাহিত্য তাদের অক্লান্ত সেবায় সমৃদ্ধ এক সাহিত্যে পরিণত হল। তারপর দুই একজন করে মুসলমানেরা যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে নামতে আরম্ভ করলেন, তখন হিন্দুর ব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষা সমস্ত শিক্ষায়তনগুলিকে দখল করে বসেছে, দেশের সাহিত্যকে দখল করে বসেছে, সংবাদপত্র প্রভৃতিকে দখল করে বসেছে। জাতীয় ভাষা ব্যবহার করার মত সাহস, শক্তি এবং প্রতিভা আমাদের তখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিল না। হিন্দুর ব্যবহৃত ভাষাকেই তাঁরা রুচিসম্মত এবং ভদ্রতাসম্মত বলে মনে করলেন। মীর মোশাররফ হোসেন, মুন্সী রেয়াজুদ্দীন, শেখ আব্দুর রহিম প্রভৃতি হচ্ছেন সেই যুগের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাহিত্যিক।

"তারপর এসেছে আমাদের বর্তমান যুগ। বিদ্যাসাগরী গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে এবং মীর মোশাররফ হোসেন প্রমুখ সাহিক্যিকদের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তার বিরুদ্ধে এক স্বাভাবিক বিদ্রোহ বা Natural reaction দেখা দিয়েছে।.... আমরা আস্তে আস্তে এখন বুঝতে পারছি, আমাদের স্বাভাবিক জাতীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করা লজ্জার বিষয় নয়, উপরন্ত সেই ভাষাতেই আমাদের প্রকৃত সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

"আমাদের স্বাভাবিক ভাষা কী? বাঙ্গালী মুসলমানের বাঙ্গালা যে বাঙ্গালী হিন্দুর বাঙ্গালা থেকে অনেকাংশে ভিন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। আর এই প্রভেদ অহেতুক নয়। এর যথেষ্ট ঐতিহাসিক এবং কালচারগত কারণ বর্তমান আছে। সেই সব কারণের দরুণ এক সময় পুঁথির ভাষা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অবশ্য এখন আমাদের ভাষাকে অনেকটা সহজবোধ্য করতে হবে। আমির হামজার দাস্তানের ভাষা আমাদের সাহিত্যে আর চলবে না। আমরা আমাদের স্বাভাবিক ভাষার অনুসরণ করে সরলতার পথে অগ্রসর হব।" (এস.ওয়াজেদ আলী ঃ বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী মুসলমান)।

লেখক এস. ওয়াজেদ আলী পাকিস্তান সৃষ্টিরও বহু পূর্বে বাংলা ভাষা সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন, বর্তমানেও তার তাৎপর্য ও যাথার্থ এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি। ১৮০০ ঈসায়ীতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান শ্রীরামপুরের পাদরী উইলিয়ম কেরীর অধীনে নিযুক্ত সংস্কৃত পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দ চন্দ্র, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু প্রচলিত বাংলা ভাষা থেকে আরবী, ফার্সী, তুর্কী ইত্যাদি শব্দরাজি সম্পূর্ণ

বাদ দিয়ে দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ সংযোগে যে কৃত্রিম ভাষায় বাংলা পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচনা করলেন বিদ্যাসাগর সে ভাষাকে কিছুটা প্রাঞ্জল ও বোধগম্য করলেও বাংলা ভাষার আদি রূপ থেকে তা ছিল ভিন্ন অর্থাৎ আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ বিবর্জিত। বিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে নজিবর রহমান, নজরুল ইসলাম সে ভাষার বিরুদ্ধে 'স্বাভাবিক বিদ্রোহ' বা Natural reaction দেখিয়ে আমাদের জাতীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে লিপ্ত হলেন। প্রকৃতপক্ষে সেটাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী স্থাপিত হওয়া, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা এবং সর্বশেষে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও বিকাশের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সঙ্গতভাবেই আমাদের ভাষার আসল অকৃত্রিম রূপ বিকাশের অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এখনো আমাদের জাতীয় ভাষা-সাহিত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। এ ষড়যন্ত্র যতই গভীর, সুপরিকল্পিত ও শক্তিশালীই হোক না কেন, গভীর আত্মপ্রত্যয়, আত্ম-সচেতনতা ও স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষার অপরিহার্য তাগিদে তা প্রতিরোধের দুর্জয় শপথ নিতে হবে। বিভাগ-পূর্বকালে আমাদের রাজধানী ছিল কলকাতায়। কলকাতাকে কেন্দ্র করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত পন্ডিতদের নেতৃত্বে বিদ্যালংকার-বিদ্যাবাচষ্পতিদের হাতে যে কৃত্রিম বাংলা ভাষা চালু হয়েছিল এবং যার ভিত্তিতে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে, বিংশ শতকের শুরু থেকেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকাকে কেন্দ্র করে সে বিদ্রোহ নতুন আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ঢাকা এখন শুধু তের কোটি বাংলাদেশীর রাজধানীই নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও প্রধানতম কেন্দ্র ও আমাদের স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা ও জাতীয় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশের শ্রেষ্ঠতম পাদপীঠ।

দুই–বাংলাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম হবার পর মুসলমান শাসক ও আমীর ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু-মুসলিম সকলেই স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেছে। কিন্তু উভয়ের সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন। হিন্দুরা যেখানে বেদ-উপনিষদ-মহাভারতের অনুবাদ করেছে, রাধা কৃষ্ণের প্রেম-লীলা সংবলিত বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য এবং লৌকিক দেব-দেবীর মহিমা কীর্তনমূলক মঙ্গল কাব্য ও শ্রীচৈতন্যের জীবনী সংবলিত বিশাল চরিত সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করেছে, অন্যদিকে মুসলমানরা তেমনি ইসলামী বিষয়বস্তু, রাসূলের (স) জীবনী, ইসলামের বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্র, ঘটনা ও কাহিনী যেমন মহাবীর আমীর হামজা, ইউসুফ-জোলায় খাঁ, লাইলু-মজনু, শিরী-ফরহাদ ইত্যাদি মানবিক কাহিনী ও প্রেমোপাখ্যান নিয়ে অসংখ্য কাব্য-কবিতা রচনা করেছে। প্রাচীন কালের সব দেশের সাহিত্যই ধর্ম-নির্ভর। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদও বৌদ্ধ ধর্ম–কথা সংবলিত। হিন্দুদের রচিত প্রাচীন এমন কি, মধ্যযুগীয় সাহিত্যও হিন্দু ধর্ম, তাদের দেব-দেবী ও পৌরাণিক কাহিনীতে ভরপুর। অবশ্য রাধা-কৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম, ষোল শো গোপিনীর সাথে

শ্রীকৃষ্ণের অবৈধ প্রণয়লীলা ও মঙ্গলকাব্যের অসংখ্য কাহিনীতে মানবিক সংবেদনা ও জীবন বাস্তবতার অনেক কিছু প্রচ্ছন্নভাবে ফুটে উঠেছে। তবে এসব কাহিনীতে অশ্লীলতা, নগ্নতা, ব্যভিচার ও অনৈতিকতা এত প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে যে, কোন রুচিশীল পাঠকই তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের রচিত সাহিত্যে কুরআন-হাদীস, নবী-রাসূল, ইসলামের ইতিহাস ও মানবিক ইসলামী ভাব-সম্পদ তো আছেই উপরন্তু মানবিক সংবেদনা, প্রেম-প্রণয়, জীবনের আর্তি মানবিক রসে জারিত হয়ে হৃদয়গ্রাহীভাবে ফুটে উঠেছে এবং আশ্চর্যের বিষয়, এসব রচনায় ইসলামের উন্নত নৈতিক বোধ ও মানবিক ঔদার্য সর্বদা উচ্চকিত, মধ্যযুগীয় ভাঁড়ামী, অশ্লীলতা, নগ্নতা ও ব্যভিচারের চিত্র এখানে কোথাও স্থান পায়নি। এ প্রসঙ্গে ডক্টর এম.এ. রহীমের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

"যখন হিন্দু ঐতিহ্যের পবিত্র দেব-দেবীর অপবিত্র প্রেমকে পূজা করার মধ্যে জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ অনুপস্থিত ছিল, তখন বাস্তবিক মুসলমান কবিদের নৈতিক ঐতিহ্যবাহী রম্য কাব্য ছিল বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর ঘটনা।" (ডক্টর এম. এ. রহিম /বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃ. ২৫৫)।

বাংলা সাহিত্যে এটা একটি নতুন দিক, মুসলিম কবিরাই এ ধারার প্রবর্তক এবং তাদের হাতেই এর বিকাশ ঘটে। অতএব, বিষয়বস্তু ও অশ্লীলতা বিবর্জিত শ্লীল সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুস্পষ্ট মানবিক ধারা প্রবর্তনে মুসলমানদের এক ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা তথা কুরআন-হাদীস, মুসলমানের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ মুসলমানদের সৃষ্টি-কর্মে প্রভাব বিস্তার করে। এ সম্পর্কে ডক্টর আহমদ শরীফের একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য ঃ

"বাংলাদেশের প্রায় সবাই মুসলমান। তাই বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ যুগে সুলতান সুবাদারের প্রতিপোষণ পেয়ে কেবল হিন্দুরাই বাঙলার সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, মুসলমানরাও তাদের সাথে সাথে কলম ধরেছিলেন এবং মধ্যযুগে বাঙালী মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, দেবধর্ম প্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্য রস পরিবেশনের জন্য তাঁরাই লেখনী ধারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য পেয়েছি তাঁদের হাতেই। কাব্যের বিষয়বস্তুতেও বৈচিত্র্য দানের গৌরবও তাঁদেরই; কেননা, সব রকমের বিষয়বস্তুই তাঁদের রচনার অবলম্বন হয়েছে। মুসলমানদের দ্বারা এই মানব রসাশ্রিত সাহিত্য ধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে। দরবারের ইরানী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এদেশের হিন্দু-মুসলমানের একই সূত্রে তথা একই কালে হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ ইরানী সংস্কৃতি দ্রুত গ্রহণে ও স্বীকরণে তাদের সহায়তা করেছে প্রচুর। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষে ছয় শ' বছরেও তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তাই মুসলমান কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' প্রণয়োপাখ্যান রচনা করছিলেন, হিন্দু লেখকগণ তখনো দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহমুক্ত হতে পারেননি। যদিও এই দেবভাব একান্তই পার্থিব জীবন

ও জীবিকা সম্পৃক্ত।" (ডক্টর আহমদ শরীফ/ বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, পৃ. ১৮৫)।

ডক্টর আহমদ শরীফ এখানে যেটাকে 'ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব' বলে উল্লেখ করেছেন, সেটা ছিল মূলত ব্যাপকার্থে ইসলামেরই প্রভাব। ইসলামী বিশ্বাস, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ মুসলমানদের জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে তারই প্রতিফলন ঘটে তাদের সকল কৃতিতে, চিন্তা, মনন, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে।

এ প্রসঙ্গেঁই ডক্টর আহমদ শরীফ আমাদের অর্থাৎ বাংগালী মুসলমানের রচিত সাহিত্যের রূপরেখা, বিষয়বস্তু ও অনুপ্রেরণা কীরকম হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে ঃ "আমাদের বাংলা ভাষায় স্বকীয় আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে, আদর্শ হবে কোরানের শিক্ষা, আধার হবে মুসলিম ঐতিহ্যনুগ আর বিষয় বস্তু হবে ব্যক্তি বা সমাজ অথবা বৃহদার্থে জগৎ ও জীবন" (ডক্টর আহমদ শরীফ/বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারায় হিন্দু প্রভাব, মাসিক মোহাম্মদী পৌষ, ১৩৫৮)

যাই হোক, এ সম্পর্কে আরো দুটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। প্রথম মন্তব্যটি করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্য-গবেষক শশাঙ্কমোহন। তিনি বলেন ঃ "মুসলমানের এই উপাখ্যান কাব্যে ধর্মের বা সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক নাই, সাহিত্য রসই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

অন্য মন্তব্যটি করেছেন আরেকজন বিশিষ্ট সাহিত্য-গবেষক নগেন্দ্রনাথ। তিনি বলেন ঃ "মুসলমান কবিগণ আরব্যোপন্যাস বা পারস্যোপন্যাস বর্ণিত অপূর্ব প্রেম কাহিনীর অনুসরণে বাঙ্গালা ভাষার পয়ারাদি ছন্দে নানা উপাখ্যান রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল কাব্যে যে কেবল মুসলমানী চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা নহে। এই শ্রেণীর কোন কোন গ্রন্থে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ছাঁচও দৃষ্ট হয়।"

মুসলমান রচিত সাহিত্যের ভাষা ও বিষয়বস্তুর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান আরো সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে ঃ

"...পুঁথি সৃষ্টির ফলেই বাংলা সাহিত্যে নবযুগ আসিয়াছিল, রেনেসাঁসের ফলে নহে। ইংরাজ আমলেও বাংলা সাহিত্যের নানা পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহা ঠিক কিন্তু বাংলা ভাষার প্রাথমিক উন্নতি ১৪০০ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে না হইলে বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপ সম্ভব হইত না।

১। বর্তমানে পুঁথি সাহিত্যের মূল্য যাহাই হোক–পুঁথি সাহিত্যিকদের কল্যাণেই বাংলা কাব্যে বিভিন্ন ছন্দের প্রচলন হয়।

২। কাব্যের বিষয়বস্তুর একঘেঁয়েমি তাঁহারাই ভাঙ্গিয়া দেন।

৩। পুঁথি সাহিত্যেই সর্ব্বপ্রথম মানুষের গল্প প্রচলিত হয়। সেই সব গল্পে নানা রসেরও পরিবেশন ঘটে।

৪। পুঁথি সাহিত্যের যুগে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম শুধু ধর্ম্মীয় গ্রন্থ ছাড়া উপাখ্যান কাব্য, ইতিহাস, ঐতিহাসিক কেচ্ছা, জীবনী, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, জ্যোতিষ, হেকিমী,

স্বপ্নতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে পুঁথি রচিত হয়। আরবী ও ফারসী গ্রন্থের অনুপ্রেরণাতেই বাংলা সাহিত্যে ইংরাজ আমলের পূর্বেই এই সব বিষয়ে পুঁথি রচিত হইয়াছিল।

৫। পুঁথি সাহিত্যেই সেকালের গৌড়ের চলতি বাংলা ভাষা প্রচলিত হয় এবং তাহাই ছিল ইংরাজ আমলের পূর্বের বাংলা ভাষা।" (নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান/বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, তৃতীয় প্রকাশ- ১৯৯২, পৃ. ৪২৪-৪২৫)।

তিন- ভাষা ও বিষয়বস্তুর পরেই সাহিত্যে যে জিনিসটার গুরুত্ব সেটা হলো ভাবানুভূতি ও অনুপ্রেরণা। যে কোন মহৎ সৃষ্টির জন্যই এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটা আবার দেশ-কাল-পাত্র ও পরিবেশের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে আরবের কবিরা দেব-দেবী, পৌত্তলিক-মুশরিকী ভাবধারা, মানবিক প্রেম-কাহিনী ও নানা রূপ অশ্লীল-কুরুচিপূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্য-কবিতা-গাঁথা রচনা করেছেন। ইসলামের আবির্ভাবের পর সেসব কবিই অনেকে সম্পূর্ণ নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতা বা সাহিত্য চর্চায় মনোযোগী হয়েছেন। পূর্বে যাঁরা মুশরিকী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য-চর্চা করেছেন, পরবর্তীতে তাঁরাই তৌহিদী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বীয় কলমকে বানিয়েছেন জিহাদের উৎকৃষ্ট হাতিয়ার, এক স্রষ্টার প্রশংসা ও রাসূলের (স) প্রশস্তি-গাঁথায় হয়েছেন মুখর। তাঁদের লেখায় অশ্লীল-অনৈতিক চিন্তা-চেতনার বদলে এসেছে স্বচ্ছ-নির্মল মানবিক ভাবধারা। তাঁদের প্রকাশের মাধ্যম ভাষা একই ছিল, কিন্তু প্রকাশের রীতি, ভাব, বিষয় ও পদ্ধতির মধ্যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। একটি ভাব-বিপ্লব ও ঐশী-চেতনা বা অনুপ্রেরণার ফলেই শুধু আরবী সাহিত্য নয়, সমগ্র আরব সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা তথা সমগ্র জীবন-ব্যবস্থায় যে বৈপ্লবিক ও সফল কল্যাণময় পরিবর্তন সংঘটিত হয় তা সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করে, বিশ্ব-সভ্যতায় তা স্থায়ী কল্যাণময় ধারার যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামের প্রচার এবং বিশেষতঃ মুসলিম শাসনামলে এ প্রভাবের উত্তুঙ্গ তরঙ্গাভিঘাত বাংলাদেশের জীবনধারা, সংস্কৃতি, সমাজ-পরিবেশ ও চিন্তা-চেতনায় যে পরিবর্তন সংঘটিত হয় তা আগে উল্লেখ করেছি, ভাব ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যে প্রভাব তার উল্লেখও করেছি। মূলতঃ ভাষা, ভাব, বিষয়বস্তু, স্বতন্ত্র জীবনধারা ও অনুপ্রেরণাগত যে স্বাতন্ত্র্য কালক্রমে সেটাই আমাদের স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের মন্তব্য আবার স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেন ঃ

"১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্যন্ত সাপের দেবতা, বাঘের দেবতা, ওলাউঠা ও বসন্তের দেবতা লইয়াই বাংলা সাহিত্যের কারবার চলিতেছিল। কিন্তু এই সময় হইতে ভাবের রাজ্যে এক বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। দেশের সর্বত্র ফকির ও দরবেশের ইসলাম প্রচারের ফলে জনসাধারণের চিন্তা-স্রোতের গতি কিছুটা দিক পরিবর্তন করে।" (নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান/ পৃ. ২৩১)।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ফলে বিশেষতঃ মুসলিম রাজত্ব কায়েমের ফলে যে ভাব-বিপ্লব সংঘটিত হয় তা ধারণ করে যে সাহিত্যের সৃষ্টি সেটাই মুসলিম ঐতিহ্যমন্ডিত এ নতুন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাহিত্য। মধ্যযুগে শাহ মোহাম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ হামজা, কাজী দৌলত, আলাওল, ঊনবিংশ শতকে মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, কায়কোবাদ, মুনশী মেহের উল্লাহ, বিংশ শতকে মোহাম্মদ নজিবর রহমান, কাজী ইমদাদুল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ, জসীম উদ্দিন, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, শাহেদ আলী, মোফাখখারুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আব্দুস সাত্তার, আল মাহমুদ প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের সেই বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ধারাকেই সমুন্নত ও সমুজ্জ্বল রেখেছেন।

বাংলা সাহিত্যে প্রবহমান প্রধান দুটি ধারা–একটি যেটাকে হিন্দু ঐতিহ্যের ধারা বলা যায়, অন্যটি মুসলিম ঐতিহ্যমন্ডিত ধারা পাশাপাশি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে পদ্মা-যমুনার মতই সমান্তরালভাবে বিদ্যমান। এ বৈশিষ্ট্য ভাবানুভূতি ও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে, সামাজিক আচরণ ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে, রীতি-নীতি ও জীবনবোধের ক্ষেত্রে, স্বতন্ত্র ইতিহাস ও ঐতিহ্য-চেতনার ক্ষেত্রে, বাস্তবধর্মী জীবনবাদী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যা চিরকাল সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অপরিহার্য হিসাবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কবি–সমালোচক আবদুল কাদিরের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন ঃ

"চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে বাংলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক কাব্য ইউসুফ–জোলায়খা' রচিত হয়– তার আখ্যান–ভাগ আরবী ও ফারসী থেকে গৃহীত। অতঃপর বাংলা কাব্যে আরবী ও ফারসী প্রভাব ক্রমশ বেড়েই চলে। কিন্তু বৃটিশ আমলে ফারসীর বদলে ইংরেজী যখন সরকারী দফতরের ভাষা হলো, মধুসূদন মোচন করলেন নতুন দ্বারপথ– 'কল্পনায় মণিকৌটা ভরে' ইউরোপ থেকে আমদানি করলেন ভাবের পাথেয়। রবীন্দ্রনাথ এসে ইউরোপীয় ভাবের বটিকা উপনিষদীর অধ্যাত্ম-রসের অনুপান দিয়ে বৈষ্ণবীয় ভক্তির খল্লে ঘষে কালিদাসীয় পানপাত্রে পরিবেশন করলেন। তাতে দেশের বিদগ্ধ শ্রেণীর অভিজাত রুচির পরিতৃপ্তি ঘটল। কিন্তু তা দেশের আপামর-সাধারণের রসতৃষ্ণা নিবারণের উপযোগী হলো না,– হিন্দু জনসাধারণ রামায়ণ–মহাভারত বৈষ্ণব- পদ ও মঙ্গল-কাব্য নিয়ে এবং মুসলমান জনসাধারণ– 'রসূল-বিজয়' 'পদ্মাবতী' 'আমীর হামজা' 'জঙ্গনামা' 'আলেফ-লায়লা' 'কাছাছোল আম্বিয়া' 'মারফতী পদাবলী' প্রভৃতি নিয়ে মশগুল রইল। এ কালে বাংলার হিন্দু মুসলিম জনসাধারণের কাব্য রুচি ও পাশ্চাত্য-প্রভাবিত নব্য সাহিত্যের মধ্যে এই যে ব্যবধান গড়ে' উঠলো, তা দিন দিন প্রশস্তই হয়েছে। ....

পাঠান ও মুঘল আমলে বাংলা কাব্য ছিল যেমন সত্যাশ্রয়ী ও রসাশ্রয়ী, তেমনি ছিল জনগণের রুচি-অনুসারী। আমাদের পরাধীনতার যুগের সাহিত্য যখন হলো একদিকে

প্রতীচ্য-মুখী ও অন্যদিকে সংস্কৃত–ভারাক্রান্ত, তখন অসংখ্য মুসলমান কবি সুপ্রচলিত 'মুসলমানী বাঙ্গালা'য় পুঁথি প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করলেন। ....

এই দেশের জনগণের মুখের ভাষায় যেসব আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ মিশ্রিত হয়ে আছে, তাই-ই স্বাভাবিকভাবে সাহিত্যে এসে আপন যথাযোগ্য স্থান দখল করেছে। বলাবাহুল্য যে, ভাষার বিকাশে জবরদস্তির অবকাশ নেই। আরও একটা কথা এই যে, যে সাহিত্যে মানুষের নিত্য-ব্যবহার্য ভাষার গ্রাম্যতা-বর্জিত ব্যবহার যত বেশী, তা ততো বেশী জনপ্রিয়। এ কারণেই কাশীরাম দাস, মালাধর বসু ও মুকুন্দরামের অপেক্ষা কৃত্তিবাস ওঝা, শেখ ফয়জুল্লাহ ও ভারতচন্দ্র অপেক্ষাকৃত অধিক জনপ্রিয়। আধুনিকালে কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক ও শাহাদাৎ হোসেনের চেয়ে নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দিন ও ফররুখ আহ্‌মদ যে সমধিক জনপ্রিয় হয়েছেন, তারও একটা কারণ এই। শুধু ভাষা বিন্যাস ও রূপ-সৌষ্ঠবের ব্যাপারেই নয়, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস-অলংকার প্রভৃতি প্রয়োগ এবং ভাবের পরিবেশ সৃষ্টিতেও নতুন কবিতায় আমাদের পুরাতন ঐতিহ্যের ধারা পুনঃপ্রবাহমান।" .... (মুখবন্ধ ঃ 'কাব্য-বীথি ॥ পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ১৯৫৪)।

অবশ্য ব্যতিক্রম একেবারে নেই তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামী তথা মুসলিম ঐতিহ্য ও ভাবধারা হিন্দুদের যেমন প্রভাবিত করেছে, অনুরূপভাবে কোন কোন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকও হিন্দু ভাবধারায় নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। উনবিংশ শতকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব যেমন বহুলাংশে ইসলামের প্রভাবের ফল, উনবিংশ শতকেও তেমনি রাজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবও অনেকটা ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মের সম্মিলিত প্রভাবের ফল। মধ্যযুগে কোন কোন মুসলিম কবি যেমন বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন, ইংরেজ আমলে মুসলিম বাউল ও মরমী কবিদের কারো কারো লেখায় যেমন সুফীবাদের প্রভাব আছে তেমনি তাতে কিছু কিছু হিন্দু ভাবেরও সংমিশ্রণ ঘটেছে, বিংশ শতকে মুসলিম নবজাগরণের কবি নজরুল ইসলামও তেমনি কিছু কিছু শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করেছেন এবং তাঁর কিছু কিছু রচনায় হিন্দু-মুসলিম চৈতন্যের মিশ্রণ ঘটেছে। তবে ব্যতিক্রম সর্বদাই সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত। মুসলিম শাসনামল থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যের যে ধারা চলে আসছে তা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের এক সুস্পষ্ট আলোকিত উজ্জ্বল ধারা।

চার– আঙ্গিক ও প্রকরণগত দিক থেকেও বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান। আরবী পৃথিবীর প্রাচীন ভাষা। এ ভাষার সাহিত্যও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ফার্সীও একটি প্রাচীন ভাষা। এ ভাষায়ও সুসমৃদ্ধ সাহিত্য বিদ্যমান। ফার্সী ভাষার কবি জালালুদ্দীন রূমী, ওমর খৈয়াম্, শেখ সাদী, শেখ জামী, হাফিজ, ফেরদৌসী প্রমুখ পৃথিবীর সর্বকালের, সকল ভাষার শ্রেষ্ঠতম কবিদের অন্তর্ভুক্ত। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এমন কি, আধুনিক অনেক বাংলা ভাষার কবি-সাহিত্যিকের উপরই তাঁদের প্রভাব বিভিন্নভাবে লক্ষ্য করা যায়। উর্দু অপেক্ষাকৃত নতুন ভাষা হলেও এ

ভাষাও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। উর্দু সাহিত্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি মীর্যা গালিব, মহাকবি ইকবাল প্রমুখের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও প্রভাব বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত-রেখাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে গেছে। এ সকল প্রভাবের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যে এ নতুন স্বতন্ত্র ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। ইতোপূর্বে এ প্রভাবের মূলগত ভাব, বিষয়-বৈভব ও চিন্তা-চেতনাগত দিক তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। এখানে শুধুমাত্র আঙ্গিক ও প্রকরণগত দিকটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাব।

মুসলিম আমলের পূর্বে একমাত্র চর্যাপদ ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসবে যে চর্যাপদের উল্লেখ করা হয় তা আবিষ্কৃত হয় বিংশ শতকের গোড়ার দিকে। অতএব, মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় যখন বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির কাজ শুরু হয় তখন প্রধানতঃ দুটি সমৃদ্ধ সাহিত্যের নজীর সামনে ছিল।

এক) সংস্কৃত সাহিত্য ও
দুই) আরবী-ফার্সী সাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্য এবং অনেক শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ছিল। কালিদাসের 'মেঘদূত', 'কুমার সম্ভব', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এর ন্যায় প্রেম ও ভক্তি ভাবপূর্ণ ধর্মীয় কাব্যও ছিল। এগুলো প্রধানতঃ ধর্মভাবমূলক হলেও এতে মানবীয় প্রেম ও হৃদয়বৃত্তির প্রকাশও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের সূচনাকালে হিন্দু কবিরা মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ-মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করা ছাড়াও রামায়ণ-মহাভারতের মহাকাব্যের আঙ্গিকে তাৎকালীক অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী মঙ্গল কাব্য জাতীয় ধর্মীয় উপাখ্যান রচনা করেছেন। 'মেঘদূতে'র আদলে তাঁরা বৈষ্ণব পদাবলী এবং 'গীত গোবিন্দে'র আদলে শ্রীচৈতন্যের চরিত্রমূলক অসংখ্য কবিতা-কাব্য রচনা করেছেন।

ঠিক এর পাশাপাশি আরবী-ফারসী ভাষার অসংখ্য বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের আদলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি হলো। আরবী ভাষায় আল্লাহ্র নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কেবল মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানই নয়, এর শব্দ-বিন্যাস, বাক্য গঠন প্রণালী, তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ-বিধি, উপমা, ছন্দ, বিশিষ্টাত্মক শব্দ, অর্থ, লালিত্য ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে এ এক অনন্য গ্রন্থ। যেহেতু এটি বিশ্ব-স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্র সৃষ্টি তাই এর রূপ-সৌন্দর্য ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থের সাথে এর তুলনা করাও ধৃষ্টতা মাত্র। তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ বাদ দিলেও এ ঐশী গ্রন্থটি আরবী সাহিত্যের একটি মডেল হিসাবে পরিগণিত হয়। মুসলিম, নাছারা, ইয়াহুদী, পৌত্তলিক-মুশরিক নির্বিশেষে সকল আরবী ভাষাভাষী কবি-সাহিত্যিকই এ মহাগ্রন্থের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এর দ্বারা নানাভাবে যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত হয়েছেন। এমন কি, মুসলমানরা ইসলাম প্রচার, রাজ্য জয়, ব্যবসা-বাণিজ্য বা যে উদ্দেশ্যেই পৃথিবীর যে কোন দেশে গেছে, সেখানেই এ গ্রন্থটি সাথে নিয়ে গেছে, ফলে

সেখানকার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনাচারে এ গ্রন্থের অনিবার্য প্রভাব কম-বেশী অবশ্যই পড়েছে। বিশ্ব-সভ্যতা তথা সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে বিভিন্নভাবে এই একটি মাত্র গ্রন্থের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, দ্বিতীয় আর কোন গ্রন্থকে তার সমকক্ষ দূরে থাক, কাছাকাছিও দাঁড় করানো সম্ভব নয়। এভাবে কিছুটা প্রত্যক্ষভাবে এবং বহুলাংশে ফার্সী, তুর্কী, উর্দু প্রভৃতি ভাষার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আল-কুরআনের শব্দ, ভাব, কাহিনী, বিষয়, বর্ণনা, রূপক-উপমা, সৌন্দর্য বহুভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে।

আল-কুরআনের সাথে সাথে আরবী, ফার্সী, তুর্কী, উর্দু প্রভৃতি ভাষার বিশ্ব-বরেণ্য অসংখ্য কবি ও তাঁদের অমর ধ্রুপদ সাহিত্যের প্রভাবও বাংলা সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ও বাংলা সাহিত্য তার আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ভাবধারা ও ঐশ্বর্য-সম্পদে সুসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আরো একটি ক্ষেত্রে বাংলা কাব্যে আরবী-ফার্সীর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্যযোগ্য। তা হলো ছন্দ। প্রাচীন বাংলা কাব্যে অক্ষর সংখ্যা ও যতির কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। শুধু চরণের শেষে ব্যঞ্জনের মিলই সে যুগের কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"আমরা বাঙ্গালা পদ্যের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাইয়াছি তাহাতে কোন ছন্দ বা প্রণালী দৃষ্ট হয় না।... মানিক চাঁদের গানে অক্ষর, যতি বা মিলের কিছু মাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয় না। ভাব প্রকাশের প্রয়োজন হইলে অক্ষর সংখ্যা ২৪, ২৫ এমন কি ২৬ও অতিক্রম করিয়াছে। আবার স্থল বিশেষে তাহা সংক্ষেপ হইয়া ১২ কি ১০-এ অবতরণ করিয়াছে এরূপও দৃষ্ট হয়।"

এ প্রসঙ্গে নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "বাংলার একটি অতি প্রাচীন ও প্রধান ছন্দ পয়ার। পয়ারেরই রকমফের ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, লাচরী প্রভৃতি। প্রাচীন কবিরা প্রায় সকলেই পয়ার রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাস, সৈয়দ সুলতান, মালাধর বসু, সগীর, কৃত্তিবাস, সকলেরই কাব্য পয়ারে গাঁথা। কিন্তু সংস্কৃতে পয়ার নাই। লঘু ত্রিপদীও নাই।" (নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান/ ঐ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯২, পৃ. ১৬৫)।

নাজিরুল ইসলাম আরো বলেন ঃ "'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' রচয়িতা বড় চণ্ডীদাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু তাঁহার রচনাতেও সংস্কৃত কাব্যরীতি নাই; আছে পয়ার, সেও আবার নিয়মাবদ্ধ পয়ার নহে।" (ঐ, পৃ. ১৬৫)।

তাহলে এ পয়ার ছন্দের আবির্ভাব কোথা থেকে? নাজিরুল ইসলাম এর যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ "বাংলা কবিতার মত ফারসী কবিতারও জাতিবিচার অক্ষর বা স্বর দিয়া ঠিক করা যায় না। মুসলিম যুগের পর হইতে যেসব ছন্দ বাংলায় দেখা যায়, মুসলিম যুগের পূর্বে সেই ধরনের ছন্দ বাংলায় কোথাও পাওয়া যায় নাই। বাংলা কবিতায় অক্ষর নির্দিষ্ট করিবার নিয়ম পূর্বে ছিল না; বর্তমানেও যে আছে তাহা

জোর করিয়া বলা যায় না। অক্ষর বা স্বর বাংলা কবিতার ছন্দ রচনার চাবিকাঠি নয়–পর্বের মাত্রাই ছন্দের প্রাণ।... প্রাচীন কবিরা এবং মুসলিম পুঁথি সাহিত্যিকেরা যে সব ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন তাহা প্রায় সবই ফারসী অথবা আরবী। চন্ডীদাসের রচিত পয়ারের (কথা) পূর্বেই (বলা হইয়াছে)। তাঁহার রচিত ত্রিপদীর সংখ্যাও বহু। ত্রিপদী ফারসী 'সালমা' রাগেরই বাংলা সংস্করণ। 'রুবাই' বা চৌপদী চন্ডীকাব্যে বিশেষ নাই তবে আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ রুবাই-এর ঢং-এ কবিতা রচনা করিয়াছেন।... রুবাই জাতীয় কবিতা, বয়েৎ ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বড় কেউ লেখেন নাই।" (ঐ, পৃ. ১৬৯-১৭০)।

এভাবে নাজিরুল ইসলাম আরো দেখিয়েছেন, ফারসী 'মেসরা' (এক চরণের কবিতা), 'খামছা' বা 'মখচ্ছম' (পাঁচ চরণের কবিতা), 'মছদ্দস' (ছয় চরণের কবিতা), 'মছব্বা' (সাত চরণের কবিতা), 'মছম্মান' (আট চরণের কবিতা) প্রভৃতি চন্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেকেই কম-বেশী অনুসরণ করেছেন। প্রাচীন পুঁথিকার সজ্ঞানেই ফারসী রীতি অনুসরণ করেছেন। তবে ফার্সী রীতিতে বহুকাল থেকে বাংলা কবিতা রচিত হলেও এর কোন বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি হয়নি, কিংবা ফার্সী নামগুলোও বাংলায় গৃহীত হয়নি। নজরুল, ফররুখও তাঁদের কবিতা-গযল-গানে বহু ক্ষেত্রে ফার্সী রীতি, আরবী রীতি অনুসরণ করেছেন। এতে নিঃসন্দেহে আমাদের সাহিত্য নানা বৈচিত্র্য ও মাধুর্যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে। এবং এটা সরাসরি আরবী-ফার্সীর প্রভাবে সংঘটিত হয়েছে তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলিম আমল থেকে আমাদের ভাষার নবজন্ম ও সাহিত্য স্বচ্ছন্দ বিকাশের সাথে সাথে ভাষা, বিষয়বস্তু, ভাবানুভূতি বা অনুপ্রেরণা, আঙ্গিক ও প্রকরণগত বিভিন্ন দিকে আমাদের সাহিত্যে একটি প্রাণময়, দীপ্তিময়, ঐশ্বর্যমণ্ডিত ধারা গড়ে উঠেছে, যেটাকে এক কথায় মুসলিম ঐতিহ্যরূপে আখ্যায়িত করা যায়। প্রধানতঃ মুসলমানদের হাতেই এটা গড়ে উঠলেও হিন্দুরাও এর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। ফলে এটা সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই একটি বিশিষ্ট চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য রূপে আমাদের ভাষা-সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত। এটাকে উপেক্ষা করা বা বিস্মৃত হওয়া আত্মঘাতিরই নামান্তর। ঐতিহ্যের অনুসরণ ও তার নব নব রূপায়ণের মাধ্যমেই কালজয়ী, প্রাণস্পর্শী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এ সচেতন উপলব্ধি থেকেই আমাদের ভাষা-সাহিত্যের গৌরবময় ঐহিত্যকে ধারণ ও লালন করতে হবে।

উনবিংশ শতকের প্রেক্ষাপট ও মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য সাধনা

১৯৫৭ ঈসায়ীতে পলাশী যুদ্ধে বাংলার ভাগ্য-বিপর্যয়ের ফলে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে ক্ষতি সাধিত হয় তা জাতীয় পর্যায়ে অন্য যে কোন বড় রকম ক্ষতির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এতদিন পর্যন্ত শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকগণ সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদির চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু পলাশীর ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর এবং বেনিয়া ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পর স্বাভাবিকভাবে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক ক্ষেত্রে সমূহ বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। কবি-সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ সংস্কৃতিসেবীগণ অকস্মাৎ পৃষ্ঠপোষকহীন, অসহায়, ছিন্নমূল মানুষে পরিণত হন। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ও অনিশ্চয়তার কারণে মানুষের মনে সদা সশংকভাব বিরাজ করছিল। এ পরিবর্তিত অবস্থায় মানুষের মানস-রাজ্য নিতান্তই অভিব্যক্তিহীন, ফ্যাকাশে ও সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জনগণ সর্বদা ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় অনুচরদের নানারূপ অত্যাচার, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক পীড়ন ও জুলুমের আংশকায় সদা চিন্তান্বিত থাকতো। এরূপ উদ্বেগাকুল পরিবেশ সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশের উপযোগী নয়।

ইংরেজগণ প্রথমতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে আগমন করে। কিন্তু অর্থ-লিপ্সা ক্রমে রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হয়। এদেশীয় বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর কিছু ব্যক্তি তাদের এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সাহায্য করে। এভাবে বেনিয়া শ্রেণীর ইংরেজগণ যখন তাদের এদেশীয় অনুচরদের সহযোগিতায় ছলে-বলে-কৌশলে রাজনৈতিক আধিপত্য লাভে সক্ষম হলো, তখন তাদের নিকট থেকে কল্যাণ-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন সুশাসন প্রত্যাশা করা ছিল দুরাশা মাত্র। ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজগণ

নবলব্ধ রাজশক্তিকে অর্থনৈতিক শোষণের নিষ্ঠুরযন্ত্রে পরিণত করে। সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিকাশের কোন কর্মসূচীই তাদের ছিল না। এরূপ পরিবেশে জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সুকুমার বৃত্তির চর্চা ও বিকাশ সম্ভব ছিল না। অবশ্য ক্ষমতা দখলের প্রায় অর্ধশত বছর পর তারা উপলব্ধি করে যে, রাজনৈতিক আধিপত্য স্থায়ী করতে হলে এদেশের মানুষকে মানসিক দিক দিয়ে তাদের গোলামে পরিণত করতে হবে। ফলে তারা এদেশে এক শ্রেণীর রাজানুগত মানুষ তৈরির উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাষা ও শিক্ষা-পদ্ধতি চালু করে ও ইংরেজী সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটাবার প্রয়াস পায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে এদেশে তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থকে স্থায়ী করার চেষ্টা চালায়। এদেশের মানুষকে তাদের দেশের মানুষের মত জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষিত বিদ্বান করে তোলার মহৎ উদ্দেশ্যে তারা ইংরেজী ভাষা ও শিক্ষা-পদ্ধতি চালু করেনি; বরং এদেশীয় এক শ্রেণীর মানুষকে তাদের অনুগত দাসে পরিণত করাই এর লক্ষ্য ছিল। এসব অনুগত দাসদের মাধ্যমে এদেশে বেনিয়া শাসন ও শোষণ–যন্ত্রকে মজবুত করা ও রাজনৈতিক গোলামীর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা, মনন ও সংস্কৃতির দিক থেকেও এদেশীয় মানুষের মধ্যে হীনমন্যতা ও দাসত্ব সৃষ্টি করাই ছিল এর লক্ষ্য। ইংরেজদের এ লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের নিজেদেরই স্বীকারোক্তি ঃ

"বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে, সমাজে যারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তারা রক্ত-মাংসের গড়নে ও বর্ণে ভারতীয় হবে বটে, কিন্তু রুচি, চিন্তা ও মননের দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ।" (Woodrow : Macaulay's Minutes on Education in India—1862)।

এ নব্য শিক্ষা-সভ্যতা আমদানির ফলে এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেলেও সাধারণ জনগণ বিশেষতঃ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হলো। পলাশীর বিপর্যয় বাঙালী হিন্দুদের নিকট ছিল শুধুমাত্র প্রভু বদল। তাদের মধ্যে একশ্রেণীর অতি স্বার্থপর লোক এ পরিবর্তন আগে থেকেই প্রত্যাশা করে আসছিল। তাই তাদের নিকট এটা একান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল না। বরং এটাকে রাতারাতি ভাগ্য বদলের সুযোগ হিসাবে গ্রহণে তারা রীতিমত তৎপর হয়ে ওঠে। ফলে নতুন প্রবর্তিত শিক্ষা-সভ্যতা অনুসরণ–অনুকরণেও তারা দ্রুত এগিয়ে আসে। কিন্তু মুসলমানদের এপথে এগিয়ে আসতে দীর্ঘ সময় লাগে। এ সম্পর্কে ইংরেজ লেখক উইলিয়ম হান্টার বলেন ঃ

"আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা হিন্দুদেরকে শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে তাদের নিষ্ক্রিয় জনসাধারণকে মহৎ জাতিগত প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারলেও তা মুসলমানদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং তাদের ধর্মের কাছে ঘৃণার্হ। .... আমাদের প্রবর্তিত জনশিক্ষা ব্যবস্থা যেমন তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি, তেমনি তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যে আর্থিক সাহায্য

এতকাল তারা পেয়ে এসেছিল, তাও আমরা বিনষ্ট করেছি।" (ডবলিউ ডবলিউ হান্টারঃ দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স, পৃ. ১৫৪, ১৬০)।

একদিকে, মুসলমানদের যখন এই অবস্থা, তাদের ধর্ম ও প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের কারণে ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করা, ইংরেজী ভাষা, শিক্ষা, সভ্যতা থেকে তারা আত্মরক্ষামূলক নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করার চেষ্টা করছিল, অন্যদিকে, হিন্দুদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা ইংরেজী ভাষা-শিক্ষা-সভ্যতা দ্রুত রপ্ত করে, ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের নিকট থেকে নানারূপ সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নিয়ে উন্নতির সোপান বেয়ে দ্রুত এগিয়ে চলে। অন্যদিকে, মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত হতে হতে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

ইউরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতা আমদানির সাথে সাথে রাজভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও ইংরেজী ভাষা চালু করা হয়। এতদিন পর্যন্ত রাজ-ভাষা ছিল ফারসী এবং সাহিত্যের ভাষা ছিল বাংলা বা আরবী-ফারসী মিশ্রিত বাংলা। জনগণের ভাষাও ছিল তাই। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই এ ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতেন। তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষায় যদিও আরবী-উর্দু-ফারসী শব্দের পরিমাণ একটু বেশি ছিল, মুসলমানদের ধর্মীয় পরিভাষা ও ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের কারণে, তবু হিন্দুদের ব্যবহৃত ভাষায়ও এসব শব্দের ব্যবহার কম ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি ভারতচন্দ্রের সুবিখ্যাত 'অন্নদা মঙ্গল' তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইংরেজ আমলে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আদি বাংলার পরিবর্তে ফোর্ট উইলিয়মীয় সংস্কৃত বাংলা এবং পরবর্তীতে ১৮৩৭ সনে রাজকার্যে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী প্রচলনের ফলে সকল বাঙালী সাধারণ এবং বিশেষভাবে বাঙালী মুসলমানের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে চরম বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। অবশ্য হিন্দু সমাজে এ বন্ধ্যাত্ব দীর্ঘস্থায়ী না হলেও মুসলিম সমাজে নানা কারণে এ বন্ধ্যাত্ব দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বহাল থাকে। ইংরেজ আগমনের পূর্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক আধিপত্য ছিল প্রধানতঃ মুসলমানদেরই হাতে। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। পলাশী প্রান্তরে ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হবার পর আকস্মিকভাবে সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের আধিপত্য হারানোর বেদনা তাদেরকে চরমভাবে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর ওয়াকিল আহমদ বলেন ঃ

"বস্তুতঃ ১৯৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ে রাজক্ষমতা-চ্যুতি, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারির সংখ্যা হ্রাস, ১৮২৮ সালে রাজেয়াপ্ত আইনে নিষ্কর ভূমির রায়তি স্বত্ব লোপ, ১৮৩৭ সালে ফারসীর রাজভাষা চ্যুতি– পর পর এই চারটি বড় আঘাতে পূর্বের শাসক শ্রেণী নিঃস্ব-রিক্ত, নিরক্ষর, নিষ্ক্রিয়, নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়। ইংরেজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির ফলেই এই রূপটি হয়েছে।" (ড. ওয়াকিল আহমদ /উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১)।

নিজস্ব গৌরবময় ঐতিহ্য, রাজ্য-হারানোর বেদনা ও বিগত দিনে দীর্ঘস্থায়ী ক্রুসেডের (মুসলমানদের সাথে খ্রীস্টানদের কয়েক শতাব্দীব্যাপী ধর্মযুদ্ধ) তিক্ততার কারণে ফিরিঙ্গি শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাষাকে মুসলমানগণ কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এদিক দিয়ে হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। ইংরেজদের আগমনের ফলে হিন্দুদেরকে কিছু হারাতে হয়নি। শাসন-ক্ষমতা মুসলমানদের নিকট থেকে ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। বরং মুসলমানদের তুলনায় তারা সহজে ইংরজদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ায় অত্যল্পকালের মধ্যেই তারা ইংরেজদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয় এবং প্রশাসন, সেনাবাহিনী, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারী-জোতদারী ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তারা দ্রুত একটি মুসলিম-প্রাধান্যপূর্ণ সমাজকে হিন্দু-প্রাধান্যপূর্ণ সমাজে পরিণত করে। ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও তারা দ্রুত অগ্রসর হয়। এ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন ঃ

"উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাতে বৃহত্তর জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা অগ্রসর হলো, অর্থনৈতিক বিচারে তাদের নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী, রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে তাদের নাম বৃটিশের সহযোগী, সাংস্কৃতিক বিচারে তাদের নাম পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী, সামাজিক বিচারে তাদের নাম হিন্দু সম্প্রদায়।" (সুরজিত দাশ গুপ্ত/ ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃ. ১৬৯)।

শ্রী সুরজিত দাশ গুপ্ত তাঁর বক্তব্য আরো ব্যাখ্যা করে লিখেছেন ঃ "বৃটিশের সৌভাগ্য গড়ে তোলার কাজে তিন প্রকার দেশীয় মানুষ সামর্থ্য ও সাহায্য যুগিয়েছে ঃ পাইক সম্প্রদায়– এরা বৃটিশদের বাহুবল যুগিয়েছে; করণ সম্প্রদায় ও তৃতীয় এক ধরনের বিত্তবান সম্প্রদায়.... এরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এ দেশীয় বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছে। লক্ষণীয় যে, ধর্মের বিচারে বৃটিশদের সামর্থ্য ও সাহায্য যোগানদার এই তিন সম্প্রদায়ই হিন্দু ধর্মাবলম্বী।"

অন্যদিকে, মুসলমানগণ মানসিকভাবে ইংরেজ শাসন মেনে নিতে না পারায় এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত হারানো রাজশক্তি ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ ও এ জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় তারা কেবল সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও আধিপত্য হারিয়েছে তাই নয়, শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক পিছনে পড়ে গেছে। মূলতঃ ১৮৫৭ সনে মহাবিদ্রোহের (সিপাহী বিদ্রোহ) পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। মহাবিদ্রোহ ব্যর্থতা বরণ করায় এবং অদূর ভবিষ্যতে বড় কোন বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানের আয়োজন করার সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ায় মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা সাময়িকভাবে নস্যাৎ হয়ে যায়। এরপর থেকে গত্যন্তর না দেখে মুসলমান সমাজের কেউ কেউ ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা-দীক্ষা অনুসরণে উদ্যোগী হন। এ সময় কতিপয় মুসলিম মনীষী ও সমাজসেবী এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুসলিম সমাজের সার্বিক অধঃপতন ও দুরবস্থা অবলোকন করে তাঁরা অতিশয় ব্যথিত হন এবং

শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানগণ যাতে দ্রুত এগিয়ে আসে, সে ব্যাপারে তাঁরা সর্বোতভাবে প্রচেষ্টা চালান। ইতোমধ্যে পুরো এক শতাব্দীকাল অতিবাহিত হয়েছে এবং ততদিনে শিক্ষাগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। এ সামাজিক শোচনীয় অবস্থা ও মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতা বরণের পটভূমিতেই মুসলমানগণ সর্বপ্রথম ব্যাপক ও কিছুটা সচেতনভাবে ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে।

ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ দেখা গেলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তারা কতিপয় অসুবিধারও সম্মুখীন হয়। প্রথমতঃ ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা বিকাশের উপযোগী ছিল না। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজী শিক্ষা-সভ্যতার নামে যে ধরনের ইয়াংকীপনা ও সামাজিক অনাচার আমদানি করা হয়, মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের সাথে তা ছিল সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। এ সম্পর্কে হান্টার বলেন ঃ

"আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা হিন্দুদেরকে শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে তাদের নিষ্ক্রিয় জনসাধারণকে মহৎ জাতিগত প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারলেও তা মুসলমানদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং তাদের কাছে ঘৃণার্হ।" (ডবলিউ ডবলিউ হান্টার/ দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃ. ১৫৪)।

এ কারণেই পরবর্তীকালে মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা নামে অন্য একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা হয়। তবে এটা সমস্যার কোন সঠিক সমাধান ছিল না। মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থায় সীমিত অর্থে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও উক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থায় উচ্চতম ডিগ্রী হাসিলের পরেও যথাযথ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ সম্ভব ছিল না; অর্থাৎ সরকারী চাকরী লাভ বা সামাজিক কোন দায়িত্ব পালন বা কোনরূপ উৎপাদনমুখী ভূমিকা পালনের যোগ্যতা সৃষ্টি হতো না বা সেসব ক্ষেত্রে তাদেরকে কোন রূপ সুযোগ দেয়া হতো না। মক্তব-মাদ্রাসায় শিক্ষকতা অথবা মসজিদের ইমামতী ব্যতীত অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। তাই সরকারী চাকুরী লাভ ও সামাজিক স্বীকৃতি লাভের আশায় কিছুসংখ্যক মুসলমান ইংরেজী শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয়। এভাবে মুসলমান মূলতঃ ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ইংরেজী শিক্ষিত আধুনিক সমাজ, অন্যদিকে আরবী-ফারসী শিক্ষিত ধর্মীয় সম্প্রদায়, আর এ দু'য়ের মাঝখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত সমাজ। এরূপ ত্রিধা বিভক্ত সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ অতিশয় দুরূহ। বাঙালী মুসলমানদের জন্য এটা ছিল এক বিপর্যয়কর অবস্থা। এ প্রসঙ্গে বাঙালী মুসলমানদের অতীত পটভূমি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে।

বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নবর্ণীয় হিন্দু ও নির্যাতিত বৌদ্ধদের থেকে ধর্মান্তরিত। বিদেশাগত মুসলমানদের মধ্যে দুটো শ্রেণী। প্রথমতঃ ধর্ম-প্রচারক। তাঁরা ঈসায়ী অষ্টম শতক থেকে বিভিন্ন সময়ে স্থল ও নৌপথে বাংলাদেশে আগমন

করেন। ধর্ম প্রচার ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে ঐ সময় থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগত কিছুসংখ্যক আরব বণিকও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবকাশে ইসলাম প্রচারে অবতীর্ণ হন। বাংলাদেশের অসংখ্য মাজার ও প্রাচীন মসজিদসমূহ এ সকল ইসলাম-প্রচারক অলিআল্লাহদের পুণ্য স্মৃতি বহন করে চলেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদেশাগত মুসলমান হলেন শাসক সম্প্রদায় ও তাঁদের সঙ্গে আগত সিপাহী-সান্ত্রী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর রাজকার্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে তাঁরা এদেশে বিজয়াভিযান পরিচালনা করে গৌড়ের রাজা লক্ষণ সেনকে বিতাড়িত করে মুসলিম রাজত্ব কায়েম করেন। এ দু' শ্রেণীর বিদেশাগত মুসলমানদের মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্য যেমন ছিল, তেমনি আখলাক বা আচরণগত পার্থক্যও ছিল সুস্পষ্ট।

ধর্ম-প্রচারক মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার ও তাওহীদের মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করা। প্রচারক ও তাঁদের অনুসারী শিষ্যদের চরিত্র ছিল ত্যাগ-তিতিক্ষায় পরিপূর্ণ, পূত-পবিত্র, মাধুর্যময় ও অনুসরণযোগ্য। ইসলামের সর্বজনীন মানবতাবাদ, সাম্য-মৈত্রী, সুবিচার-সৌহার্দ্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সুমহান আদর্শ শতধাবিভক্ত পৌত্তলিক বাঙালী সমাজে এক বিস্ময়কর বিপ্লবের সূচনা করে। সুন্দর চরিত্রের অধিকারী মুবাল্লিগদের আদর্শ জীবনাচরণও সকলকে মুগ্ধ ও আকর্ষিত করে। ফলে জাতিভেদ প্রথা ও নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজ বিশেষতঃ নিম্নবর্ণীয় হিন্দু ও নির্যাতিত বৌদ্ধগণ দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এভাবে মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। ১২০৪ ঈসায়ীতে বাংলায় মুসলিম রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর ইসলাম ধর্ম এক অপ্রতিহত গতিতে প্রসার লাভ করে। এ ব্যাপারে রাজশক্তির যদিও কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না, তবু শাসক শ্রেণীর ধর্ম ইসলাম হওয়ার কারণে পরোক্ষভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারে এটা খানিকটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে অত্যল্পকালের মধ্যেই বাংলার অর্ধেকেরও বেশি লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়। বাংলার ইতিহাসে এত অল্প সময়ে বহিরাগত কোন ধর্ম এত অধিক সংখ্যক মানুষের নিকট গ্রহণীয় হয়েছে বলে জানা যায় না।

বাংলার জমীনে ইসলামের এ অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ ইসলামের বিশ্বজনীন মানবিক আবেদন; সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফপূর্ণ কল্যাণময় উদার আদর্শ। দ্বিতীয়তঃ বাংলার তৎকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক চরম বিপর্যস্ত অবস্থা। বাংলার জমীন থেকে জৈনধর্ম অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যেটুকু মানবতাবাদের অস্তিত্ব ছিল, তা নিয়ে বাংলার মাটিতে বৌদ্ধধর্ম হয়তো মোটামুটি স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতো। কিন্তু সেন আমলে ব্রাহ্মণদের রোষাণলে পতিত হয়ে বাংলার সমতলভূমি থেকে বৌদ্ধধর্ম সমূলে উৎক্ষিপ্ত হয়। পার্বত্য প্রত্যন্ত ও দুর্ভেদ্য বনাঞ্চলে এবং প্রচ্ছন্নভাবে লোকজ ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যদিও তার অস্তিত্ব কিছুটা বজায় ছিল কিন্তু বাঙালী সমাজে তার প্রকাশ্য সদর্প প্রকাশ ছিল প্রায় অসম্ভব। বাঙালী সমাজে তখন একমাত্র হিন্দু ধর্মেরই প্রচণ্ড দাপট। কিন্তু সে হিন্দুধর্ম বেদ-

উপনিষদের হিন্দুধর্ম নয়; হিন্দুধর্মের নামে তখন বহিরাগত আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদের সংকীর্ণ, বিভেদাত্মক, অনুদার পৌত্তলিক আদর্শই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বৃহত্তর হিন্দু সমাজ তখন অস্পৃশ্য, ঘৃণিত, নিগৃহীত, মানবেতর জীবন যাপন করছিল। শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজে উচ্চ-নীচের ব্যবধান ছিল অতিশয় প্রকট। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী, ছুঁতমার্গ, অবাঞ্ছিত অগণিত অমানবিক সংস্কার, ধর্মীয় নেতা ও সমাজপতিদের হৃদয়হীন শোষণ ও নৈতিকতাহীন স্বেচ্ছাচারে সমাজ-দেহ পঙ্কিল-বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ইসলামের আগমনকে তাই এ সমাজের নিগৃহীত, নীচ জাতীয় অগণিত মানুষ সোৎসাহে স্বাগত জানায়। ইসলামের প্রগতিশীল সাম্যবাদী মানবিক আদর্শ তখন বাংলার ভঙ্গুর সমাজ-ব্যবস্থায় এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করে। মুসলিম রাজ-শক্তি তখন ইসলাম প্রচারে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা প্রদান করলে এবং শ্রীচৈতন্য দেব প্রমুখ হিন্দু-সমাজপতি ও সংস্কারকগণ হিন্দ ধর্মের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনে ব্যাপকভাবে সচেষ্ট না হলে হয়তো সমগ্র বাঙালী সমাজই তখন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পড়তো।

ইসলামের এ অপ্রতিরোধ্য প্রসারের যুগেও সর্বাধিক অনুধাবনযোগ্য বিষয় হলো এই যে, মুসলিম রাজশক্তি কিংবা মুসলিম মুবাল্লিগগণ বা ধর্ম-প্রচাকরদের মধ্যে কখনো অসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। শাসক শ্রেণী তখন প্রতিরোধহীন রাজকীয় আধিপত্য লাভেই সন্তুষ্ট ছিলেন। ধর্ম-প্রচারকগণ নিজেদের চেষ্টায় প্রায় স্বাধীনভাবেই ধর্ম-প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন। অবশ্য বিরুদ্ধ শক্তির মুকাবিলায় স্থানীয়ভাবে কখনো এক-আধটা সংঘর্ষের সৃষ্টি হলেও সামগ্রিক ইতিহাসের পটভূমিতে তা ছিল অনেকটা উপেক্ষণীয়। বাংলায় ব্রাহ্মণ্য রাজশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সাথে তুলনা করলেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক ব্যাপক সামাজিক সংঘর্ষ, নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংস-লীলা সাধনের মাধ্যমে বৌদ্ধ-যুগের অবসান ঘটিয়ে ব্রাহ্মণ সেন রাজাদের আধিপাত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটেছে প্রায় শান্তিপূর্ণভাবে। ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ফলে অকস্মাৎ বাঙালী সমাজে আদর্শ ও মুল্যবোধগত তাৎপর্যময় ব্যাপক পুনর্বিন্যাস ও পরিবর্তন সংঘটিত হলেও তা কখনো ব্যাপক সামাজিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করেনি বা সামাজিক অগ্রগতির পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। বরং পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ সামাজিক কাঠামোতে নতুন প্রাণময় গতি সঞ্চারিত হয়েছে। মুসলমানদের সাথে অমুসলমানদের সম্পর্ক ছিল প্রীতিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যমূলক। রাজশক্তি মুসলিম হলেও সকল ধর্মের লোকদের প্রতি তাঁরা ছিলেন উদার ও সহনশীল। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এমন সম্প্রীতিপূর্ণ, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষহীন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের গতিশীল চিত্র বড় একটা পরিদৃষ্ট হয় না।

দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে আগত ব্রাহ্মণ সেন রাজাগণ সংস্কৃত ভাষাকে রাজ-দরবারের ভাষার মর্যাদা দেন। দেশীয় ভাষা বাংলা রাজ-দরবারে ঠাঁই পাওয়া তো দূরের কথা, বাংলা ভাষাকে তারা 'পক্ষীভাষা', 'ম্লেচ্ছ ভাষা', 'ইতর জনদের ভাষা' ইত্যাদি নানা তুচ্ছাত্মক অভিধায় আখ্যায়িত করে এ ভাষার চর্চাচারীগণ 'রৌরব' নামক নরকের অধিবাসী হবে বলে তারা ফতোয়া জারি করে। এ সত্ত্বেও সাধারণ বাঙালী মুখের ভাষা

হিসাবে বাংলাই ব্যবহার করতো। কারণ এছাড়া মনের ভাব ব্যক্ত করার অন্য কোন উপায় তাদের ছিল না। তবে দেশী ভাষায় সাহিত্য চর্চা করার সাহস বা পরিবেশ তখন ছিল না। অন্যদিকে, মুসলিম শাসনামলে রাজভাষা প্রথমে তুর্কী এবং পরে ফারসী হলেও দেশীয় ভাষা বাংলাকে তারা কখনো অবজ্ঞা করেনি। বরং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চায় তারা সর্বদাই যথোচিত পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছে। তাই বাংলা ভাষার প্রকৃত নবজন্ম ঘটেছে যেমন এ সময়েই বাংলা সাহিত্যেরও ব্যাপক চর্চা হয়েছে এ মুসলিম আমলেই। তার আগে বাংলা ভাষা ছিল যেমন দীন-হীন মৃতপ্রায়, বাংলা সাহিত্যেরও তেমনি পাল আমলের একমাত্র চর্যাপদ ছাড়া আর কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। ইসলামের সাম্যবাদী আদর্শ এবং মুসলিম শাসক-সম্প্রদায়ের ঔদার্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান সকলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার যথাযোগ্য অধিকার লাভ করে। অবশ্য ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক চেতনা ও ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে উভয়ের সাহিত্য স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এ সময় চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

ইংরেজ আগমনের সাথে সাথে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। হতাশাগ্রস্ত সামাজিক পরিবর্তনের বিশৃংখল পটভূমিতে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব ছিল না। ফলে পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান চোখে পড়ে না। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেন আমলকে যেমন 'তমসা-যুগ' বলা হয় এ যুগকেও তেমনি অনেকটা 'নিষ্ফলা যুগ' বলা যায়। তবে সেন আমলের মত এ যুগটি অতটা তমসাচ্ছন্ন ছিল না। রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত কবিরা এ সময় গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবস্থায় এক ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, যেগুলোকে ময়মনসিংহ গীতিকা, বাউল গান, কবিয়ালদের গান, গ্রাম্য ছড়া, গান, হেঁয়ালী, সারি, জারি, মুর্শিদী, বয়াতী, ফকিরী, কীর্তন, ভাটিয়ালী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা চলে। এর অধিকাংশই ছিল অতিশয় নিম্নমানের। এ জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে এক ধরনের মানসিক দৈন্য, হতাশা, নৈরাশ্য, বৈরাগ্য ও ক্ষেত্রবিশেষে হৃদয়বৃত্তির রুচিবিগর্হিত উৎকট প্রকাশ ঘটেছে।

উনবিংশ শতকের শুরুতেই সামাজিক অস্থিরতা ও মানসিক বৈরাগ্য ও দৈন্য ভাব বিদূরিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু সে লক্ষণ কেবল মাত্র বাঙালী হিন্দু সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কলকাতায় ১৮০০ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও ১৮১৭ সনে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার ফলে বাঙালী হিন্দু সমাজে নবজাগরণের সূচনা হয়। এ সময় রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪–১৮৩৩), ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২–১৮৫৯), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪–১৮৮৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭–১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–১৮৭৩), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫–১৮৯৪), রঙ্গলাল (জন্ম ১৮২৭), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০–১৮৭৪), বিহারী লাল চক্রবর্তী (১৮৩৫–৯৪), হেমচন্দ্র (১৮৩৮–১৯০৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪), প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক, সমাজ-সংস্কারক ও বিদ্বজ্জন ব্যক্তির

আবির্ভাবের ফলেও হিন্দু সমাজে জাগরণের এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তখনো এমন কোন পরিবর্তন বা জাগরণ পরিলক্ষিত হয়নি। বরং নবজাগ্রত হিন্দুদের বৈরিতা, ইংরেজদের বিরূপতা এবং রাজশক্তির অসহযোগিতার কারণে বাঙালী মুসলমান সমাজ তখনো চরম হতাশা ও দৈন্যদশার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছিল। সামাজিক কর্মযোগ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থেকে তাদের জীবন ছিল প্রায় বিচ্ছিন্ন। ফলে এ সময় তাদের মধ্যে বৈরাগ্য ভাব সৃষ্টি হয় ও আউল-বাউল শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব ঘটে। রাষ্ট্রীয় তথা বাস্তব দিক থেকে নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত হয়ে পড়ায়, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে শোষিত-বঞ্চিত হওয়ার ফলে এ সময় তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক বৈরাগ্যভাবেরও জন্ম হয়। পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশো বছর পর ১৮৫৭-তে 'মহাবিদ্রোহ', যা 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে বিশেষভাবে খ্যাত, ব্যর্থতা বরণের পর চরম বাস্তবতার নিদারুণ আঘাতে মুসলমানদের মধ্যে এ বৈরাগ্য ও নিরাসক্তভাবের অবসান ঘটতে থাকে। এরপর বাঙালী মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতা ফিরে আসতে শুরু করে, শিক্ষা, সাহিত্য ক্ষেত্রে তারা অগ্রসর হতে থাকে।

তাই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধকে মুসলমানদের আত্মগ্লানি অপনোদন, আত্ম-সচেতনতার বিকাশ ও আত্মজাগরণের উন্মেষকাল বলা চলে। দীর্ঘ সুপ্তির অবসান ঘটিয়ে নব উত্থানের প্রথম লগ্নে তাদের মধ্যে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেতনা পরিলক্ষিত হয়। এ স্বাতন্ত্র্য জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যেও তেমনি তাদের স্বকীয় ধর্মীয়বোধ, ভাব, বিষয়, উপজীব্য ও ঐতিহ্য-চেতনা ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষার ক্ষেত্রেও তাদের একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, কিন্তু শুরুতেই তা অতটা স্পষ্ট ছিল না, পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশেষ করে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) হাতে তা অতিশয় সুস্পষ্ট ও মহিমান্বিত রূপ লাভ করে।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানগণ যখন শিক্ষা-সাহিত্য ক্ষেত্রে এগিয়ে এল, তখনকার অবস্থাও একবার বিবেচনা করা দরকার। উনবিংশ শতকের শুরুতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছত্রছায়ায় ইংরেজ পাদ্রী ও ব্রাহ্মণ সংস্কৃত পণ্ডিতদের যৌথ চেষ্টায় বাংলা ভাষার রূপ পরিবর্তনের প্রয়াস চলে। আরবী-ফার্সী-উর্দু ভাষার অসংখ্য শব্দরাজি যা বিগত কয়েকশো বছর ধরে বাংলা ভাষার সাথে মিলেমিশে বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করে তুলেছিল, সেগুলোকে 'মুসলমানী জবান' রূপে আখ্যায়িত করে বাংলা ভাষা থেকে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে তার পরিবর্তে খাঁটি দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দরাজিতে পূর্ণ করে 'সংস্কৃতের দুহিতা' রূপে নতুন কৃত্রিম বাংলা চালু করা হয়। এ কৃত্রিম ভাষায় পাঠ্য বই রচনা করে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে রাতারাতি এটাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়। অধিকাংশ হিন্দু লেখক যথাসাধ্য এ নতুন 'সংস্কৃত বাংলায়' সাহিত্য চর্চার প্রয়াস পান। 'বাংলা গদ্যের জনক' নামে পরিচিত রামমোহন এবং মধুসূদনের ন্যায় যুগ-প্রবর্তক কবি এ ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে এ ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলেন। তাই উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানরা যখন শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসেন তখন তাঁরাও বহুলাংশে এ ভাষাই গ্রহণ করেন। অবশ্য একথাও

ঠিক যে, কালক্রমে ঈশ্বর চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের হাতে ফোর্ট উইলিয়মীয় 'সংস্কৃত বাংলা' বহুলাংশে মার্জিত ও সহজবোধ্য হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়তঃ ইংরেজী শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাবে উনবিংশ শতকের শুরুতেই বাঙালী হিন্দুর সমাজ ও ধর্মে পরিবর্তন, পুনর্বিন্যাস এবং সে সাথে নবজাগরণের আভাস পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে শিক্ষিত অনেক হিন্দু যারা সনাতন হিন্দু ধর্মকেই আঁকড়ে থাকতে চায় তারাও স্বধর্মে ব্যাপক সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ ধর্মীয় সংস্কার সাধনের প্রয়াসে অনেকে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য প্রমাণার্থে অন্য ধর্ম বিশেষতঃ ইসলাম ধর্ম তথা মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। বঙ্কিম ছিলেন এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। বঙ্কিম তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ইসলাম, মুসলমান ও মুসলমানদের ইতিহাস বিকৃত করে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য নানারূপ মিথ্যা ও বিকৃত ঘটনা ও অলীক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে মুসলমানদের নবাজাগরণ ও সাহিত্য চর্চার প্রয়াস প্রধানতঃ এ সনাতনপন্থী হিন্দুদের বিদ্বেষমূলক প্রচারণা ও চরম বিদ্বিষ্ট আঘাতেরই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার ফল। এ কারণে মুসলমানগণ তাঁদের সাহিত্যে ইসলামের শাশ্বত আদর্শ, মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও গৌরবময় অতীতের স্মৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতে আবেগ-উত্তেজনা ও আত্মরক্ষামূলক প্রবণতার প্রকাশ ঘটেছে। প্রচ্ছন্নভাবে এটা মুসলমানদের আত্ম-পরিচয় লাভ ও নবজাগরণের চেতনা সঞ্চারে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত। কালগত বিচারে নয়, উজীব্যগত ও শিল্পগত বিচারেই আধুনিকতার লক্ষণ বিচার করা হয়। মাইকেল মধুসূদনকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও সার্থক রূপকার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। মধুসূদনের শিক্ষা, জীবন-পরিবেশ, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গী বহুল পরিমাণে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। ইউরোপীয় শিক্ষা, সভ্যতা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য-প্রকরণ ইত্যাদি আত্মস্থ করে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী সাহিত্য সৃষ্টি করেন। মধুসূদন ইংরেজী ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করে তার অনুসরণে বিস্ময়কর কৃতিত্বের সাথে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকায়ন সম্পন্ন করেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন তাই বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতার সাথে তাঁর তেমন কোন পরিচয় ছিল না। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকায়নে তাই তাঁর জন্য সুবিধাই হয়েছিল। ইংরেজী ভাষার ছাত্র হওয়ার কারণে প্রচলিত বাংলা ভাষার জ্ঞানও তাঁর তেমন একটা ছিল না। তাই ইংরেজী সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে যখন তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করেন তখন পণ্ডিতদের সংস্কৃত বহুল বাংলাকেই তিনি মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। তাছাড়া, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ও চরিত্র নিয়ে রচিত, ইউরোপীয় মহাকাব্যের আদলে তৈরি ধ্রুপদ সাহিত্যে রচনায় সংস্কতবহুল ভাষাটাকে তিনি হয়তো বিশেষ উপযোগী বলেই বিবেচনা করেছিলেন। মধুসূদনের পরে যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেছেন তাঁরা অনেকেই তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। বিশেষ

করে এক্ষেত্রে হেমচন্দ্র (১৮৩৮-১৯০৩), নবীন চন্দ্র (১৮৪৭-১৯০৯), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫১) এসব বিশিষ্ট কবিদের নামোল্লেখ করা যায়।

কায়কোবাদসহ সমকালীন অনেক মুসলিম কবি-সাহিত্যিক মধুসূদন-প্রবর্তিত সাহিত্যের আঙ্গিক, প্রকরণ ও অন্যান্য শিল্পগত বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করলেও উপজীব্য, বিষয়, চরিত্র ও অনুপ্রেরণার দিক দিয়ে তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টি, স্বকীয় গৌরবময় ঐতিহ্য-চেতনা ও নব-জাগরণের উদ্দীপনা এ সময় তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান উপজীব্য হিসাবে গণ্য হয়। ইংরেজদের প্রভাবে 'ইঙ্গ-বঙ্গ' সমাজের সৃষ্টি, 'ইয়ং বেঙ্গল'দের আবির্ভাব, 'এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান'দের প্রাদুর্ভাব এ সময় যেমন বাঙালী হিন্দুসমাজকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে, বাঙালী মুসলিম সমাজে তেমন কোন সমস্যা ছিল না, ইসলামের প্রভাবে মুসলিম সমাজ এ সমস্ত সামাজিক অনাচার ও বিশৃংখলা থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিল। বরং ইসলামী ভাব-দর্শন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য-চেতনা তখন মুসলমানদের মধ্যে নব উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। এসবকে উপজীব্য করেই এ সময় মুসলমানদের সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত।

উনবিংশ শতকের এ যুগ-পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য চর্চা শুরু হয়।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১) উনবিংশ শতকের প্রথম উল্লেখযোগ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্য লেখক। কুষ্টিয়া জেলার লাহিনী পাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। জীবনের বেশির ভাগ সময়ে তিনি দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর পূর্বে উনবিংশ শতকে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন মুসলমান লেখকের পরিচয় পাওয়া যায় না। মুনশী শেখ আজিম উদ্দীন, শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী, মুনশী নামদার, করিমুন্নেছা খানম, গোলাম হোসেন প্রমুখ মীর মশাররফ হোসেনের পূর্বে যেসব মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁরা নামমাত্র এবং পুঁথি-রচয়িতা শ্রেণীর লেখক ছিলেন। তাই মীর মশাররফ হোসেনের মত উঁচুমানের শক্তিশালী মুসলিম লেখকের আবির্ভাব ছিল যেমন আকস্মিক তেমনি বিস্ময়কর। মীর মশাররফ হোসেনের উপর রচিত প্রথম গ্রন্থ-রচয়িতা অধ্যাপক আব্দুল লতিফ চৌধুরী বলেন ঃ

"আমরা আজ পর্যন্ত বিগত শতাব্দীর (উনবিংশ শতাব্দী) শ্রেষ্ঠ মুসলিম সাহিত্যসেবী মীর মশাররফ হোসেনের ৩৮ খানা গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি।"

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'মশাররফ রচনা সম্ভার'-এর সম্পাদক ডক্টর কাজী আব্দুল মান্নান বলেন ঃ "এখন পর্যন্ত মশাররফ হোসেনের মোট ৩৬ খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।"

এখানে মীর মশাররফ প্রকাশিত ২৭ খানা গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদত্ত হলো ঃ

১. রত্নাবতী (উপন্যাস, ১৮৬৯), ২. গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরি সেতু (কাব্য, ১৮৭৩), ৩. বসন্ত কুমার নাটক (১৮৭৩), ৪. জমিদার দর্পণ (নাটক, ১৮৭৩), ৫. এর

উপায় কি? (প্রহসন, ১৮৭৫), ৬. বিষাদ সিন্ধু (ঐতিহাসিক উপন্যাস মহরম পর্ব–১৮৮৫; উদ্ধার পর্ব–১৮৮৭; এজিদ পর্ব–১৮৯১), ৭. সঙ্গীত লহরী (গান, ১৮৮৭), ৮. গো-জীবন (প্রবন্ধ, ১৮৮৯), ৯. বেহুলা গীতাভিনয় (গদ্যে-পদ্যে রচিত নাটক, ১৮৮৯), ১০. উদাসীন পথিকের মনের কথা (আত্মজৈবনিক উপন্যাস, ১৮৯০), ১১. তহমিনা (উপন্যাস, ১৮৯৭), ১২. টালা অভিনয় (প্রহসন, ১৮৯৭), ১৩. নিয়তি কি অবনতি (নাটক, ১৮৯৮), ১৪. গাজী মিয়ার বস্তানী (আত্মজৈবনিক রচনা, ১৮৯৯) ১৫. মৌলুদ শরীফ (গদ্যে-পদ্যে লেখা মিলাদ শরীফ, ১৯০৩), ১৬. মুসলমানদের বাংলা শিক্ষা (পাঠ্য পুস্তক, ১ম ভাগ, ১৯০৩), ১৭. বিবি খোদেজার বিবাহ (কাব্য, ১৯০৫), ১৮. হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ (কাব্য, ১৯০৫), ১৯. হজরত বেলালের জীবনী (কাব্য, ১৯০৫), ২০. হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ (কাব্য, ১৯০৫), ২১. মদীনার গৌরব (কাব্য, ১৯০৬), ২২. মোসলেম বীরত্ব (কাব্য, ১৯০৬), ২৩. এসলামের জয় (গদ্য, ১৯০৮), ২৪. মুসলমানের বাংলা শিক্ষা (২য় ভাগ, ১৯০৮), ২৫. বাজিমাত (কাব্য, ১৯০৮), ২৬. আমার জীবনী (১ম খণ্ড, ১৯১০), ২৭. আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী (গদ্য, ১৯১০)।

উপরোক্ত তালিকা থেকে মীর মশাররফ হোসেনের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ও তাঁর প্রতিভার বহুমুখিতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর গ্রন্থ-সংখ্যা যেমন অনেক, তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্যও তেমনি বিস্ময়কর। একাধারে তিনি উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান, প্রহসন, প্রবন্ধ, আত্মজৈবনিক রচনা, পাঠ্য-পুস্তক ইত্যাদি লিখেছেন। তাঁর এসব রচনায় যেমন রয়েছে ধর্মভাব, ইতিহাস ও ঐতিহ্য-চেতনা, তেমনি রয়েছে সমাজ-সচেতনতা, সাময়িক প্রসঙ্গ, রাজনৈতিক বিষয়, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়। এত অসংখ্য বিষয়, ভাব ও অনুভূতি মশাররফ হোসেন তাঁর বিশাল সাহিত্যে এক অসাধারণ নৈপুণ্যে তুলে ধরেছেন। এর দ্বারা তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতা ও বর্ণিল পারঙ্গমতার বিষয়ই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত এবং তাঁর অনুপ্রেরণা সম্পর্কে জানা যায়, ছোটবেলায় তাঁর বাড়িতে পুঁথি পাঠের আসর বসতো। তিনি ছিলেন তার একজন বিমুগ্ধ শ্রোতা। বাউল কবি লালন শাহের এলাকায় তাঁর বাড়ি হওয়ার কারণে বাউল গানের দ্বারাও তাঁর মানস-প্রকৃতি কিছুটা প্রভাবিত হয। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদক কুমারখালির কাঙ্গাল হরিনাথের পত্রিকায়ও মশাররফ হোসেন প্রতি সপ্তাহে বার্তা পরিবেশন করতেন। এছাড়া, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সংবাদ-প্রভাকর'-এও তিনি সংবাদদাতার কাজ করতেন। এভাবে পুঁথিপাঠের আসরে বসবার অভিজ্ঞতা, বাউল গানের অধ্যাত্ম–চেতনা, সংবাদপত্রের অভিজ্ঞতা এবং জমিদারের কাচারীতে কার্যরত অবস্থায় অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের বিচিত্র স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তারই প্রতিফলন তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সাংবাদিক হিসাবে তিনি প্রথম জীবনে যে কাজ শুরু করেছিলেন তারই সূত্র ধরে তিনি এক সময় 'আজিজন নেহার' ও 'হিতকরী' নামক দুটি পত্রিকা প্রকাশেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

মীর মশাররফের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'রত্নাবতী'। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১। গ্রন্থের কাহিনী কৃত্রিম, উপকথা জাতীয়। তবে গ্রন্থকার এটাকে কৌতুকাবহ উপন্যাস হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। গ্রন্থের ভাষা কৃত্রিম সাধু বাংলা। যেমন– "রাজনন্দিনী যুবরাজ সুকুমারকে দর্শন করিবা মাত্র সগর্ব্বে স্বীয় সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি যুবরাজের নিকট বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করি।" গ্রন্থটির ভূমিকায় (বিজ্ঞাপন) লেখক লিখেছেন ঃ "গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার নামে পরিচয় দেওয়া এই আমার প্রথম উদ্যম। অতএব, ইহার মধ্যে শত শত দোষ বিদ্যমান থাকা সম্ভব।" গ্রন্থ প্রকাশের পর 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করে ঃ "ইহার লেখা অতি সরল, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু উপন্যাসটিতে বিশেষ চাতুর্য কিছু প্রকাশ পায় নাই।" মীর মশাররফের এ প্রথম গ্রন্থের ভাষা ও বর্ণনায় তাঁর পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অনেকটা স্পষ্ট।

মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'গোরাই ব্রিজ বা গৌরী সেতু'। এটি প্রকাশের পর, এর আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮৭৩ সনে 'বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন ঃ "তাঁহার (মশাররফ হোসেন) রচনার ন্যায়, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়।" 'গোরাই ব্রিজ' একটি কবিতার বই। তাই এ মন্তব্য করার সময় নিশ্চয়ই 'রত্মাবতী' উপন্যাসটির কথাই বঙ্কিম স্মরণ করে থাকবেন। তাছাড়া, মশাররফ হোসেনের কবিতার ভাষাও সহজ, প্রাঞ্জল ও সাধু প্রকৃতির।

'গোরাই ব্রিজ' প্রকাশের পর অক্ষয় কুমার সরকার 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন ঃ "গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে।... মীর মশাররফ হোসেনের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুরাগী হইবেন।"

১৮৭৩ সনেই মশাররফ হোসেনের 'বসন্ত কুমারী' ও 'জমিদার দর্পণ' নামে দু'খানি নাটক প্রকাশিত হয়। 'বসন্ত কুমারী' নাটকটি তাঁর লাহিনী পাড়ার নিজ বাড়িতে মঞ্চস্থ হয়েছিল। 'জমিদার দর্পণে'র নামকরণে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-৭৪) 'নীল দর্পণ' নাটকের কথা হয়ত মনে জাগতে পারে। এটা অস্বাভাবিক নয়। 'নীল দর্পণ' অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক ছিল। ১৮৬৩ সনে 'Nil Durpon, or the Indigo Planting Mirror' নাম দিয়ে A Native–এই ছদ্মনামে এর ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়। 'নীল দর্পণে'র জনপ্রিয়তা দেখে মশাররফ হোসেন হয়ত 'জমিদার দর্পণ' নাম নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু এর ভাব ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা। জমিদার কাচারীতে তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাজ করেন। তাই জমিদারের স্বভাব-প্রকৃতি ও জীবন-বৃত্তান্ত তাঁর বিশদরূপে জানা ছিল। নাটকে তারই রূপায়ণ ঘটেছে। এ নাটকে তাঁর সমাজমনস্কতার প্রতিফলন ঘটেছে।

১৮৭৬ সনে রচিত 'এর উপায় কি' মশাররফ হোসেনের একটি প্রহসন। ইতোপূর্বে রচিত মধুসূদনের 'একেই বলে সভ্যতা' ও 'বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁ' দুটো প্রহসনের খানিকটা প্রভাব এতে থাকলেও ভাব-বিষয় ও রচনা-শৈলীর দিক থেকে এটা স্বতন্ত্র।

মশাররফ হোসেনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'বিষাদ সিন্ধু'। ১৮৮৫-১৮৯১ পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছরে মোট তিন খণ্ডে রচিত বিপুলায়তন 'বিষাদ সিন্ধু' তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়। এ ঐতিহাসিক উপন্যাসটি মশাররফ হোসেনকে বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী অমরতা দান করেছে। এটি বাংলা ভাষায় সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি। এক সময় বাঙালী শিক্ষিত মুসলমানের প্রায় প্রতিটি ঘরেই 'বিষাদ সিন্ধু' শোভা পেত এবং বিশেষভাবে মহরম মাসে আসর করে এটি পাঠ করা হতো। 'বিষাদ সিন্ধু'র প্রথম পর্ব প্রকাশের পর 'ভারতী' (ফাল্গুন, ১২৯৩) পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় ঃ "ইহা মহরমের একখানি উপন্যাস ইতিহাস। ইহার বাঙ্গালা যেমন পরিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পরিস্ফুট নায়ক-নায়িকার চিত্রও ইহাতে তেমনি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটি বাঙ্গালা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

'বিষাদ সিন্ধু' সম্পর্কে 'গ্রাম বার্তা প্রকাশিকায়' (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২) লেখা হয় ঃ "ইহার এক একটি স্থান এরূপ করুণ রসে পূর্ণ যে, পাঠকালে চক্ষের জল রাখা যায় না। যাহারা মুসলমানদিগের মহরম পর্বের বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, অনুরোধ করি, তাহারা বিষাদ সিন্ধু পাঠ করুন মনোরথপূর্ণ হইবে। মুসলমানদের গ্রন্থ এইরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গ ভাষায় অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।"

'বিষাদ সিন্ধু' সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান বলেনঃ "পুঁথি সাহিত্যে মহরমের কাহিনী ইতিপূর্বেও প্রচলিত ছিল। 'মুক্তাল হোসেন', 'জারী-জঙ্গনামা' প্রভৃতি পুঁথি মশাররফ হোসেনের বহু পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। সুতরাং 'বিষাদ সিন্ধু'র গল্প এমন কিছু নূতন নয়। তবে তাহা মশাররফ হোসেনই সর্বপ্রথমে সাধু ভাষায় সঙ্কলন করেন। অবশ্য চরিত্র চিত্রণের মধ্যেও বহু স্থানে তাঁহার মৌলিকতা প্রকাশ পাইয়াছে।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, তৃতীয় প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৫১৫)।

'বিষাদ সিন্ধু' ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাস হলেও এতে ইতিহাসকে হুবহু অনুসরণ করা হয়নি। উনবিংশ শতকে ইসলামী ভাব ও মুসলিম পুনর্জাগরণের যে উদ্দীপনাপূর্ণ প্রয়াস সমকালীন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, মীর সাহেবের রচনায় তার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষণীয়। 'বিষাদ সিন্ধু'এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'বিষাদ সিন্ধু'কে যেমন উপন্যাস বলা মুস্কিল, তেমনি একে ইতিহাস গ্রন্থ বলাও চলে না। কারণ পাঠকের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে লেখক ইতিহাসের কিছুটা অপলাপ ঘটিয়ে নিজস্ব কল্পনা ও কিছুটা অতিশয়োক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যদিকে, আধুনিক উপন্যাসের শিল্প-রীতিও এতে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা হয়নি। তবে এটাকে মধ্যযুগীয় পুঁথি সাহিত্যের ঢং-এ আধুনিক উপন্যাসের ভঙ্গীতে রচিত ইতিহাসাশ্রয়ী রচনা বলা যেতে পারে। কাহিনী, চরিত্র, ভাষা ও বর্ণনার গুণে এটা এক অসাধারণ পাঠকপ্রিয় গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের এক বিষাদ-করুণ ঘটনাকে লেখক মানবিক সংবেদনা ও আর্তিতে পূর্ণ করে অপরূপ বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণের আশ্চর্য কুশলতায়

'বিষাদ সিন্ধু'কে এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থে পরিণত করেছেন। এটা বাংলা সাহিত্যের এক সফল ক্লাসিক গ্রন্থ এবং মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

'বিষাদ সিন্ধু'র আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর অপরূপ বাক্-বিন্যাস। অলংকারপূর্ণ ভাষা, চিত্তাকর্ষক বর্ণনা, আবেগ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ সুরময় স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ও নৈপুণ্যময় বাক্-বিন্যাস 'বিষাদ সিন্ধু'কে এক অপরূপ কাব্য-মহিমা দান করেছে। ঘটনা ও কাহিনীর দিক থেকে এটাকে মহাকাব্যধর্মী বলা চলে। তাই সবকিছু মিলিয়ে 'বিষাদ সিন্ধু' বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ ব্যতিক্রমী গ্রন্থ। গদ্য, কাব্য, ইতিহাস, উপন্যাস ও মহাকাব্যের এক আশ্চর্য সমন্বয়।

'বিষাদ সিন্ধু'র মত 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়ও উপন্যাসের শিল্পরীতি সংযম ও নিষ্ঠার সাথে অনুসৃত হয়নি। এ জাতীয় রচনায় ঘটনা, কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে লেখকের যতটা আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, উপন্যাসের প্রকৃতি ও শিল্পরীতির প্রতি লেখকের ততটা সজাগতা লক্ষ্য করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, উপন্যাসের ঢং-এ লেখা হলেও এটা উপন্যাস নয়, নীলকর সাহেবদের জুলুম-নির্যাতনের মর্মন্তদ কাহিনীতে পূর্ণ এক বাস্তব উপাখ্যান। লেখক নিজেই এখানে উদাসীন পথিক। ক্যানি সাহেব তার জমিদারীতে কীভাবে প্রজাসাধারণের উপর জুলুম করে ধানের বদলে নীলের চাষ করাতো, কীভাবে প্রজাদেরকে কুঠি পাহারায় নিয়োজিত করতো, অন্যান্য জমিদারগণ তার অত্যাচার থেকে প্রজাদের বাঁচাবার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, প্রজা-বিদ্রোহ, গভর্নরের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি নানা ঐতিহাসিক বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে এখানে কাহিনীর পত্র-পল্লব বিকশিত হয়েছে। কাহিনী যেমন বাস্তবধর্মী, ভাষা ও বর্ণনা কৌশলে সাধারণ পাঠকের নিকট তেমনি তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

'গাজী মিয়ার বস্তানী' মীর মশাররফ হোসেনের আর এক বিস্ময়কর বিশালকার সৃষ্টি। এতে সর্বমোট ২৪টি নথি বা অধ্যায় রয়েছে। প্রথম খণ্ডে ২০টি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৪টি নথি সন্নিবেশিত হয়েছে। এটাকেও ঠিক উপন্যাস বলা যায় না, কালিপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নক্সা'র মত এটা একটি নক্সা। এতে লেখকের নাম ছিল না। উপরে লেখা ছিল, 'সত্ত্বাধিকারী উদাসীন পথিক'। অনেকে এটিকে মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা বলতে চান। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে যদিও এটা 'বিষাদ সিন্ধু'র সমকক্ষ নয়, কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্য, চরিত্র-চিত্রায়ন, সমাজ-বাস্তবতার সার্থক উপস্থাপন ও শিল্প-সম্ভাবনার দিক থেকে এটা তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং বাংলা সাহিত্যেরও এক মূল্যবান সম্পদ তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের মতে ঃ "গাজী মিয়ার বস্তানী' একখানি বিচিত্র সমাজচিত্র সুশোভিত, সুলিখিত উপন্যাস। ইহাতে নাই এমন রস দুর্লভ।"

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান 'গাজী মিয়ার বস্তানী'র কাহিনীর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ঃ "গল্পের আরম্ভ বা 'বস্তানী শুরু'– অরাজকপুরের হাকিম ভোলানাথ, কুঞ্জনিকেতনের বিধবা বেগম পয়জারুন্নেসাকে লইয়া। দ্বিতীয় নথিতে 'সবলেট চৌধুরী'র কথা। বস্তানী প্রথম হইতে শেষ এমনি হাল্কা কথায় অনেকটা 'হুতোম পেঁচার নক্সা'র রীতিতে লেখা। ইহা উনবিংশ খৃস্টাব্দের মুসলিম পতন যুগের সামাজিক চিত্র।

অবশ্য সমাজের সব স্তরের চিত্র ইহাতে তেমন প্রতিফলিত হয় নাই যেমন হইয়াছে জমিদার, লম্পট ও অসৎচরিত্রের ছায়াপাত। 'হুতোম পেঁচার নক্সা', 'আলালের ঘরের দুলাল' আর 'গাজী মিয়ার বস্তানী' অনেকটা এক জাতীয় রচনা। তবে বস্তানী যতখানি বাস্তবভিত্তিক 'আলালের ঘরের দুলাল' অথবা 'হুতোম পেঁচার নক্সা' ঠিক সেই অনুপাতে বাস্তবভিত্তিক কিনা স্থির নিশ্চয় হইয়া বলিবার উপায় নাই। 'গাজী মিয়ার বস্তানী'ও একটি 'জমিদার দর্পণ'। মোগল অধিকারের পর মৈমনসিংহের অনেক পাঠান জমিদার বহুকাল পর্যন্ত মধুপুরের জঙ্গলে গোপনে বাস করিতেন।... মোশারফ হোসেন এই জমিদারের চরম পতনের যুগ দেখিয়াছেন এবং তাহাদের চিত্র আঁকিয়াছেন।....

"…. উপন্যাস হিসাবে ইহা যে বিশেষ উঁচুদরের তাহা বলিবার উপায় নাই। কারণ ইহাতে ঘটনা অনেক থাকিলেও সবগুলি এক সূতায় গ্রথিত হইয়া জমাট বাঁধে নাই। অনেক কথা রাখিয়া-ঢাকিয়া বলিতে হইয়াছে। অনেক কথা অপ্রকাশ থাকিয়া গিয়াছে। তাছাড়া বস্তানীকে কাহিনী করিয়া তুলিবার দিকে লেখকের তেমন দৃষ্টি ছিল না।.... বস্তানীতে ঘটনা অনেক থাকিলেও ঘটনার ভিতর দিয়া চরিত্র ফুটিয়া উঠে নাই। চরিত্র সৃষ্টি হইয়াছে লেখকের বর্ণনায়, ধিক্কারে, অতিশয়োক্তিতে; নানা কাজের ভিতরে নানা আবেষ্টনীর সংঘাতে এ চরিত্র আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয় নাই। ইহাতে কল্যাণবোধ আছে কিন্তু তাহা স্থূল, মানসতা ও মননশীলতার গভীর হইতে উদ্ভূত নয়। তবু যে এ গ্রন্থ মর্মস্পর্শী তাহার কারণ রসানুভূতি নয়– সামাজিক কল্যাণবোধ।" (নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান/বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯২, পৃ. ৫১৬, ৫১২)।

মীর মশাররফ হোসেনের 'সঙ্গীত লহরী', 'গোজীবন', 'বেহুলা গীতাভিনয়', 'মৌলুদ শরীফ' প্রভৃতি কাব্য, প্রবন্ধ, গীতিনাটক, নাত-এ-রাসূল ইত্যাদির মধ্যে একাধারে তাঁর প্রতিভার বহুমুখিতা এবং প্রেম ও মরমী ভাবের প্রকাশ লক্ষণীয়।'

মশাররফ হোসেনের সমগ্র সাহিত্য-কর্মকে মোটামুটি সাত ভাগে বিভক্ত করা চলেঃ

(এক) উপন্যাস জাতীয় রচনা। রত্নাবতী, বিষাদ সিন্ধু, উদাসীন পথিকের মনের কথা, তহমিনা এ শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থ।

(দুই) আত্মচরিতমূলক রচনা। গাজী মিয়ার বস্তানী, আমার জীবনী, আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী প্রভৃতি এ শ্রেণীভুক্ত। অবশ্য গাজী মিয়ার বস্তানী উপন্যাসের ঢং-এ লেখা আবার উদাসীন পথিকের মনের কথাও বহুলাংশে আত্মজীবনীমূলক রচনা।

(তিন) নাটক। বসন্ত কুমারী নাটক, জমিদার দর্পণ, বেহুলা গীতাভিনয়, নিয়তি কি অবনতি এ শ্রেণীর অন্তর্গত।

(চার) প্রহসন। এর উপায় কি? টালা অভিনয় এ শ্রেণীভুক্ত।

(পাঁচ) কবিতা ও গান। গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরি সেতু, মৌলুদ শরীফ, বিবি খোদেজার বিবাহ, হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ, হজরত বেলালের জীবনী, হজরত আমীর

হামজার ধর্মজীবন লাভ, মদীনার গৌরব, মোসলেম বীরত্ব, এসলামের জয়, বাজিমাত ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ।

(ছয়) প্রবন্ধ। গো-জীবন মশাররফ হোসেনের একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ।

(সাত) পাঠ্য-পুস্তক। মুসলমানের বাংলা শিক্ষা ১ম ভাগ, মুসলমানের বাংলা শিক্ষা ২য় ভাগ তাঁর পাঠ্য-পুস্তক জাতীয় রচনা।

মশাররফ হোসেনের রচনায় মোটামুটি তিনটি বিষয় প্রাধান্য লাভ করেছে।

(এক) ধর্মীয় ভাব, মুসলিম ঐতিহ্য ও ইতিহাস চেতনা।

(দুই) স্বদেশ-প্রীতি, সমাজ-সচেতনতা, সমাজ-সংস্কার ও কল্যাণবোধ।

(তিন) মানবিক প্রেম ও মরমী সংবেদনশীলতা।

উনবিংশ শতকের সকল মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের রচনায় এ বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি, মানবিক সংবেদনা ও লাঞ্ছিত-দুর্দশাগ্রস্ত সমাজের প্রতি আত্যন্তিক সহানুভূতি ও কল্যাণকামিতা তাঁর রচনার কেন্দ্রীয় ভাব।

মশাররফ হোসেনের সমকালে একদিকে বিদেশী শাসকের শোষণ, নীলকর সাহেবদের হৃদয়হীন পীড়ন এবং অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শক্তির দেশীয় প্রতিভূ নব্য জমিদার ও সামন্ত প্রভুদের অমানুষিক অত্যাচার উপরন্ত উকিল-মোক্তার-পেশকার-পেয়াদা-ফরিয়া-বরকন্দাজ-মৃৎসুদ্দি ইত্যাদি শ্রেণীর অসৎ-বাটপার লোকদের শোষণ-জুলুমে সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন তখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মশাররফ হোসেনের দরদী মন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ নিগৃহীত মানবতার বিচিত্র সকরুণ চিত্র অঙ্কন করেছে। সমাজের বিভিন্ন দুর্বলতা, স্খলন-পতন ও অন্যায়-অবিচারের কথা বিচিত্র রস ও ভঙ্গীতে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে মশাররফ হোসেন আশ্চর্য কুশলতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্য-লেখক মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য প্রতিভা। তাঁর বিচিত্র অবদান বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যমান সম্পদ। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের গদ্য-রীতির অনুসরণ করলেও শিল্প-রীতির ক্ষেত্রে তিনি কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অনুসরণ করেননি। তবে টেকচাঁদ, বঙ্কিম, কালিপ্রসন্ন, দীনবন্ধুর কিছু কিছু প্রভাব ক্ষেত্র বিশেষে লক্ষণীয়। সবক্ষেত্রে তাঁর নিজস্বতাও অনেকটা স্পষ্টগ্রাহ্য। মশাররফ হোসেনের অনেকগুলো গ্রন্থ বিংশ শতকের প্রথম দিকে রচিত হলেও তাঁর প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলো উনবিংশ শতকে রচিত। তাছাড়া, তাঁর মানস-প্রকৃতি ও চিন্তা-চেতনা সবকিছুই উনবিংশ শতকের সমাজ-পরিবেশ ও আবেগ-অনুভূতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এ দিক দিয়ে যথার্থ অর্থেই তিনি উনবিংশ শতকেরই লেখক এবং নিঃসন্দেহে উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্য–শিল্পী– তাঁর সমকালে এক্ষেত্রে একমাত্র বঙ্কিমের সাথেই তাঁর তুলনা চলে।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন ঃ জীবন ও সাহিত্য

ভূমিকা

বাংলা কথা-সাহিত্যে পণ্ডিত মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন একজন অতি জনপ্রিয় কথাশিল্পী হিসাবে সুপরিচিত। পেশাগত দিক থেকে তিনি একজন পণ্ডিত বা শিক্ষক ছিলেন তাই সকলে সম্মান করে তাঁকে 'পণ্ডিত' সম্বোধন করতেন। তাই তাঁর নামের আগে এ শব্দটি অনেকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, তিনি নিজে তাঁর নামের আগে এ শব্দ কখনো ব্যবহার করেননি। সাহিত্যিক হিসাবে তিনি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় হওয়ার কারণে তিনি 'সাহিত্য-রত্ন' উপাধি লাভ করেছিলেন। নজিবর রহমান এ উপাধিতে সুপরিচিত হলেও নিজে কখনো এটা ব্যবহার করেননি।

অর্থাৎ 'পন্ডিত' ও সাহিত্য-রত্ন এ দু'টি পদবী ও উপাধি তাঁর নামের আগে-পরে অন্যরা ব্যবহার করলেও তিনি নিজে কখনো ব্যবহার করেননি। নজিবর রহমানের নামের বানান বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে লিখে থাকেন। ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন 'নজিবর রহমান, 'মুজিবর রহমান' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড), ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন, 'নজীবুর রহমান' (মুসলিম বাংলা সাহিত্য), আবুল হাসনাত ও আব্দুল হক লিখেছেন শুধু 'নজিবর রহমান', মনসুর মুসা লিখেছেন 'নজিবুর রহমান' (পূর্ব বাংলার উপন্যাস) প্রভৃতি। কিন্তু লেখক তাঁর নিজের নামের বানান আগাগোড়া একইভাবে লিখেছেন ঃ 'মোহাম্মদ নজিবর রহমান' আর সাধারণভাবে অন্যদের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন 'মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন' হিসাবে। অতএব, অনবধানবশতঃ তাঁর নামের বানান নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা অনুচিত।

মোহাম্মদ নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা', 'প্রেমের সমাধি', 'হাসান-গঙ্গা বাহমনি', 'গরীবের মেয়ে' প্রভৃতি কালজয়ী উপন্যাস এক সময় উভয় বাংলার

সকল শিক্ষিত পরিবার, বিশেষতঃ মুসলিম পরিবারে এক রকম অবশ্য পাঠ্য পুস্তক হিসাবে বিবেচিত হতো। তাঁর প্রথম এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় ও শিল্প-সফল উপন্যাস 'আনোয়ারা' প্রকাশের সাথে সাথে এটি বিপুলভাবে জনসমাদৃত হয় এবং এর মাধ্যমে লেখক নজিবর রহমানও বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করেন। বিয়ে, জন্মদিন, স্কুল-কলেজের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠান ও যেকোন স্মরণীয় অনুষ্ঠানে এক সময় 'আনোয়ারা', 'প্রেমের সমাধি', 'গরীবের মেয়ে' প্রভৃতি উপন্যাস উপহার হিসাবে প্রদান করা অনেকটা রেওয়াজে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এসব গ্রন্থ সেকালে স্কুল-কলেজের গ্রন্থাগার ছাড়াও পারিবারিক সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করাও অনেকটা সামাজিক মর্যাদার বিষয় হিসাবে গণ্য হতো।

নজিবর রহমান বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কথাশিল্পী এবং এখনো পর্যন্ত এক অসামান্য জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক, যাঁর লেখায় বাঙালী মুসলিম পরিবার, সমাজ, জীবন-চিত্র, মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দ মিশ্রিত ভাষা ও সাধারণভাবে বাঙালী সমাজ-চিত্র, বাস্তব অবস্থা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে ফুটে উঠেছে। সর্বোপরি সনাতন প্রেমের মহত্তম আদর্শ ও উদার মানবিক রসে তাঁর সাহিত্য ঋদ্ধ ও জারিত। এ কারণেই তাঁর সাহিত্য এক চিরায়ত ধ্রুপদ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে এবং লেখক নিজেও বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে চির অমরত্ব লাভে সমর্থ হয়েছেন।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথিতযশা এবং প্রথম সার্থক ও সর্বাধিক জনপ্রিয় মুসলিম ঔপন্যাসিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্ম ও বংশ-পরিচয় সম্পর্কে নানা মত ও ধারণা প্রচলিত রয়েছে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান বলেন ঃ "তাঁহার জন্ম তারিখ সরকারী লোয়ার সাবোর্ডিনেট এডুকেশন্যাল সারভিসের লিস্ট অনুসারে ১৯৭৮। চাকুরীর বয়স অনেক সময় কিছু কম থাকে। কেহ তাঁহার জন্ম তারিখ ১৮৬০ খৃঃ মনে করেন। সরকারী লিস্টি হইতে প্রকৃত বয়স ১৮ বৎসরের পার্থক্য হওয়া সম্ভব নয়। ২/৪ বৎসর এদিক-ওদিক হইতে পারে কিন্তু একেবারে ১৮ বৎসরের হইবে ইহা সহজে মনে করা যায় না। মনে হয় যাঁহারা বলেন নজিবর রহমানের জন্ম ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, তাঁহাদের ধারণাই সঠিক।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, তৃতীয় প্রকাশ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ৫৮৩–৫৮৪)।

অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (আধুনিক যুগ), ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' এবং ডক্টর মুস্তফা নূরউল ইসলাম-এর 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থত্রয়ে নজিবর রহমানের জন্ম সন ১৮৭৮ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি ১৯৫৮ সনে ব্যক্তিগতভাবে নজিবর রহমানের নিজ গ্রামের সুবিখ্যাত 'খাস চরবেলতৈল বালিকা বিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠাঃ ১৮৯২)-এর প্রধান শিক্ষক আমার দাদা মুনশী ওয়াহেদ আলী পণ্ডিত যিনি ১৮৯৪-১৯৫৪ পর্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং যিনি নজিবর রহমানের নিকটতম

প্রতিবেশী এবং নজিবর রহমানের প্রথমা স্ত্রীর চাচাত ভাই এবং সর্বশেষ স্ত্রীর শিক্ষক ছিলেন), আমার দাদী মোছাম্মৎ রমিছা খাতুন (তিনিও উক্ত বিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরকাল শিক্ষয়িত্রী ছিলেন), মুনশী আফজাল হোসেন (নজিবর রহমানের প্রথমা স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র) এবং নজিবর রহমানের আপন ভ্রাতুষ্পুত্র আমজাদ হোসেনের (বর্তমানে তাঁরা সকলেই মরহুম) বাচনিক মতে নজিবর রহমানের জন্ম ১৮৫২ সন বলে আমার এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম (দৈনিক আজাদ, ২২শে চৈত্র, ১৩৬৫)। বলতে দ্বিধা নেই, উক্ত জন্ম সাল যে সম্পূর্ণ সঠিক সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার মত কোন তথ্য-প্রমাণ আমার হাতে নেই। উপরোক্ত প্রবীণ ব্যক্তিদের মৌখিক ভাষ্য মতে আমার অনুরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন অন্য কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে আমার ধারণাকেই সমর্থন করেন। (দ্র. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১৩৭১, পৃ. ১৭৭)।

আ.কা.শ.নূর মোহাম্মদ মোহাম্মদ নজিবর রহমানের জন্ম সন উল্লেখ করেছেন ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ। (পূর্বোক্ত পৃ. ১৭৭)। ডক্টর আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ১৯৬৪), আবুল হাসনাত প্রণীত 'মুসলিম রচিত উপন্যাস' (প্রথম প্রকাশ ১৯৭০), বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক আব্দুল কাদির তাঁর রচিত 'কথাশিল্পী মোহাম্মদ নজিবর রহমান' (উত্তরাধিকার, ৯ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা জুন, ১৯৮১), গবেষক বুলবুল ইসলাম তাঁর রচিত 'বাংলা সাহিত্যে নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের অবদান' (ঐতিহ্য-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা) প্রমুখ সকলেই নজিবর রহমানের জন্ম সন ১৮৬০ বলে উল্লেখ করেছেন। ডক্টর গোলাম সাকলায়েন তাঁর রচিত 'মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন' প্রবন্ধে (বাঙলা একাডেমী পত্রিকা পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৪) লেখকের জন্ম ১৮৬০ বলে উল্লেখ করেও বাক্যের ভিতর বন্ধনীর সাহায্যে বলেছেন 'মতান্তরে ১৮৪৭ খ্রি.'। এ বিষয়ে ডক্টর মযহারুল ইসলাম বলেন ঃ

"এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যেসব নির্ভরযোগ্য প্রমাণপঞ্জী হস্তগত হয়েছে তার মধ্যে লেখকের আত্মীয়-স্বজনের মৌখিক বিবরণ ও পত্রাদির একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে বলে মনে হয়। এসব প্রামাণিক তথ্যে তাঁর জন্ম বাংলা ১২৬০ থেকে ১২৬৬ সালের মধ্যে বলা হয়েছে। এই বাংলা সালকে খ্রীস্টীয় অব্দে রূপান্তরিত করে নজিবর রহমানের জন্মকাল ১৮৫৪ হতে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।" (মোহাম্মদ নজিবর রহমান, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ২)।

আর একটি তথ্য পেশ করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করবো। ১৯৯৭ সনে নজিবর রহমান স্মৃতি সংসদে'র উদ্যোগে নজিবর রহমানের ৭৪তম মৃত্যু-বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে আমি চর বেলতৈল যাই। তখন সাহিত্য-রত্নের জনৈক অধঃস্তন বংশধর সৈয়দ শুকুর মাহমুদ (নজিবর রহমানের বড় ভাই আয়েন উদ্দিনের চতুর্থ পুত্র মকবুল হোসেনের দ্বিতীয় পুত্র) নজিবর রহমানের জন্ম ১৮৬০ সনের ২২শে জানুয়ারী বলে উল্লেখ করে। পারিবারিক সূত্রে সে এ তথ্য অবগত হয়েছে বলে

আমাকে জানায়। যদি তার এ তথ্য সত্য হয় তাহলে নজিবর রহমানের জন্ম সন এমনকি, জন্ম তারিখ সম্পর্কেও আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আপাততঃ অন্য কোন তথ্য উদ্‌ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত এর উপরই আমরা ভরসা করতে পারি।

নজিবর রহমানের মৃত্যুর সন-তারিখ নিয়েও নানা মত প্রচলিত আছে। চর বেলতৈলের বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের বাচনিক শুনে আমি আমার পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তাঁর মৃত্যু সন ১৯২৫ বলে উল্লেখ করেছিলাম। পরবর্তীতে আমার এ মত অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, আ. কা. শ. নূর মোহাম্মদসহ অনেকেই সমর্থন করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যে' তাঁর মৃত্যু সন ১৯৩৫ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করেছেন ডক্টর গোলাম সাকলায়েন তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে। এতে তিনি উল্লেখ করেন যে, মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের মৃত্যুর কয়েক দিন পর কলিকাতার তদানীন্তন কালের বিখ্যাত মুসলিম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সোলতান (নব পর্যায়)'-এর ৯ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৩০ (৮ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা, ২৬শে অক্টোবর, ১৯২৩) তারিখে উক্ত পত্রিকার ২২নং পৃষ্ঠায় 'শোক সংবাদ' শিরোনামে নিম্নোক্ত খবরটি ছাপা হয় ঃ

"পাবনা হাটিকুমরুল" নিবাসী কবি মৌলবী মোহাম্মদ নবিজর রহমান সাহেব গত কয়েক মাস নানাবিধ জটিল পীড়ায় আক্রান্ত থাকিয়া গত বৃহস্পতিবার বেলা ৭/৮ ঘটিকার সময় সংসারের সমুদয় মায়া ছিন্ন করতঃ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন। ইহার রচিত 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য', 'আনোয়ারা', 'হাসানগঙ্গা, বাহমনি', 'গরীবের মেয়ে' ও মুসলমান সমাজের কতিপয় পাঠ্য পুস্তক রহিয়াছে। ইহার ন্যায় শান্ত, ধীর, উদারচেতা ও বিনয়ী লোক জগতে দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া শোক প্রকাশের জন্য অনেক স্থানে স্কুল, মাদ্রাসা ও মক্তবাদি বন্ধ ছিল।"

নজিবর রহমানের জন্মস্থান সম্পর্কেও কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন ও ডক্টর এনামুল হক তাঁর জন্মস্থান পাবনা জেলার (বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলা) অন্তর্গত শাহজাদপুর থানার 'বেলতৈল' গ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য কবি আব্দুল কাদির ও ডক্টর গোলাম সাকলায়েন সঠিকভাবে 'চর বেলতৈল' বলে উল্লেখ করেছেন। বেলতৈল ও চর বেলতৈল গ্রাম দুটি পাশাপাশি অবস্থিত। বেলতৈল গ্রামটি এক সময় ছিল হিন্দু প্রধান, এককালে এখানে হিন্দু জমিদার, জোতদার, বিত্তশালী ব্যবসায়ী, মহাজন ও বিভিন্ন পেশাজীবী-স্বর্ণকার, কর্মকার, জেলে, মুচি, ছুতার, গোয়ালা ইত্যাদি বিভিন্ন পেশাজীবী হিন্দুদের বাস ছিল। অন্যদিকে, চর বেলতৈল গ্রামটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এর সকল অধিবাসীই নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান। এ গ্রামে কোন অমুসলমানের বাস কখনো ছিল না, এখনো নেই। গ্রামবাসী প্রায় সকলেই কৃষিজীবী। তবে শিক্ষার প্রচলন আছে পূর্বকাল থেকেই। উনবিংশ শতকের শেষ পাদে মুসলিম নবজাগরণের উষালগ্নে ১৮৯২ সনে এই গ্রামে মুনশী জহির উদ্দীন পণ্ডিতের

(নজিবর রহমানের ভগ্নীপতি) উদ্যোগে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং জহির উদ্দীনের ছোট ভাই মুনশী ওয়াহেদ আলী পণ্ডিত ১৮৯৪ সন থেকে অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে এবং তদীয় স্ত্রী মোছাম্মৎ রমিছা খাতুন সহকারী শিক্ষয়িত্রী হিসাবে অত্র এলাকায় শিক্ষার আলো বিস্তার করেন।

নজিবর রহমানের পারিবারিক সূত্রে আমি যে তথ্য অবগত হয়েছি, তা থেকে জানা যায়, তাঁর পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস ছিল ইরাকের রাজধানী বাগদাদে। দিল্লী-সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁর জনৈক পূর্বপুরুষ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানে এসে দিল্লীর নিকটবর্তী আজমীরে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের নবাবের আমন্ত্রণে তিনি মুর্শিদাবাদ আসেন এবং লাখেরাজ সম্পত্তির পত্তনি নিয়ে পর্যাপ্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। সাহিত্য-রত্নের জনৈক পূর্বপুরুষ নবাব আলীবর্দী খাঁর স্টেট ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন বলেও জানা যায়। এ সম্পর্কে আমার নিজ গ্রাম চর বেলতৈলের প্রবীণ ব্যক্তিদের এবং সাহিত্য-রত্নের নিকটাত্মীয় (নজিবর রহমানের বড় ভাই আয়েন উদ্দিনের দ্বিতীয় পুত্র) মরহুম আমজাদ হোসেনের বর্ণনা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ১৩৬৫ সনে যে নিবন্ধ লিখেছিলাম, তার অংশবিশেষ নীচে উদ্ধৃত হলোঃ

"মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের পূর্বপুরুষগণ তৎকালীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের অধিবাসী। তাঁহার জনৈক পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদের নবাবের স্টেট ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নবাব পরিবারের জনৈকা পরমা সুন্দরী বিধবা মহিলার সঙ্গে উক্ত ম্যানেজার সাহেব প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন। ক্রমে উভয়ের প্রেম প্রগাঢ় হইয়া উঠে। একদিন গোপনে তাঁহারা রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়েন। নবাবের ভয়ে তাঁহারা সুদূর পাবনা জেলার (বর্তমানে সিরাজগঞ্জ) শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত মালতিডাঙ্গা গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়া বৈবাহিক জীবন যাপন করিতে থাকেন এবং আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে 'মীর্জা' উপাধির পরিবর্তে 'সরকার' উপাধিতে পরিচিত হইতে থাকেন।" (দৈনিক আজাদ, ২২শে চৈত্র, ১৩৬৫)।

'মালতিডাঙ্গা' মতান্তরে শাহজাদপুর থানার 'পাড়কোলা' গ্রামে উক্ত ম্যানেজার মোহাম্মদ বালকচাঁদ মীর্জা বসতি স্থাপন করেন। পাড়কোলা গ্রাম থেকে তাঁর বংশের একটি অংশ পরবর্তীতে শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত পোতাজিয়া ইউনিয়নের 'রেশমবাড়ী' (চৌচির) গ্রামে, অন্য একটি অংশ বেলতৈল ইউনিয়নের 'আগনুকালি'তে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে আগনুকালি থেকে হুড়াসাগর নদীর বুকে জেগে ওঠা চর– যা পরে 'চর বেলতৈল' নামে পরিচিত হয়, সেখানে নজিবর রহমানের উর্ধ্বতন তৃতীয় পুরুষ অর্থাৎ তাঁর দাদা মুল্লুক চাঁদ বসতি গড়ে তোলেন। মুল্লুক চাঁদের দুই ছেলে যথাক্রমে জয়েন উদ্দিন ও জয়েদ উদ্দিন। জয়েদ উদ্দিনের দুই ছেলে, মহির উদ্দিন ও জহির উদ্দিন। নজিবর রহমানের পিতার নাম জয়েন উদ্দিন ও মায়ের নাম সোনা বানু। জয়েন উদ্দিনের পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে যথাক্রমে– (১) আয়েন উদ্দিন (গ্রাম্য ডাক্তার), (২) দেলবার রহমান (গ্রাম্য কৃষক), (৩) মোহাম্মদ নজিবর রহমান (ডাক নাম নীলবর,

নজিবর রহমান (স্থানীয়ভাবে 'নীলবর পণ্ডিত' নামেও পরিচিত ছিলেন), (৪) আব্দুর রহীম, (৫) কাবিল উদ্দিন (শেষোক্ত দু'জন তাঁদের যৌবনকালেই মৃত্যুবরণ করেন), (৬) নূরজাহান। নূরজাহানের বিয়ে হয় চর বেলতৈলের সম্ভ্রান্ত মুন্‌শী পরিবার মুন্‌শী জহির উদ্দীনের সঙ্গে। মুন্‌শী জহির উদ্দীন পণ্ডিত নিজ বাড়ীতে ১৮৯২ সনে 'খাস চর বেলতৈল বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন, যেটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৯৪ সন থেকে মুন্‌শী জহির উদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুন্‌শী ওয়াহেদ আলী পণ্ডিত অত্র বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি গুরু ট্রেনিং (জি.টি) পাশ ছিলেন এবং সুদীর্ঘ ষাট বছর পর্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সাথে শিক্ষকতা করে উক্ত বিদ্যালয়ের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেন। তদ্বীয় স্ত্রী রমিছা খাতুনও উক্ত বিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরকাল শিক্ষয়িত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আদর্শ স্ত্রীর মত স্বামীর পাশে ছায়ার মত থেকে অত্র এলাকায় স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০–১৯৩২) সমকালে জন্মগ্রহণ করে ওয়াহেদ আলী দম্পতি অজ পাড়াগাঁয়ে নারী শিক্ষার আলো যেভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন তা সত্যিই অবিস্মরণীয় এবং আমাদের সমাজ-জাগরণের ইতিহাসে ক্ষুদ্র হলেও এক উজ্জ্বল মাইল ফলক হিসাবে বিবেচিত হবার যোগ্য। 'খাস চর বেলতৈল বালিকা বিদ্যালয়' একটি আদর্শ শিক্ষায়তন হিসাবে সমগ্র জেলায় সুপরিচিত ছিল। তৎকালে পাবনা জেলার ভূগোল বইতেও এর বিশেষ উল্লেখ ছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রী শুধু নিজেদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সর্বত্র স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। চর বেলতৈলের এ বিদ্যালয়কে ঘিরে নজিবর রহমানের সুখ-দুঃখের অনেক স্মৃতি আবর্তিত।

শিক্ষা-জীবন

নজিবর রহমানের শিক্ষার হাতে-খড়ি হয় চাচা জয়েদ উদ্দীনের নিকট। জয়েদ উদ্দীন ছোটবেলাতেই ভ্রাতুষ্পুত্রের মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে বাংলা, আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় তা'লিম দেন। একটু বয়স হলে চাচা তাঁকে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করে দেন। অতঃপর তিনি রাজাপুর ছাত্র বৃত্তি স্কুলে ভর্তি হয়ে সেখানে জনৈক মঞ্জুর মোর্শেদের বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করেন। সেখানে দু'বছর অধ্যয়নের পর তিনি শাহজাদপুর মধ্য ইংরেজী স্কুলে (বর্তমান নাম শাহজাদপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়) ভর্তি হন। শাহজাদপুর স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় নজিবর রহমান উক্ত স্কুলের আরবী শিক্ষকের বাড়ীতে জায়গীর ছিলেন। তিনি নজিবর রহমানকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং স্কুলে শিক্ষাদান ছাড়াও নিজগৃহে তাঁকে উত্তমরূপে আরবী-ফার্সী-উর্দু শিক্ষা দেন। শাহজাদপুর স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে ছাত্রবৃত্তি পাশের পর তাঁর পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। এমতাবস্থায় তাঁর বিদ্যাশিক্ষা অব্যাহত রাখা ছিল দুরূহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও চাচা জয়েদ উদ্দীন ও উক্ত আরবী শিক্ষকের উৎসাহে তিনি বিদ্যাশিক্ষা অব্যাহত রাখার প্রয়াস পান। উক্ত শিক্ষক তাঁকে ঢাকায় নিয়ে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। নবাব

সলিমুল্লাহর সুপারিশক্রমেই নজিবর রহমান ঢাকা নর্মাল স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দেবার সুযোগ পান। উক্ত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আশি জন ছাত্রের মধ্যে তিনি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। উল্লেখ্য যে, উত্তীর্ণ আশি জন ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন জন। নজিবর রহমান নর্মাল পড়াকালেই লেখালেখি শুরু করেন। ঐ সময়ই তিনি 'সাহিত্য-রত্ন' উপাধি লাভ করেন বলে ডক্টর সাকলায়েন তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। নজিবর রহমান প্রথম শ্রেণীতে নর্মাল পাশ করেন। নর্মাল পড়াকালে তিনি ঢাকার ডেপুটি জনাব সোলায়মান সাহেবের বাড়ীতে থেকে তাঁর চার কন্যাকে পড়াতেন বলে ডক্টর মযহারুল ইসলাম জানিয়েছেন। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৩)।

ডক্তর গোলাম সাকলায়েন লিখেছেন, "শাহজাদপুর স্কুলে পড়াকালে নিজের একক প্রচেষ্টায় তিনি উত্তমরূপে বাংলা এবং কিছু সংস্কৃতও শিক্ষা করেন। স্থানীয় স্কুলের আলেম ওস্তাদের নিকট তিনি আরবী এবং ফার্সী ভাষায়ও বুৎপত্তি অর্জন করেন।" (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫)।

কথাটি সম্ভবতঃ আংশিক সত্য। স্থানীয় ওস্তাদের নিকট আরবী ও ফার্সী ভাষা শিখেছিলেন, তা বিশ্বাসযোগ্য। ঐ সময় নিজের চেষ্টায় এবং শুধু নিজের চেষ্টায় কেন, স্কুলের মাধ্যমেও বাংলা শেখার ব্যাপারে কোন বাধা ছিল না। তবে নিজের চেষ্টায় ঐ সময় সংস্কৃত শিখেছিলেন কথাটা বিশ্বাস্য মনে হয় না। নর্মাল পড়াকালেই সম্ভবতঃ তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মনসুর উদ্দীনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ

"এ সময় (অর্থাৎ নর্মাল অধ্যয়নকালে তিনি জনৈক ব্রাহ্মণ শিক্ষকের সংস্পর্শে আসিয়া গোমাংস ভক্ষণ হইতে বহুদিন নিবৃত্ত ছিলেন।" (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯)।

সংস্কৃত শেখার উদ্দেশ্যে তিনি গোমাংস ভক্ষণে নিবৃত্ত থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। সংস্কৃত শেখা, তথা জ্ঞানান্বেষণে তাঁর আগ্রহ কত প্রবল ছিল, এ থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নজিবর রহমানের লেখাপড়া শেখার পেছনে চাচা জয়েদ উদ্দীনের অবদান সম্পর্কে আমি আমার পূর্বোক্ত নিবন্ধে লিখেছিলাম ঃ "জয়েদ উদ্দিন মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুর করিয়া পুঁথি পাঠ করিতে অভ্যস্থ ছিলেন।"

ডক্টর গোলাম সাকলায়েন তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "খুল্লতাত মীর মোহাম্মদ জয়েদ উদ্দীন আহমদ ছিলেন তাঁহার বাল্য-জীবনের শিক্ষার পথ-প্রদর্শক। তিনি তৎকালের একজন গুণী ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং ভ্রাতুষ্পুত্রের বাল্য বয়সে প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তিনি তাঁহার শিক্ষালাভের ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন এবং ঐ সময় হইতেই তাঁহার চিন্তাধারা ও বুদ্ধিমত্তা বিকাশের পথ সুপ্রশস্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।" (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬)।

নজিবর রহমান এজন্য চাচা জয়েদ উদ্দীনের প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ ছিলেন। এ কৃতজ্ঞতার পরিচয় স্বরূপ তিনি তাঁর 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসখানি চাচার নামে উৎসর্গ

করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন ঃ

"আলী জনাব,

মৌলভী মোহাম্মদ জয়েদ উদ্দিন আহমদ, চাচাজান সাহেব, আপনি আমার বাল্য-জীবনের শিক্ষার পথ-প্রদর্শক। উপরন্তু চিরদিন বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম ভক্ত। বহুদিন দেখা-সাক্ষাতের অভাবে উভয়ের মধ্যে এই স্মৃতিদ্বয় লইয়া কোন আলোচনা হয় নাই। আজ সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা রোগ-শোকতাপ ভুলিয়া উহার উজ্জ্বলতা চিরস্থায়ী রাখার মানসে এই 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসখানি আপনার কর-কমলে উৎসর্গ করিলাম।"

পারিবারিক জীবন

নজিবর রহমান নর্মাল পাশ করে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং চাকুরী গ্রহণের কিছুদিন পরই বিয়ে করে সংসার-জীবন শুরু করেন। তিনি সর্বমোট কয়টি বিয়ে করেছিলেন, সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে, তিনি মোট চারটি, কারো মতে পাঁচটি বিয়ে করেছিলেন। চর বেলতৈল গ্রাম নিবাসী মোঃ আব্দুল লতিফ মিয়ার মতে ঃ

"ভাঙ্গাবাড়ী স্কুলে প্রধান শিক্ষক থাকাকালে তিনি পিতা-মাতার মতানুযায়ী শাহজাদপুর নিবাসী মমিন উদ্দিন সাহেবের কন্যা মোছাম্মৎ তহুরা খাতুনকে বিয়ে করেন। কিন্তু এক বছর সময়কালের মধ্যেই প্রথমা স্ত্রী তহুরা খাতুন ভবলীলা সাঙ্গ করেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বীয় জন্মস্থান চর বেলতৈল গ্রাম নিবাসী মুন্সী ইসমাইল হোসেনের বিদূষী কন্যা মোছাম্মৎ রোকেয়া খাতুনকে বিয়ে করেন। রোকেয়া খাতুনের ডাক নাম ছিল শাহেরা বানু বা সাবান বিবি।" (চিকাশ, পিটিআই, পাবনা–১৯৯৫, পৃ. ১০)

উক্ত তহুরা খাতুন বিয়ের স্বল্পকাল পরেই মৃত্যুবরণ করেন এজন্য তাঁর অধিকাংশ জীবনী-লেখক প্রথম বিয়ের প্রসঙ্গটি সম্ভবতঃ সম্যক অবহিত নন। যাই হোক, পূর্বে উল্লেখ করেছি, নজিবর রহমানের একমাত্র বোন নূরজাহানের বিয়ে হয়েছিল উক্ত সম্ভ্রান্ত মুন্‌শী পরিবারের মুনশী জহির উদ্দীন পণ্ডিতের সাথে। নজিবর রহমানের এক ভাই আব্দুর রহীমও উক্ত একই পরিবারে বিয়ে করেন। কিন্তু বিয়ের এক বছর পরই আব্দুর রহীম ইন্তেকাল করেন। নজিবর রহমানের দ্বিতীয় স্ত্রী সাবান বিবিও বিয়ের সাত/আট বছর পর নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর নজিবর রহমান সিরাজগঞ্জ শহরের উত্তরে কুড়িপাড়া গ্রামে সম্ভ্রান্ত মীর পরিবারে মওলানা সৈয়দ আহমদ ওরফে মীর আফজাল হোসেনের কন্যা সৈয়দা আলিমুন নেসাকে বিয়ে করেন। এ স্ত্রীর গর্ভে আমিনা খাতুন নামে এক কন্যা ও গোলাম বতু নামে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। গোলাম বতু একজন মেধাবী ছাত্র ছিল। কলকাতা রিপন কলেজ থেকে সে কৃতিত্বের সাথে বি.এ. (অনার্স) পাশ করে স্বর্ণপদক লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার পাশের খবর বের হবার পূর্বেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফলে নজিবর রহমান গভীরভাবে শোকাভিভূত হন। কথিত আছে, গোলাম বতুর মৃত্যুর পর তিনি "দুনিয়া আর চাই না" বইটি রচনা করেন।

তৃতীয় স্ত্রীর বর্তমানেই তিনি নিজ কর্মস্থল ভাঙ্গাবাড়ির নিকটবর্তী তামাই গ্রামে চতুর্থ বিয়ে করেন। তাঁর চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে জাহানারা খাতুন ও শিরতন্নেসা নামে এক কন্যা ও মীর হায়দার আলী নামে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁর তৃতীয় ও চতুর্থ স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি পঞ্চম ও সর্বশেষ বিয়ে করেন নিজ গ্রাম চর বেলতৈলে। এ সময় তিনি একবার ছুটিতে বাড়ী এসে গ্রামের বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনকালে উক্ত স্কুলের ছাত্রী নূরজাহান ওরফে আংরেজের রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুন্‌শী ওয়াহেদ আলী পণ্ডিতের মাধ্যমে তাঁর সাথে নূরজাহানের বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। নূরজাহান মুন্‌শী ওয়াহেদ আলীর চাচাতো বোন, ধনাঢ্য বানু মুন্‌শীর কন্যা (হাজী মাহতাব উদ্দিনের ভগ্নী)। নজিবর রহমান তখন বিপত্নীক ছিলেন, কিন্তু তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশোর্ধ। অন্যদিকে নূরজাহানের বয়স তখন মাত্র ১৪/১৫ বৎসর। বয়সের এত বেশী পার্থক্য উপরন্তু নজিবর রহমান এ পরিবারে একবার বিয়ে করার পর তাঁর পত্নী-বিয়োগ ঘটে এবং নজিবর রহমানের এক ভাই আব্দুর রহীম এ পরিবারে বিয়ে করার কিছুদিন পর আব্দুর রহীমের মৃত্যু ঘটে, এসব বিষয় বিবেচনা করে নূরজাহানের পরিবার সাহিত্য-রত্নের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এতে চরম আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ও আত্মাভিমানী নজিবর রহমানের মনে চরম আঘাত লাগে এবং স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তিনি উক্ত একই গ্রামের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারের মোহাম্মদ বদরুদ্দিনের কন্যা, নূরজাহানের সহপাঠিনী মোসাম্মৎ রহিমা খাতুনকে বিয়ে করেন। পরে নূরজাহানের বিয়ে হয় চর বেলতৈলের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ গ্রাম মহারাজপুরের মৌলবী মোহাম্মদ রহমত উল্লাহর সাথে। তিনি বেড়া থানার অন্তর্গত নাকালিয়া হাইস্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। অবশ্য বিয়ের আট বছর পর নূরজাহান মৃত্যুবরণ করেন।

রহিমা খাতুনকে বিয়ের পর চরম আত্মাভিমানী নজিবর রহমান নিজ গ্রাম পরিত্যাগ করেন এবং তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থল হাটিকুমরুলে বসতি স্থাপন করেন। এরপর নাকি তিনি আর কখনো নিজ গ্রামে পদার্পণ করেননি। রহিমা খাতুনের গর্ভে মীর হাবিবুর রহমান নামে এক পুত্র ও মোসাম্মৎ মমতাজ মহল নামে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তাঁদের দাম্পত্য-জীবন ছিল সুখের এবং রহিমা খাতুন আদর্শ স্ত্রীর ন্যায় পরম পতিভক্তি ও পতির সাহিত্য-সাধনায় আপ্রাণ সহযোগিতা করেন। ১৯১৬ সনে সাহিত্য-রত্ন তাঁর স্ত্রী রহিমা খাতুনকে প্রধান শিক্ষিকা করে হাটিকুমরুলস্থ স্বীয় বসতবাটিতে একটি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। চর বেলতৈলের বালিকা বিদ্যালয়টির অনুকরণে গঠিত উক্ত বিদ্যালয়ও অত্র অঞ্চলে নারী শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়। নজিবর রহমান তাঁর এ শেষোক্ত বিয়ের নাটকীয় প্রেক্ষাপটেই তাঁর বিখ্যাত 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসটি রচনা করেন। এটা তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা। এ উপন্যাসের নায়ক তিনি স্বয়ং, নায়িকা তাঁর স্ত্রী রহিমা খাতুন। অন্যান্য সকল চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ ইত্যাদি সবকিছুই বাস্তব অবস্থার প্রতিবিম্ব। তবে এতে আত্মাভিমানী লেখকের খানিকটা পক্ষপাতিত্ব গ্রন্থের চরিত্র-চিত্রণ ও আখ্যান বর্ণনায় স্বভাবতই প্রতিফলিত হয়েছে।

কর্মজীবন ঃ চাকুরী

নর্মাল পাশের পর নজিবর রহমান স্বল্পকালের জন্য নীলকুঠিতে চাকুরী গ্রহণ করেন বলে ডক্টর মযহারুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন (পূর্বোক্ত, পৃ. ৫)। চাকুরী জীবনের শুরুতে তিনি জলপাইগুড়িতে একটি চাকুরী নিয়েছিলেন, "কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ ছয় মাস পরে উক্ত চাকুরীতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন" বলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আমজাদ হোসেনের নিকট অবগত হয়ে আমি আমার পূর্বোক্ত প্রবন্ধে (দৈনিক আজাদ, ২২শে চৈত্র, ১৩৬৫) উল্লেখ করেছিলাম। কারো কারো মতে, নজিবর রহমান জলপাইগুড়িতে এক বছর ছিলেন কিন্তু সেখানে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না, উপরন্তু কান্ত কবি রজনীকান্ত সেনের একান্ত অনুরোধে তিনি জলপাইগুড়ির চাকুরীতে ইস্তেফা দিয়ে ভাঙ্গাবাড়ী মধ্য ইংরেজী স্কুলে হেড মাস্টার হিসাবে যোগ দেন। মূলতঃ শিক্ষকতাই ছিল তাঁর আজীবনের পেশা এবং এ কাজে তিনি তাঁর সর্বশক্তি, শ্রম ও মেধা নিয়োগ করেন। শিক্ষক হিসাবেও তিনি ছিলেন সুযোগ্য ও আদর্শ। তবে তিনি নির্দিষ্ট কোন এক স্থানে শিক্ষকতা করেননি। যেখানেই তিনি শিক্ষকতা করেছেন সেখানেই পেশাগত দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে স্থানীয় জনসাধারণকে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝাতেন এবং তাদের ছেলেমেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তিনি যখন ভাঙ্গাবাড়ী স্কুলে হেড মাস্টার হিসাবে যোগদান করেন তখন সেখানে দু'জন মুসলিম ছাত্রসহ মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৫ জন। তার নিরলস চেষ্টায় মাত্র ছয় মাসের মধ্যে উক্ত স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৩৬৩ জনে উন্নীত হয়, তন্মধ্যে মুসলিম ছাত্র ছিল ১৩৫ জন। তিনি যেসব স্থানে শিক্ষকতা করেন তার একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে তাঁর জামাতা খোন্দকার বশির উদ্দিন (জাহানারা খাতুনের স্বামী) লিখেছেন ঃ

"প্রায় ৭/৮ বছর ভাঙাবাড়ি (কান্ত কবি রজনীকান্ত সেনের বাড়ি) অবস্থান করার পর তিনি সেখান থেকে বদলি হয়ে রংপুর নর্মাল স্কুলের সহকারী বাঙলা শিক্ষকের পদে যোগদান করেন।... কিছুদিন রংপুরে শিক্ষকতা করার পরে তিনি রাজশাহী... মাদ্রাসায় বাঙলা শিক্ষকের (হেডপণ্ডিতের) পদে যোগদান করেন। তিনি কতদিন রংপুরে ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না এবং কোন্ সনে রাজশাহী মাদ্রাসায় যোগদান করেন, তাও সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি ১৯০৯ অথবা ১৯১০ খৃস্টাব্দে রাজশাহীতে যান এবং তিন কি চার বছর তিনি রাজশাহীতে ছিলেন। রাজশাহীতে চাকুরী করাকালে তাঁর পরিবার দেশের বাড়ী চর বেলতৈলে ছিল। মাদ্রাসা ছুটি হলেই তিনি বাড়ি চলে যেতেন।" (দ্র. মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন/খন্দকার মোহাম্মদ বশির উদ্দীন, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৯৪ পৃ. ১৪–১৫)।

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সাংবাদিক রফিকুল আলম খান সাহিত্য-রত্নের পারিবারিক সূত্রে তথ্য সংগ্রহ করে লিখেছেন ঃ

"নর্মাল পাশের পরই তিনি জলপাইগুড়ির মধ্য ইংরেজী স্কুলের বাংলা শিক্ষক মনোনীত হন। পরবর্তীতে তিনি বেলকুচি থানার ভাঙ্গা বাড়িতে ছাত্র বৃত্তি স্কুলের প্রধান

শিক্ষক মনোনীত হন। কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন ছিলেন এ স্কুলের সেক্রেটারী। নজিবর রহমান প্রায় আট বছর কবির বাড়ীতেই সপরিবারে বসবাস করেন। রজনী কান্তের উৎসাহেই তিনি পুরাপুরি সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। এরপর তিনি রংপুর নর্মাল স্কুলের বাংলা শিক্ষক মনোনীত হন। এরপর রাজশাহীর নিউ স্কীম মাদ্রাসায় বাংলা শিক্ষক পদে যোগ দেন। পরে নজিবর রহমান রাজশাহী মাদ্রাসার চাকুরী ছেড়ে বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার সলঙ্গা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। নানা কারণে সলঙ্গা স্কুলেও বেশি দিন থাকতে পারেননি। ১৯১৭ সনে তিনি হাটিকুমরুলে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই শিক্ষকতা করেন। নজিবর রহমান হাটিকুমরুলে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন এবং স্ত্রী রহিমা খাতুনকে শিক্ষকতার দায়িত্ব দেন। নজিবর রহমান একজন ভাল হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি কারো চিকিৎসা করে কিছু চাইতেন না। দিলে নিতেন। তাছাড়া, নিজ পয়সায় কুইনাইন টেবলেট কিনে গরীব রোগাক্রান্তদের মধ্যে বিতরণ করতেন।" (দৈনিক বাংলা, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৯২)।

ভাঙ্গাবাড়ী স্কুলে শিক্ষকতাকালে তিনি প্রথম কয়েক বছর স্থানীয় মৌলবী পবন উদ্দিনের বাড়ীতে লজিং ছিলেন। পরে তিনি কবি রজনীকান্ত সেনের অনুরোধে তাঁর বিশাল জমিদার বাড়ীতে সস্ত্রীক বসবাস করেন। ভাঙ্গাবাড়ী স্কুলে তিনি মাসিক পঁচিশ টাকা বেতন পেতেন। উপরন্তু স্থানীয় পোস্ট অফিসে পোস্ট মাস্টার হিসাবে সাত টাকা বেতন পেতেন। ভাঙ্গাবাড়ী থেকে তিনি রংপুর নর্মাল স্কুলের বাংলার শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। সেখান থেকে রাজশাহী মাদ্রাসায় বাংলার শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। রাজশাহী থাকাকালে তিনি বহু শিক্ষিত বিদ্বজ্জন ব্যক্তির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পান। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আনোয়ারা'র মুদ্রণ বিষয়ে এখানকার ছাত্ররা যথেষ্ট সাহায্য করে, এটা সবিশেষ কৃতজ্ঞতার সাথে তিনি তাঁর আনোয়ারা'র ভূমিকাংশে এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

"রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী জুনিয়র মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্রবৃন্দ আনোয়ারার মুদ্রণ বিষয়ে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন...।" ('আনোয়ারা', ভূমিকাংশ (কৃতজ্ঞতা), ১৯১৪/১৮ই মে)।

রাজশাহী জুনিয়র মাদ্রাসা থেকে তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানাধীন নবপ্রতিষ্ঠিত সলঙ্গা মধ্য বাংলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এ সময় তিনি কিছুকাল সলঙ্গার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মৌলবী কামাল উদ্দিনের বাড়ীতে সপরিবারে বসবাস করেন। অতঃপর সলঙ্গার নিকটবর্তী চড়িয়া উজির গ্রামে আলহাজ্জ পরশ উল্লাহ তালুকদারের বাড়ীতে বসবাস করেন। তালুকদার বাড়ীর আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার ছিলেন তাঁর এক প্রিয় ছাত্র। পরবর্তীকালে নজিবর রহমান সলঙ্গা জুনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে (বর্তমানে সলঙ্গা ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়) আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদারকে তার প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করেন। তাড়াশের অত্যাচারী জমিদার বনমালী

রায়ের সাথে মতদ্বৈধতা হবার ফলে সাহিত্য-রত্ন সলঙ্গা স্কুল এবং চড়িয়া উজিরপুর গ্রামের বসতি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। সলঙ্গা বনমালী রায়ের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সলঙ্গা ছেড়ে তিনি প্রাণভয়ে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। এ সম্পর্কে তাঁর জামাতা খোন্দকার বশীর উদ্দীন বলেন ঃ

"সলঙ্গা ছিল পাবনা জেলার অন্তর্গত তাড়াশের দুর্দান্ত জমিদারদের অধীন। তাঁহারা তাঁহাদের জমিদারীতে মুসলমানগণের গো-কোরবানী বা গোমাংশ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। একবার একজন মুসলমান প্রজা অন্যত্র হইতে কোরবানীর গোস্ত আনিয়া আহার করেন। জমিদারের খয়ের খাঁ একজন মুসলমান মাতবর প্রজা জমিদারের নায়েবের কানে এই গোপন সংবাদ দেয়। ইহাতে নায়েব মহাশয় পাইক পেয়াদা দিয়া সেই গোমাংশ ভক্ষণকারী মুসলমান প্রজাকে কাছারীতে ধরিয়া আনিয়া গুরুতর মারধর করে। ইহাতে পণ্ডিত নজিবর রহমানের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগে। তিনি তখন গ্রামে গ্রামে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সলঙ্গাতে এক বিরাট ইসলামী জলসার ব্যবস্থা করেন। নানা অঞ্চল হইতে অনেক বিখ্যাত মৌলবী মওলানা ও ওয়ায়েজ সমবেত হন। এই সভায় পণ্ডিত নজিবর রহমানও বক্তৃতা করেন। ইতোমধ্যে গুজব রটিয়া যায় যে, পণ্ডিত নজিবর রহমানের প্ররোচনায় জমিদার কাচারী সংলগ্ন কালী বাড়ীতে গো-জবেহ হইতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া তাড়াশের জমিদারের নায়েব লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সভায় আক্রমণ করে। উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায়। সভা লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। সকলে পণ্ডিত নজিবর রহমান ও অন্যান্য ওয়ায়েজগণকে পাহারা দিয়া সরাইয়া লইয়া যায়। কিছুকালের মধ্যে পুলিশ বাহিনী শান্তি ভঙ্গের জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পণ্ডিত নজিবর রহমান এই জন্য বহুদিন আত্মগোপন করিয়াছিলেন।" (মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮০-১৮১)।

এ ঘটনার পর সলঙ্গাতে বসবাস করা নজিবর রহমানের জন্য নিরাপদ ছিল না। ফলে তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের ইন্সপেক্টর পি. চ্যাটার্জির অনুমোদনক্রমে রায়গঞ্জ থানার হাটিকুমরুল গ্রামে স্কুলটি স্থানান্তরিত করা হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করেছিলেন ধুবিলের দানশীল জমিদার মুনশী এলাহী বকশ। নজিবর রহমান তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ স্কুলেই শিক্ষকতা করেন। এখানে তিনি তাঁর স্থায়ী বসতবাড়ীও গড়ে তোলেন। এখানে তাঁর সর্বশেষ স্ত্রী রহিমা খাতুনকে প্রধান শিক্ষয়িত্রী করে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও গড়ে তোলেন। তাঁর প্রখ্যাত 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসসহ 'পরিণাম', 'মেহের-উন্নিসা', 'নামাজের ফল', 'দুনিয়া আর চাই না', 'বেহেস্তের ফুল', 'দুনিয়া কেন চাই না' ইত্যাদি গ্রন্থ এ হাটিকুমরুলেই রচিত হয়েছিল।

সমাজসেবা

১৭৫৭ সালে পলাশী প্রান্তরে ষড়যন্ত্রমূলক পাতানো যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা বিপন্ন হবার পর রাজ্য-হারা মুসলমানগণ এ পরাজয় সহজে মেনে নিতে পারেনি। ফলে পলাশীর পর থেকেই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় তারা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম

পরিচালনা করে। মুসলমানগণ ইংরেজদের সাথে অসহযোগিতা করেছে, ইংরেজদের ভাষা-শিক্ষা-সভ্যতা ইত্যাদিকে তারা ঘৃণা ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখে তা সযত্নে এড়িয়ে চলেছে। ফলে মুসলমানদের দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষমতাহারা মুসলমানগণ ধীরে ধীরে জমিদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক অধিকার, সামাজিক মর্যাদা, সরকারী চাকুরী, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি সব দিক থেকেই চরমভাবে বঞ্চিত হয়েছে। ইংরেজরা তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করে। এ সুযোগে পলাশী যুদ্ধে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী, বেনিয়া ইংরেজদের মদদদানকারী হিন্দুরা ইংরেজদের কৃপাদৃষ্টি পেয়ে মুসলমানদের জমিদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক মর্যাদা, সরকারী চাকুরী-বাকুরী, সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি দ্রুত হাতিয়ে নেয়ার ফলে মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা আরো শত গুণে বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৭ সনে ইংরেজদের কথিত 'সিপাহী বিদ্রোহ' ছিল মূলতঃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ভারতব্যাপী ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান যা এক শ্রেণীর হিন্দুদের বিশ্বাসঘাতকতা ও হিন্দু জমিদার, সামন্ত-প্রভু ও বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় ইংরেজগণ দমন করতে সমর্থ হয়। এ ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান চরমভাবে ব্যর্থতা বরণের ফলে নতুনভাবে মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ বিপর্যস্ত হবার পর ইংরেজগণ মুসলমানদেরকে আরো বেশী অবিশ্বাস করতে থাকে। অন্যদিকে, হিন্দুরা ইংরেজদের আরো অধিক বিশ্বস্ততা অর্জন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এদিকে মুসলমানদের অবস্থা খারাপ থেকে অধিকতর খারাপ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় শিক্ষিত নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এ সার্বিক অবনতি ও চরম দুর্গতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে তারা শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিরেচনা করেন।

এ উপলব্ধির ফলেই নওয়াব আব্দুল লতীফের নেতৃত্ব ১৮৬৩ ইসায়ীর ২রা এপ্রিল কলকাতায় মহামেডান লিটারারি সোসাইটি' গঠিত হয়। এরপর ১৮৭৭ সনে কলকাতায় মহামেডান এসোসিয়েশন, ১৮৭৯ সনের ১৩ই ডিসেম্বর ঢাকায় 'সমাজ সম্মিলনী' এবং ১৮৮৩ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (Dacca Mohamedan Friends' Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা, বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষা এবং সেই সাথে স্ত্রী শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে অগ্রসর করে নেয়া এবং সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি বিধানই উপরোক্ত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল লক্ষ্য ছিল। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদেরকে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ জন্য তিনি ঐতিহাসিক আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এদিকে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনও (১৮৮০–১৮৯২) নারী শিক্ষা প্রসারে ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলেন। শিক্ষার প্রসার ও মুসলিম নবজাগরণে এ সময় সংবাদপত্রের ভূমিকাও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় মুসলমানদের দ্বারা সম্পাদিত

যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ

'জগদুদ্দীপক ভাস্কর'–মৌলবী রজব আলী সম্পাদিত, প্রকাশ ঃ ১৮৪৩ ইসায়ী

'জ্ঞানদীপক'– মোহাম্মদ আলী সম্পাদিত, প্রকাশ ঃ ১৮৪৫ ইসায়ী

'সুধাকর'– মুনশী আব্দুর রহিম সম্পাদিত, প্রকাশ ঃ ১৮৮৯ ইসায়ী

'মিহির'– ঐ , প্রকাশ ঃ ১৯৮১ ইসায়ী

'মিহির ও সুধাকর'– ঐ

'ইসলাম প্রচারক'– মুনশী রিয়াজ উদ্দিন সম্পাদিত, প্রকাশ ঃ ১৮৯১ ইসায়ী

'মোসলেম হিতৈষী'– মুনশী আব্দুর রহিম সম্পাদিত,

'সোলতান'–মুনশী রেয়াজ উদ্দিন সম্পাদিত, প্রকাশ ঃ ১৯০৫ ইসায়ী

'মোসলেম সুহৃদ', প্রকাশ ঃ ১৯০৭ ইসায়ী

'মোহাম্মদী'–মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত, প্রকাশ ঃ ১৯১১ ইসায়ী

কবি মোজাম্মেল হক ও আব্দুর হাকিমের যৌথ সম্পাদনায় 'মোসলেম হিতৈষীর পুনঃপ্রকাশ ঃ ১৯১২ ইসায়ী

'হানাফী'– আব্দুল হাকিম সম্পাদিত

মুসলিম নবজাগরণের এ প্রদোষকালে নজিবর রহমানের আবির্ভাব। তিনি নবজাগ্রত মুসলিম মানসিকতার সার্থক প্রতিনিধিত্বকারী। তাঁর জীবনের বিভিন্ন কর্মায়োজন ও লেখার মধ্যে এ মানসিকতার স্পষ্ট স্ফুরণ লক্ষণীয়। তাঁর পেশা ও সাহিত্য-চর্চার মধ্যে সমাজসেবা ও মুসলিম নবজাগরণের উদ্দীপনা দু'টি বিশেষ ধারায় প্রবাহিত ঃ

এক– শিক্ষাদান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো।

দুই–সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে গণ-সচেতনতা ও জাগরণের উদ্দীপনা সৃষ্টি। 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ, অত্যাচারী হিন্দু জমিদার কর্তৃক দরিদ্র মুসলিম প্রজাপীড়ন প্রতিরোধ আন্দোলন, হিন্দু সমাজপতিদের রক্তচক্ষুর সামনে মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং মুসলিম সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কার দূরীকরণের চেষ্টা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ব্যক্তিগতভাবে নজিবর রহমান মোটেই হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না; বরং সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে তাঁর গভীর সদ্ভাব ছিল। তাঁর অমায়িক মধুর ব্যবহার ও উদার মনোভাবের জন্য মুসলমান তো বটেই, হিন্দুরাও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতো। তাঁর আক্রোশ ছিল এক শ্রেণীর অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও সমাজপতিদের বিরুদ্ধে।

এক– শিক্ষক হিসাবে নজিবর রহমান ছিলেন একজন আদর্শ ও সুযোগ্য শিক্ষক। নিপুণভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি বাড়ী বাড়ী ঘুরে ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহ, বিভিন্ন সভা-সমিতি করে অজ্ঞ জনসাধারণকে শিক্ষার গুরুত্ব-তাৎপর্য বুঝানো, লেখনীর

মাধ্যমে এ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা পেশ ও বিভিন্ন স্থানে দিবা ও নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে সমাজসেবার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেসব স্কুলে তিনি চাকুরী করেছেন তার একটি বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে, তিনি যেসব স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন বা প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সহযোগিতা করেন তার একটি বিবরণ নিচে প্রদত্ত হলো ঃ

ক) তদ্বীয় ভগ্নিপতি মুনশী জহির উদ্দীন (ডক্টর মযহারুল ইসলাম ও ডক্টর সাকলায়েন কর্তৃক উল্লিখিত মহিউদ্দিন নয়) কর্তৃক 'খাস চর বেলতৈল বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠায় (প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ১৮৯২) তিনি সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেন।

খ) সলঙ্গা মধ্য-ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকতাকালে তিনি সলঙ্গার নিকটবর্তী সাতটি গ্রামে মাস্টার খবির উদ্দীনের বাড়ীতে তিন/চার মাস জায়গীর ছিলেন। ঐ সময় তিনি সেখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

গ) ১৯১৬ ইসায়ীতে তিনি 'সলঙ্গা জুনিয়র মাদ্রাসা' (বর্তমানে ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ) ১৯১৬ ইসায়ীতে তিনি হাটিকুমরুল নিজ বসতবাটিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে স্ত্রী রহিমা খাতুনকে সেখানে প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন।

শিক্ষার প্রসারে নজিবর রহমানের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টা সম্পর্কে অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন বলেন ঃ

"শিক্ষা প্রসারে তিনি অব্যর্থ ও অক্লান্ত সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন য়ে, শিক্ষার প্রসার ব্যতিরেকে মুসলমান সমাজের কল্যাণ সম্ভব নহে। তিনি চর বেলতৈল, সলঙ্গা, হাটিকুমরুল প্রভৃতি অঞ্চলে নৈশ ও দিবা বিদ্যালয় স্থাপনে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।" (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪)।

দুই) নজিবর রহমান ছিলেন প্রকৃত সমাজ ও রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তি। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জবিনী আমাদের সামনে না থাকায় এ সম্পর্কে অনেকের ধারণাই বিভ্রান্তমূলক। প্রসঙ্গত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক নজিবর রহমান সম্পর্কে যা লিখেছেন তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেন ঃ

"তখনকার দিনের কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনের সহিত আদৌ কোন যোগ রক্ষা না করিয়া, কেবল সাহিত্যিক হিসাবেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯)।

উপরোক্ত মন্তব্য সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একথা সত্য যে, তাঁর উপন্যাস ও গল্পে রাজনীতির গন্ধ নেই। এ জন্যই তাঁর কথা-সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য হতে পেরেছে, রাজনীতির উগ্র প্রকাশ থাকলে নিঃসন্দেহে তা খানিকটা শিল্পগুণ বর্জিত হতো। এটা নজিবর রহমানের যথার্থ শিল্পজ্ঞানের পরিচয়ই বহন করে। কিন্তু তাই বলে এ কথা

সত্য নয় যে, তখনকার রাজনীতি ও সামাজিক আন্দোলনের সাথে আদৌ কোন যোগ রক্ষা না করে তিনি সাহিত্য-চর্চা করেছেন। তিনি অত্যন্ত সমাজ ও রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। এ সম্পর্কে ডক্টর গোলাম সাকলায়েন লিখেছেন ঃ

"১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার মহামান্য নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুরের নেতৃত্বে পূর্ব-বাংলার মুসলমানদিগের জাতীয় আদর্শ, তাহজীব, তমদ্দুন অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত ঢাকায় মুসলিম লীগের গোড়াপত্তনের জন্য যে বিরাট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তাহাতে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন এবং সেই সময় তদানীন্তন হিন্দু জমিদারদের অকথ্য নির্যাতন ও মুসলমানদের কোরবানী প্রথা বন্ধের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিত একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। এই সুযোগে তিনি ঢাকার ও দেশের অন্যান্য স্থান হইতে আগত নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তির সঙ্গে সুপরিচিত হন এবং পরে হাটিকুমরুলে ফিরিয়া আসিয়া নবীন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে কর্ম করিতে থাকেন। তাঁহার উৎসাহ উদ্দীপনার জন্যই স্থানীয় মুসলমান জনসাধারণের প্রাণে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।" (পূর্বোক্ত, পৃ. ২০-২১)।

নজিবর রহমানের বিভিন্ন প্রবন্ধে রাজনৈতিক সচেতনতার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে। প্রবন্ধে লেখকের চিন্তা-চেতনা ও মননশীলতার প্রকাশ ঘটে থাকে। নজিবর রহমানের বিভিন্ন প্রবন্ধে বিশেষতঃ 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' ও 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' পুস্তিকা দুটিতে রাজনীতিক ও সমাজ সচেতনতার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' পুস্তিকায় লেখক স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন। এটা ছিল বৃটিশ ভারতে হিন্দু প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারের একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র, এতে মুসলমানদের কোনই স্বার্থ জড়িত ছিল না। নজিবর রহমানের ভাষাতেই বলিঃ

"তুমি বলিতেছ-বিলাতী বর্জ্জনে দেশের মূলধন বাড়িবে, নতুন নতুন কলকারখানার সৃষ্টি হইবে। তা ঠিক। আবার ইহাও ঠিক যে, দেশের জমিদার তোমরা (হিন্দুরা) শিল্প বাণিজ্য ফারেমী বাউরেমী সবই তোমাদের আয়ত্তাধীন। সুতরাং বিলাতী বর্জ্জনের ফলে যে উন্নতি হইবে তাহা তোমাদেরই হইবে-মুসলমানদের নহে।" (ডক্টর গোলাম সাকলায়েন ঃ "মোহাম্মদ নজবির রহমান সাহিত্য-রত্নের 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য", সাহিত্যিকা, ১২ম বর্ষ, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃ. ১৬৬-৬৭)।

বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় মুসলমানদের দাবীর প্রেক্ষিতে পূর্বাঞ্চলীয় অনগ্রসর জনমন্ডলীর সার্বিক উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য বঙ্গভঙ্গ করে ১৯০৫ সনে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। এ প্রদেশ গঠনের আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী প্রমুখ। হিন্দুরা প্রথম থেকেই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে আসছিলো। নজিবর রহমান স্বদেশী

আন্দোলনের মাধ্যমে বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ ঐক্যসূত্র লক্ষ্য করেছিলেন। বিলাতী পণ্য বর্জনের মাধ্যমে দেশীয় হিন্দু শিল্পপতি, পুঁজিপতি, ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বঙ্গভঙ্গ রদের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গীয় দরিদ্র কৃষক প্রজাসাধারণ তথা এতদঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণকে শোষণ-শাসনের মাধ্যমে কলকাতার হিন্দু বাবু শ্রেণীর লোকদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে নজিবর রহমান সমর্থন করতে পারেননি। তাই 'বিলাতী বৰ্জ্জন' গ্রন্থে মুসলিম চরিত্রের মুখ দিয়ে হিন্দু চরিত্রের উদ্দেশ্যে বলিয়েছেন ঃ

"ইংরেজ গভর্নমেন্ট তাহাদের শাসন সংরক্ষণের সুবিধার জন্য বাঙ্গালা দেশটাকে দুই ভাগ করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে তোমাদের মনে আঘাত লাগে কেন?" (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩)।

এর দ্বারা নজিবর রহমানের রাজনৈতিক সচেতনতা ও দূরদৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় জাগরণ ও উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যেই তিনি তাঁর 'বিলাতী বৰ্জ্জন', 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' প্রভৃতি পুস্তিকা ও প্রবন্ধাদি রচনা করেছিলেন। তবে তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যে রাজনৈতিক প্রসঙ্গটি যেভাবে সরাসরি এসেছে, তাঁর গল্প-উপন্যাসে সেভাবে আসেনি। এতে তাঁর শিল্প-সচেতনতা সুস্পষ্ট হয়েছে। অবশ্য শেষোক্ত রচনায় শিক্ষা, নৈতিকতা ও মানবিক উচ্চাদর্শের দ্বারা সমাজ বিশেষতঃ অধঃপতিত মুসলিম সমাজের উন্নতির প্রয়াস তাঁর মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা গেছে।

নজিবর রহমানের সমাজ-সচেতনা, দেশপ্রেম ও স্বাজাত্য-প্রীতি তৎকালীন আরো কিছু ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮৮৫ সনে হিন্দু-কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে উপমহাদেশের সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণ হিন্দু পুনর্জাগরণ ও গোটা ভারতবর্ষে রামরাজত্ব কায়েমের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তারা সর্বত্র মুসলমান সমাজ, তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি এমনকি, তাদের জাতিগত অস্তিত্বের প্রতি চরম হুমকি সৃষ্টি করে। বিভিন্ন স্থানে তারা মুসলমানদের ধর্মকর্ম, ঈদ উৎসব, কুরবানী ইত্যাদিতে বাধা দিতে থাকে। হিন্দুদের নিকট 'ঋষি' নামে খ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন লেখায় চরম মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচার করেন, মুসলিম ধর্ম-সংস্কৃতির বিরোধিতায় তা ইন্ধন যোগায়। এ সময় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীন চন্দ্র সেন প্রত্যেকেই কম-বেশী হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও পুনরুত্থান প্রয়াসে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রচার করেছেন। এমনকি, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত তাঁর কবিতায় 'মহাভারতের সাগর-তীরে' 'এক দেহে লীন' হয়ে যাওয়ার জন্য সকল অহিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। এসব কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে নানা চরমপন্থী দল, গ্রুপ ও সন্ত্রাসী চক্রের সৃষ্টি হয়। এ সময় ভারতীয় হিন্দু কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫ ইসায়ী) ফলে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও পুনরুত্থান প্রবণতা আরো সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে মুসলিম-বিদ্বেষ ও মুসলিম-নির্যাতন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত পটভূমিতে হিন্দু জমিদার, জোতদার, মহাজন অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী নানাভাবে দরিদ্র, অনুন্নত, মুসলিম প্রজা ও কৃষকদের উপর নানারূপ অত্যাচার চালাতে থাকে। এরূপ অত্যাচারের একটি মর্মন্তুদ কাহিনী সৃষ্টি হয় পাবনা (বর্তমানে সিরাজগঞ্জ) জেলার তাড়াশ থানায়। অত্র এলাকার অত্যাচারী হিন্দু জমিদার নিরীহ মুসলমান প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। জমিদার রায় বাহাদুর বনমালী তার এলাকায় মুসলমানদের ধর্ম-কর্ম, ঈদ-উৎসব কুরবানী ইত্যাদির উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। কেউ তার আদেশ অমান্য করলে পাইক-বরকন্দাজদের দ্বারা তাদেরকে বেঁধে এনে শারীরিক নির্যাতন চালাতো। জমিদারের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য স্থানীয় নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ 'আঞ্জুমান-ই-ইসলাম' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। নজিবর রহমান এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এ সমিতির পক্ষ থেকে সলঙ্গায় এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। জনসভায় হিন্দু জমিদারদের প্রজা-পীড়ন ও মুসলমানদের ধর্ম-কর্মে বাধা দানসহ স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনা দিয়ে তা লাঘবের উদ্দেশ্যে সরকারের প্রতি জোর আবেদন জানানো হয়। জমিদারের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের আক্রমণে সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সমবেত হাজার হাজার কৃষক-জনতা সে আক্রমণ প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। ফলে বহু লোক হতাহত হয়। সরকারের পুলিশ বাহিনী বহু কষ্টে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সরকারের হস্তক্ষেপে মুসলমানগণ সেখানে ধর্ম-কর্ম করার সুযোগ পায়। মুসলমানরা পুনরায় কুরবানী করার অধিকারও ফিরে পায়। ইতিহাসে এটাই 'সলঙ্গা বিদ্রোহ' নামে খ্যাত।

সরকারের হস্তক্ষেপে জমিদারের অত্যাচার কিছুটা প্রশমিত হলেও আঞ্জুমান-ই-ইসলামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের শায়েস্তা করার জন্য উক্ত জমিদার একদল সন্ত্রাসী নিয়োগ করে। এদের মধ্যে স্থানীয় ডাকাত জালিম উদ্দীনও ছিল। এদের ভয়ে আঞ্জুমানের নেতাগণ কিছুকাল আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হন। নজিবর রহমান নিজেও কিছুকাল আত্মগোপন করেছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এর দ্বারা নজিবর রহমানের সমাজ-সচেতনতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

এছাড়াও তাঁর সমাজ ও রাজনীতি-সচেতনতার আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে 'বঙ্গাসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। তার রাজধানী স্থাপিত হয় ঢাকায়। এ নতুন প্রদেশ ছিল বিপুল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। এতদিন পর্যন্ত কলকাতার হিন্দু জমিদার, ভূস্বামী, মহাজন, ব্যবসায়ী, আমলা ইত্যাদি বাবু সম্প্রদায় এ বিস্তৃত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা শোষণ-শাসন-নিপীড়ন করে কলকাতায় ইংরেজ প্রভুদের অনুগত থেকে আরাম-আয়েশপূর্ণ জীবন যাপন করতো। বঙ্গভঙ্গের ফলে এ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকায় সার্বিক উন্নতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেয়ায়, ঢাকাকে কেন্দ্র করে নতুন প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় মুসলমানদের শাসন ও আধিপত্য কায়েম হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়ায় উভয় বঙ্গের হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে। নজিবর রহমান এ সময় বঙ্গভঙ্গের জোরালো সমর্থক ছিলেন। হিন্দুদের চরম

বিরোধিতার মুকাবিলায় ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গভঙ্গের ঐতিহাসিক দিনে ঢাকা নর্থব্রুক হলে প্রভিন্সিয়াল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। অতঃপর নবাব সলিমুল্লাহর আহ্বানে সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সম্মেলনে ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর 'মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে নজিবর রহমান একজন আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন এবং হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার, মুসলমানদের ধর্মীয় বিধান পালনে বাধা প্রদান, হিন্দু মহাজন ও বাবু সম্প্রদায় কর্তৃক শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং সর্বোপরি মুসলমানদের অনগ্রসরতা ও দুর্দশা লাঘবের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া, শিক্ষা-দীক্ষায় দ্রুত এগিয়ে আসার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আবেগময় ভাষায় বক্তৃতা করেন। এ সম্পর্কে জনাব মোহাম্মদ আলী চৌধুরী লিখেছেন ঃ

"নজিবর রহমান শুধু শিক্ষকতা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। সমাজের প্রতি তাঁর সেবাদৃষ্টি সর্বদা নিয়োজিত থাকত। মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের অহেতুক শত্রুতা তিনি তীক্ষ্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর অকথ্য অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে এক তেজস্বী বক্তৃতা করেন।" (বুলবুল ইসলাম/মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন ঃ সমাজ সংস্কারক)।

সলঙ্গাতে গো-কুরবানী নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত ঘটনাবলী মুসলিম লীগ সম্মেলন উপলক্ষে আগত মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নজিবর রহমান অবহিত করেন এবং তাঁদের অনুমতি ও উৎসাহক্রমেই তিনি সম্মেলনে তাঁর লিখিত ভাষণে বিষয়টি উল্লেখ করেন। ফলে বিষয়টি মুসলমানদের জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়। এতে মুসলমানদের আন্দোলন, স্বাজাত্যবোধ দানা বেঁধে ওঠে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন বলেন ঃ

"সলঙ্গার বিপদের কথা তিনি নওয়াব আহসানউল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, নবাব শামসুল হুদা প্রমুখ মুসলমান জননেতাদের গোচরীভূত করেন এবং তাঁহাদের সুপারিশ ও মন্ত্রণাক্রমে একটি দরখাস্ত লাট বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হয় এবং ফলে সলঙ্গাতে গো-কোরবানীর হুকুম চালু হয়।" (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১)।

তাঁর সমাজ-সচেতনতা সম্পর্কে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন বলেন ঃ

"১৯১৭ সালে এক বন্ধুর বাড়ীতে 'আনোয়ারা'-লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আমার বন্ধুটি ছিলেন তাঁরই প্রতিবেশী। মৌলবী নজিবর রহমান সাহেব অত্যন্ত সমাজ-দরদী ব্যক্তি ছিলেন–মুসলমান সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ সমন্বিত পুস্তকাদি লিখবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন।" (বাংলা সাহিত্য সম্পদ, পৃ. ৩৩)।

এভাবে দেখা যায়, সমাজ-সেবা ও জাতীয় উন্নয়ন নজিবর রহমানের জীবনের মূল লক্ষ্য ও অন্যতম প্রধান ব্রত ছিল। শিক্ষার প্রসারে, রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডে, মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণে তিনি ছিলেন নিরাপোষ ও আন্তরিকভাবে সদা সচেষ্ট। এমনকি, তাঁর সাহিত্য-কর্মের মূল লক্ষ্যও ছিল সমাজসেবা।

এ জন্য তাঁর সাহিত্যে অনেকে উদ্দেশ্যমূলকতার সন্ধান পেয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। মূলতঃ উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার আলোকে নবজাগ্রত হিন্দু সমাজে সাহিত্য-সাংবাদিকতাসহ সকল কর্মকাণ্ডে সমাজ সেবার মনোভাব প্রধান অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করতো। পরবর্তীতে মুসলমানদের মধ্যেও এ মনোভাব বিস্তার লাভ করে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানগণ যখন সাহিত্য-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে অগ্রসর হতে শুরু করে তখন তাদেরও মূল লক্ষ্য ছিল সাহিত্য-সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজসেবা করে মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধন। এ সমাজসেবা বা সমাজ উন্নয়নের প্রচেষ্টা ছিল বিভিন্নমুখী। তার মধ্যে অজ্ঞ-অধঃপতিত মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটানো ছিল প্রধানতম। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং তৃতীয়তঃ হিন্দু জমিদার-মহাজন-সমাজপতিদের অত্যাচারে নিগৃহীত দরিদ্র, অশিক্ষিত মুসলমানদের রক্ষা করার প্রয়াস ছিল প্রবলতর। নজিবর রহমানের মধ্যে এ তিন ধরনের মনোভাব ও উদ্দেশ্যই কাজ করেছে। তাই তাঁকে নিঃসন্দেহে সমাজ-সচেতন ও মুসলিম সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণকামী সাহিত্যিক বলা যায়।

ব্যক্তিজীবন

ঔপন্যাসিক হিসাবে নজিবর রহমান যেমন অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, শিক্ষক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। শিক্ষার প্রসার তাঁর ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা ও সমাজসেবার প্রয়াস ছিল দৃষ্টান্তমূলক। এছাড়া, তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। একজন নিষ্ঠাবান আদর্শ মুসলিম হিসাবে সামাজিক ও পারিবারিক পরিমন্ডলে তিনি একজন আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে সর্বদা স্বীয় মর্যাদা বজায় রেখে চলতেন। তাঁর অধিক বিবাহ করার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে। যেমন 'অধিক বিবাহ করবার কারণে মোহাম্মদ নজিবর রহমানের সংসার জীবনে সচ্ছলতা ছিল না' বলে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন যে মন্তব্য করেছেন, তা সম্ভবতঃ খুব একটা সঠিক নয়। কারণ মাত্র একবারই তিনি একজন স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া, প্রথম বিবাহ ব্যতীত অন্য সকল বিবাহকালে তিনি বিপত্নীক ছিলেন। উপরন্তু, চারটি বা মতান্তরে পাঁচটি বিয়ে করা সত্ত্বেও তিনি মাত্র তিন পুত্র ও চার কন্যার জনক ছিলেন। এটাকে খুব বড় পরিবার বলা যায় না। অতএব, অধিক বিবাহের ফলে তাঁর 'সংসার জীবনে সচ্ছলতা ছিল না' এ কথাটি সম্ভবতঃ যথার্থ নয়। তাড়াশের অত্যাচারী জমিদার বনমালী রায়ের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে তিনি যখন তাঁর স্কুল ধুবিলের জমিদার মুনশী এলাহী বক্সের অর্থ সাহায্যে হাটিকুমরুলে জমিদারের দানকৃত জমিতে স্থানান্তর করেন তখন নজিবর রহমানের বসতবাটি নির্মাণ ও ভোগদখলের জন্য জমিদার তাঁকে তের বিঘা লাখেরাজ সম্পত্তি দান করেন। এছাড়া, তিনি নিজে এবং তাঁর সর্বশেষ স্ত্রী দু'জনেই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করে জনসেবার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য

অর্থাগমও হতো। ফলে তাঁর সংসার খুব একটা অস্বচ্ছল ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ডক্টর গোলাম সাকলায়েন লিখেছেন ঃ

"ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সাধু সজ্জন ভদ্রলোক। ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অমায়িক। আপন ধর্মকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে নামাজ পড়িতেন, কোরান তেলাওয়াৎ করিতেন। ধর্মীয় প্রায় সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিতেন। পারিবারিক জীবন সুখের ও শান্তিময় ছিল। সাধারণের প্রতি কদাচ তিনি ঘৃণা বা অহঙ্কারের ভাব প্রদর্শন করেন নাই। কর্ম জীবনে ধর্মে আস্থা স্থাপন করিয়া তিনি চিত্ত-সংযম ও ধৈর্যের সহিত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।" (পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪)।

ডক্টর মযহারুল ইসলামও অনেকটা ডক্টর গোলাম সাকলায়েনের মতোই বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"ব্যক্তি জীবনে মোহাম্মদ নজিবর রহমান ছিলেন অমায়িক নিরহংকার পুরুষ। ধর্ম ও ঈশ্বরে তাঁর ছিল গভীর আস্থা। সরল ও সজ্জন হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। সমসাময়িককালে নজিবর রহমান ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি... সাধারণ লোকের প্রতি সুব্যবহার করা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কঠোর কর্তব্যে নিরত থাকাকালেও গভীর ধৈর্য সহকারে তিনি লোকজনের কথাবার্তা শুনেছেন।" (পূর্বোক্ত, পৃ. ৫)।

উপরোক্ত দুটি উদ্ধৃতি বিচার করলে দেখা যাবে, দুটোর মূল বক্তব্য একই। তবে ডক্টর ইসলাম তাঁর বক্তব্যকে খানিকটা নিজস্ব ও স্বতন্ত্র করে তোলার জন্য শব্দ ব্যবহারে কিছুটা স্বকীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন এবং তা করতে গিয়েই 'ঈশ্বর' শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন, নজিবর রহমান যা সতর্কভাবে এড়িয়ে চলতেন। তাঁর পূর্ববর্তী অনেক বড় বড় মুসলিম লেখকও অনেকটা হীনমন্যতাবশতঃ "ঈশ্বর' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নজিবর রহমান যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের সাথে সেক্ষেত্রে 'আল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

নজিবর রহমানের ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে তাঁর জনৈক ছাত্র কুমুদ বিহারী সাহা যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে তাঁর আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য উজ্জ্বল চরিত্রের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

"তিনি সর্ব বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। দারুণ জেদীও ছিলেন তিনি।... সে সময় হিন্দুরা প্রভাবশালী ছিলেন। মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে হিন্দুরা বাধা দিতো। স্বীয় সমাজের সেই দুঃসহ দুর্দিনে তিনি এগিয়ে আসেন। প্রাণের মায়া না করে বনমালী রায়ের মতো দুরাত্মা জমিদারের এবং একই সাথে শীতলাই জমিদারের সাথে লড়াই করেন।...

"সমাজের জাগরণই ছিলো তাঁর ধ্যান ও সাধনা।... তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। আমরা তাঁকে দেবতার মতোই জেনেছি ও পেয়েছি।... মৃত্যুর পরও তাঁকে দেখতে গিয়েছি। মানুষের ঢল নেমেছিল তাঁকে শেষ বারের মতো দেখতে।

"বাংলার এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের স্মৃতি রক্ষিত হলে, আমার গুরুদেবের নামে কোথাও কিছু হলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না। দেবদুর্লভ এই মহামানবের সত্যিকারের মূল্যায়ন হোক।" (বুলবুল ইসলাম, পূর্বোক্ত)।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বনমালী রায়ের সঙ্গে শীতলাই-এর জমিদারের কথাও জানা গেল। বনমালী রায়ের অন্যায় ও মুসলিম বিরোধী কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন নজিবর রহমান। সম্ভবত শীতলাই-এর জমিদার এক্ষেত্রে অত্যাচারী কমিদার বনমালী রায়ের সহায়তা করেছিলেন।

সাহিত্যিক পটভূমি

নজিবর রহমান যখন বাংলা সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করেন, তার প্রায় পাঁচ/ছয় দশক পূর্বেই আধুনিক বাংলা সাহিত্য তার পূর্ণ জ্যোতি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। বাংলা কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রহসন, জীবনী, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের সকল শাখায় প্রচুর এবং পরিণত সাহিত্য-কর্ম- লক্ষ্য করা গেছে। এ সময় যাঁদের বিশিষ্ট অবদানে বাংলা সাহিত্য নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁরা হলেন 'বাংলা গদ্যের জনক' নামে অভিহিত রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪–১৮৩৩), প্রসাদ গুণসম্পন্ন সাধু বাংলা গদ্যের জনক নামে অভিহিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৮৯১), আধুনিক বাংলাকাব্যের জনক নামে পরিচিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রঙ্গলাল (জন্ম ১৮২৭), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৪), বিহারী লাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪), হেমচন্দ্র (১৮৩৮–১৯০৩), বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩০–১৮৯৪), নবীন চন্দ্র সেন (১৮৪৭–১৯০৯), গোবিন্দ দাস (১৮৫৪–১৯২৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮–১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬–১৯৩৭) প্রমুখ। এঁরা সকলেই কমবেশী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে বাংলা সাহিত্যে চির অমর হয়ে আছেন।

শিক্ষা–সাহিত্য ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানগণ কিছুটা পড়ে এসেছে। উনবিংশ শতকে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্য লেখক হলেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮–১৯১১) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি হলেন মোহাম্মদ কাজেম অল কোরেশী (১৮৫৮–১৯৫১), কায়কোবাদ নামেই যিনি সমধিক পরিচিত। এরপর নজিবর রহমানের সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবি-সাহিত্যিক হলেন কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০–১৯৩৩), অসাধারণ বাগ্মী, সমাজ-সংস্কারক ও লেখক মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ (১৮৬১–১৯১৪), লেখক-সাংবাদিক মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ (১৮৬২–১৯৩৩), লেখক ও সুবিখ্যাত পুঁথি সংগ্রাহক আব্দুল করীম সাহিত্য-বিশারদ (১৮৬৯–১৯৫৩), লেখক-সাংবাদিক মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), মুসলিম সাংবাদিকতার অন্যতম জনক হিসাবে খ্যাত মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৭৭-১৯৬৬), নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০–১৯৩২), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

(১৮৮০-১৯৩১), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), একরাম উদ্দিন (১৮৮২-১৯৩৫), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) প্রমুখ। নজিবর রহমান এঁদের সমকালে সাহিত্য-চর্চায় ব্রতী হয়ে সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক সার্থক জনপ্রিয় মুসলিম ঔপন্যাসিক হিসাবে বাংলা কথা-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

সাহিত্য-চর্চা

নজিবর রহমান ঠিক কখন থেকে সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করেন সে ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্য অবগত হওয়া যায়নি। বিভিন্ন সূত্র থেকে যতটুকু অবগত হওয়া যায় তা থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি ঢাকায় নর্মাল পড়াকালে অল্পবিস্তর সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। কিন্তু সে সময় তিনি কী ধরনের সাহিত্য রচনা করেন তার কোন পরিচয় জানা যায় না। ধারণা করা চলে, প্রথম জীবনে প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমেই তাঁর সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত। তবে খুব সম্ভবতঃ সেসব রচনা তিনি প্রকাশার্থ কোন পত্রিকায় প্রেরণ করেননি বা গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেননি। ফলে সেসব রচনা সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারিনি।

'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর তিনটি প্রবন্ধ সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করেছেন ডক্টর গোলাম সাকলায়েন। ("মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য', সাহিত্যিকা, ১২শ বর্ষ, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃ. ১৭৫)। প্রবন্ধ তিনটির শিরোনাম ঃ 'পবিত্র নিদর্শন, মুসলমানের সপ্তরত্ন', 'তীব্বতে মুসলমান এবং তীব্বতবাসীর আচার ব্যবহার' এবং 'পূর্বস্মৃতি॥কুতুবুদ্দিন আয়বেক'। এ শেষোক্ত রচনাটি ১৯০১ সালের জুলাই-আগস্ট (৪র্থ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা) 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ যাবত প্রাপ্ত তাঁর রচনাবলীর মধ্যে এটিই প্রথম। এটা একটি ইতিহাস বিষয়ক রচনা। এটি বা প্রথমোক্ত দুটি রচনার কোনটিই তাঁর প্রকাশিত কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তিনি ছিলেন আজীবন শিক্ষক। শিক্ষক হিসাবে ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায় বা চরিত্র সম্পর্কে তাঁর মনে যে কৌতূহল বা আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কেই তিনি তাঁর শেষোক্ত রচনাটি লিখেছিলেন এবং পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরণ করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। এ ধরনের আরো প্রবন্ধ বা গ্রন্থ তিনি এর আগে বা পরে লিখেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে তিনি যে ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের মত অনুমানভিত্তিক বা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে ইতিহাস চর্চা বা ইতিহাস বিকৃত করেননি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁর রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'হাসন-গঙ্গা বাহমণি'। এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিলেন মহাকবি কায়কোবাদ। তাঁর উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধ দুটির নামকরণ থেকেই রচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুমান করা চলে। ইসলাম ও মুসলমান এই হলো এগুলোর বিষয়বস্তু। লেখক হিসাবে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান আর ঐতিহাসিক হিসাবে ছিলেন সত্যনিষ্ঠ।

যেহেতু তাঁর পূর্বকৃত কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায়নি, অতএব, উপরে বর্ণিত শেষোক্ত প্রবন্ধের প্রকাশকাল থেকে তাঁর মৃত্যু অবধি ন্যূনাধিক বাইশ বছরকে তাঁর

সাহিত্য-চর্চার কাল বলে ধরে নিতে পারি। দীর্ঘ তেষট্টি বছর আয়ুষ্কালে নজিবর রহমান মাত্র বাইশ বছর সাহিত্য চর্চা করেছেন এটা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কিন্তু এ সম্পর্কে অন্যরূপ তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত এটা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ বাইশ বছরকে আবার মোট দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১৯০১ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত প্রথম ভাগ। তারপর ১৯১৪ সালে 'আনোয়ারা' উপন্যাস প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত বন্ধ্যাকাল। কারণ এ সময় তাঁর রচিত কোন সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। এ সময় তিনি সাহিত্য চর্চা থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন সেটাও বিশ্বাস করা কঠিন। ১৯১৪ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ। এ সময় তিনি অত্যন্ত সৃষ্টিমুখর ছিলেন এবং এ যাবত পর্যন্ত প্রাপ্ত তাঁর রচিত ছোট-বড় মোট তেরটি গ্রন্থের মধ্যে এপারোটি গ্রন্থ অর্থাৎ গড়ে বছরে একটিরও অধিক গ্রন্থ তিনি এ সময় রচনা করেন।

উপরোক্ত দুই ভাগে বিভক্ত সময়কালে রচিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও সহজেই চোখে পড়ার মত। প্রথম ভাগে রচিত তাঁর সব সাহিত্যই প্রবন্ধ জাতীয় রচনা, দ্বিতীয় ভাগে তিনি কোন প্রবন্ধ রচনা করেননি; এ সময়কার সব রচনাই উপন্যাস ও গল্প। তবে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তাঁর রচিত সব উপন্যাস ও গল্পের মধ্যেই ছোট-বড় অনেক গল্পের আঙ্গিক বিদ্যমান। আরো একটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। তাঁর প্রথম ভাগের রচনায় রাজনীতি ও সমাজ-উন্নয়নের বিষয় সরাসরি স্থান লাভ করেছে কিন্তু দ্বিতীয় ভাগের রচনায় রাজনীতির প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত তবে সমাজ-উন্নয়নের বিষয় তাঁর সকল রচনায় সমভাবে গুরুত্ব সহকারে সমুপস্থিত।

প্রথম ভাগের রচনায় উপরোল্লিখিত তিনটি প্রবন্ধ ছাড়া উল্লেখযোগ্য দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ রয়েছে। এ দুটি গ্রন্থ হলো ঃ 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' (প্রকাশকাল ঃ বাংলা ১৩১১, ইসায়ী ১৯০৪) ও 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' (প্রকাশকাল ঃ বাংলা ১৩১১, ইসায়ী ১৯০৫)। ঘটনাক্রমে এ দুটি গ্রন্থই প্রকাশের সাথে সাথে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। ফলে এ দুটি গ্রন্থই দুষ্প্রাপ্য। গবেষক বুলবুল ইসলাম তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের অবদান' শীর্ষক নিবন্ধে 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' সম্পর্কে বলেন ঃ

"বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব জাতিসত্তার আলোকে সাহিত্য সৃষ্টি, সাহিত্য-শিল্পের প্রতি সমকালের শিক্ষিত মুসলমানদের অনীহা এবং তার পরিণাম, স্বাধীনতা এবং মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য সাহিত্যিকদের কর্তব্যবোধ, সর্বোপরি ভৌগোলিক পরিচয়ের উর্ধে উঠে ইসলামী উম্মার ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং যৌক্তিকতা নিরূপণই 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধমালার মৌল বিষয়।"

নাতিদীর্ঘ 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' বইটিতে শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের উন্নতির বিষয় আলোচিত হয়। মুসলমানদের অবনতির মূল কারণ অশিক্ষা, পরাধীনতা ও মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ ও হিন্দুদের চরম বিদ্বেষপরায়ণতা। এর প্রতিকারের প্রধান উপায় ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে লেখক মূলতঃ এ

বক্তব্যই রেখেছেন। কিন্তু এতে পরাধীনতার কুফল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইংরেজ ও হিন্দুদের চরম বিদ্বেষ ও ঈর্ষাপরায়ণতার উল্লেখ থাকায় বইটি বাজেয়াপ্ত হয়।"

নজিবর রহমানের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বিলাতী বৰ্জ্জন রহস্য' স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। এ গ্রন্থটিও প্রকাশের পরই বাজেয়াপ্ত হয়। গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক লিখেছেন ঃ

"বিলাতী বৰ্জ্জন রহস্য" প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে গবেষণা যুক্তি প্রমাণ কিছুই নাই। নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য দৃষ্টান্তই ইহার মূল ভিত্তি। দ্রুততা ও সময়ের অভাববশতঃ ভাষা ও বর্ণশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারা যায় নাই। সর্বসাধারণ যাহাতে বুঝিতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য ছিল। অতএব প্রার্থনা- সহৃদয় বিদ্বান পাঠক তজ্জন্য কপাল কুঞ্চিত করিবেন না। এই সামান্য পুস্তকে সমাজের সামান্যটুকু উপকার হইলেও শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। গ্রন্থকার" (ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৭)। লেখক বইটি উৎসর্গ করেছেন সিরাজগঞ্জ জেলার সাতটিকরী নিবাসী মুন্সী মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেনকে। উৎসর্গ পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

"মাননীয় সুহৃদ,

সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, প্রায় সকল লোকই নিরন্তর স্ব স্ব স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত আছে, ক্বচিৎ বিরাম বিশ্রামের সময়টাও তাহারা বাহুল্য প্যাচালে, হাসি-তামাশায় ও তাস পাশায় ক্ষেপন করে। কিন্তু আপনাকে সেরূপ দেখি না। আপনি কিসে পতিত মুসলমান জাতির পুনরুন্নতি হইবে- কিসে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে, কিসে নিরক্ষর সরল প্রাণ কৃষককুল পেট ভরিয়া একমুঠা পাইবে ইত্যাদি মনুষ্যোচিত চিন্তায় ও কার্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। তাই আজ আমি আমার সাধের এই 'বিলাতী বৰ্জ্জন রহস্য' স্বদেশী তরঙ্গের যুগে আপনার স্বদেশ ও সমাজ-হিতৈষিতার কর্মঠ উদার হস্তে অর্পণ করিলাম। সাধের সামগ্রী সামান্য হইলেও সুহৃদের নিকট উপেক্ষণীয় নহে, ইহাই ভরসা ইতি।" (ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৭)।

উৎসর্গ পত্রে বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বিবৃত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলন, পরাধীনতার অভিশাপ এবং হিন্দুদের হাতে মুসলমানদের নিগ্রহের বিষয় এতে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি কথপোকথনের ভঙ্গীতে রচিত। তবে এটা নাটক নয়। নাটকের উপযোগী বিষয়বস্তু, উপকরণ, কলাকৌশল এতে অনুপস্থিত। লেখক নিজেও এটাকে নাটক বলে উল্লেখ করেননি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় উভয় দিক পর্যালোচনার উদ্দেশ্যেই এতে সংলাপের ভঙ্গী ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর মুতাবিক ১৩১২ সনের ৩০শে আশ্বিন বঙ্গ বিভক্ত হয়ে পশ্চিম বঙ্গ, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর বিভাগ নিয়ে একটি প্রদেশ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে 'বঙ্গসাম' নামে আরেকটি প্রদেশ গঠিত হয় এবং এর রাজধানী স্থাপিত হয় ঢাকায়। এ অঞ্চলের অধিকাংশ জনগণ হল দরিদ্র, নিঃস্ব,

বঞ্চিত মুসলিম। তারা দীর্ঘকাল যাবত একদিকে ইংরেজদের বিভেদনীতি ও রাজনৈতিক জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছিল, অন্যদিকে হিন্দু-জমিদার-মহাজন-আমলা-কুসীদজীবী মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের দ্বারা শোষিত-নিগৃহীত হয়ে আসছিল। হিন্দু জমিদার মহাজন-আমলা-কুসীদজীবী মধ্যস্বত্ত্বভোগীরা অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতায় বসবাস করে ইংরেজ প্রভুদের ছত্রছায়ায় এতদিন পর্যন্ত নির্বিবাদে পূর্ববঙ্গ-আসামের দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণের উপর শোষণ-শাসন বজায় রেখেছিল। পূর্ববঙ্গ ও আসাম আলাদা হওয়াতে তাদের স্বার্থহানি ঘটে। নতুন রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে এৎদঞ্চলের মুসলমানদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বহুবিধ উন্নতির নতুন ও বহুমুখী সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের চরম বিরোধিতা শুরু করে। মুসলমানদের উন্নতির এ সম্ভাবনা ধূলিসাৎ করে দেয়ার জন্য শুধু কলকাতার কায়েমী স্বার্থবাদী বাবু সম্প্রদায়ই নয়, পূর্ববঙ্গ আসামসহ সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। তাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা মোহন চাঁদ করম চাঁদ গান্ধী স্বদেশী আন্দোলন তথা বিলাতি দ্রব্য বর্জন করার ডাক দেন। বাহ্যতঃ এটা স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত হলেও মুখ্যতঃ এটা বঙ্গভঙ্গ রদ করে হিন্দু স্বার্থরক্ষা ও মুসলিম-পীড়ন অব্যাহত রাখাই ছিল এর উদ্দেশ্য। হিন্দুদের এ আসল উদ্দেশ্য ফাঁস করে দেয়ার লক্ষ্যেই 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' গ্রন্থ বিরচিত। এ রহস্যের বিষয় দীন দয়াল বসু, মুন্সী যদু মোল্লা, হাজী সাহেব, জালু জমাদ্দার, কেতাব ফকির, মনিরুদ্দিন শেখ, বালক, মুসলমান বিধবা প্রমুখ পাত্র-পাত্রীর জবানীতে অভিব্যক্ত হয়েছে। অধ্যাপক ডক্টর জুলফিকার মতিনের ভাষায় ঃ

"বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক। হিন্দুর হাতে মুসলমানদের নির্যাতন ও বিলাতী পণ্য বর্জনের ভেতর দিয়ে হিন্দু কর্তৃক মুসলমানকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণের ষড়যন্ত্র-বিষয়টাকে এভাবেই দেখেছেন মোহাম্মদ নজিবর রহমান।" (জীবনী গ্রন্থমালা ঃ মোহাম্মদ নজিবর রহমান/জুলফিকার মতিন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা পৃ. ৩৩)।

'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' সম্পর্কে ডক্টার মযহারুল ইসলাম লিখেছেন ঃ

"উনবিংশ শতাব্দীর অন্তপাদ থেকে বিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, সমাজ তথা জাতীয় জীবন এর তরঙ্গে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়। প্রচুর সমস্যা, যার সমাধান সহজসাধ্য নয়, সেকালের ব্যক্তিমানসকে তাই সমস্যাক্রান্ত করে তুলেছিল। বর্তমান দশকের প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবল প্রতিক্রিয়া, সন্ত্রাসবাদ এ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমন্ডলকে ধূমায়িত করে তুলেছিল। ওহাবী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের বিদ্বেষ ও রোষ আবার তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানদের মর্মপ্রীতিতেও ফাটল ধরেছিল। বিদ্বেষ, সন্দেহ এবং একে অপরের প্রতি ঘৃণার মনোভাব ক্রমশঃই

বেড়ে চলতে থাকে। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমন্ডলের মধ্যে নজিবর রহমান তাঁর অনুভূতিশীল অন্তরে স্বভাবতই ক্লেদমুক্তির গভীর অনুপ্রেরণা অনুভব করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় এইসব বিভিন্ন আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে তাঁর 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' নামে বত্রিশ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা রচিত হয়।" (সামাজিক প্রেক্ষাপটে নজিবর রহমান/সিরাজগঞ্জের কৃতি সন্তান, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ৬৫)।

'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' এবং 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' বই দুটি প্রকাশের পর পরই তৎকালীন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়, একথা আগে উল্লেখ করেছি। এ দুটি বই বাজেয়াপ্ত হবার পর 'উত্তরবঙ্গে মুসলমান সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে হামেদ আলী লেখেন ঃ

"১। বিলাতী বর্জ্জন রহস্য, ২। সাহিত্য-প্রসঙ্গ॥ মাইনর স্কুলের হেড পণ্ডিত মুন্‌শী নজিবর রহমান প্রণীত।

ভাষা সাধু বাঙ্গলা। বাঙ্গলা ভাষার প্রতি ইহার বেশ অনুরাগ আছে, ইনি আরও পুস্তক লিখিতেছেন।" (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। রংপুর শাখা। ত্রৈমাসিক, তৃতীয় ভাগ, সন ১৩১৫ বঙ্গাব্দ। সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন সরকার, এম.এ, বি.এল. পৃ. ১২৯)।

১৯০৫ সন থেকে ১৯১১ সন পর্যন্ত নজিবর রহমানের সাহিত্য-চর্চার বিবরণ পাওয়া যায় না। এ সময় যে তিনি চুপচাপ বসেছিলেন তাও মনে হয় না। তবে 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' ও 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' বাজেয়াপ্ত হবার পর এ ব্যাপারে তিনি সম্ভবতঃ যথেষ্ট মানসিক চাপের সম্মুখীন হন। ফলে লেখার ব্যাপারে হয়তো সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, নয়ত লিখে থাকলেও তা প্রকাশ করতে সাহসী হননি। তবে এ সময় তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। ১৯০৬ সনে ঢাকায় মুসলিম লীগ সম্মেলনে যোগদান, সলঙ্গায় 'আঞ্জুমানে ইসলাম' সমিতি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন, অত্যাচারী হিন্দু জমিদার কর্তৃক মুসলিম প্রজা-পীড়ন রোধ, গো-কোরবানীর উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার জন্য প্রতিবাদ সভার আয়োজন, বড় লাটের নিকট এ ব্যাপারে দরখাস্ত প্রেরণ এবং সরকার কর্তৃক গো-কোরবানী পুনঃপ্রবর্তন ইত্যাদি কাজে তাঁকে তখন অতিশয় তৎপর দেখা যায়। এরপর ১৯১১ সন থেকে তাঁর সাহিত্য-চর্চার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। এ সময় তিনি যেসব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার একটি তালিকা নিম্নরূপ ঃ

এক– 'আনোয়ারা'। নজিবর রহমানের প্রথম ও সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস। রচনাকাল ১৯১১-১৪। প্রথম প্রকাশ ১৯১৪ সনে।

দুই–'চাঁদতারা বা হাসন-গঙ্গা বাহমণি'। নজিবর রহমানের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। রচনাকালের দিক দিয়ে এটি তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় উপন্যাস। কিন্তু এটি প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩২৩ (ইংরেজী ১৯১৭) সনে।

তিন– 'প্রেমের সমাধি'। সামাজিক উপন্যাস। আনোয়ারার পরিশিষ্টরূপে রচিত, তবে স্বতন্ত্র উপন্যাসের মর্যাদাপ্রাপ্ত।

চার– 'পরিণাম'। পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস।

পাঁচ– 'গরীবের মেয়ে'। একটি আত্মজীবনীমূলক সামাজিক উপন্যাস।

ছয়– 'মেহের-উন্নিসা'। সামাজিক-ধর্মীয় উপন্যাস।

আট– 'দুনিয়া আর চাই না।' গল্প-সংকলন।

নয়– 'বেহেস্তের ফুল' (উপন্যাস)

দশ– 'দুনিয়া কেন চাই না' (উপন্যাস)

এগার– 'রমণীর বেহেস্ত'। পারিবারিক উপন্যাস।

এছাড়া, নজিবর রহমান কতিপয় পাঠ্য-পুস্তক রচনা করেন বলে জনশ্রুতি আছে, কিন্তু এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত দুটি মাত্র তথ্য থেকে এ সম্পর্কে কিছুটা অবগত হওয়া যায়। এগুলো হলো ঃ

এক) বাংলা ১৩২৩ সনে প্রকাশিত 'হাসন-গঙ্গা বাহমণি' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয়, 'পারসী কি পহেলী কেতাবে'র সুচারু ব্যাখ্যা। ছাত্রগণের বিশেষ সাহায্যকারী, প্রত্যেক শব্দের, বাক্যের ও পংক্তির বিশদ ব্যাখ্যা সরল বাংলা ভাষায় লিখিত।....' সম্ভবতঃ তিনি রাজশাহী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করাকালে মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উপলব্ধি করে এ ধরনের বই রচনা করে থাকবেন। অবশ্য একথাও সত্য যে, সেকালে মাদ্রাসা ছাড়া সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।

দুই) এ সম্পর্কিত দ্বিতীয় যে তথ্যটি পাওয়া যায় তা হলো ঃ নজিবর রহমানের মৃত্যুর পর কলকাতার সাপ্তাহিক 'সোলতান' (নব পর্যায়)'-এর ৯ই কার্তিক, শুক্রবার, ১৩৩০ তারিখের সংখ্যায় যে 'শোক-সংবাদ' ছাপা হয়, তার একস্থানে উল্লেখ করা হয় যে, 'ইনি একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন। ইহার রচিত 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য', 'আনোয়ারা', 'হাসন-গঙ্গা বাহমণি', 'গরীবের মেয়ে' ও মুসলমান সমাজের কতিপয় পাঠ্য-পুস্তক রহিয়াছে।' উদ্ধৃত সংবাদ থেকে তাঁর রচিত পাঠ্য-পুস্তকের নাম, সংখ্যা ও সুনির্দিষ্ট কোন কিছু জানা না গেলেও তিনি যে একাধিক পাঠ্য-পুস্তকের প্রণেতা ছিলেন সে সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, এ সম্পর্কে অতিরিক্ত কোন তথ্য জানা যায় না।

এখানে নজিবর রহমানের যে তেরটি (দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থসহ) গ্রন্থের উল্লেখ করা হলো তার মধ্যে নয়টি গ্রন্থ তাঁর জীবনকালে প্রকাশিত হয়। বাকী চারটি বই–'বেহেস্তের ফুল', 'নামাজের ফল', 'রমণীর বেহেস্ত' ও 'দুনিয়া কেন চাই না' প্রকাশের জন্য লেখক কলকাতার প্রকাশকের নিকট গিয়েছিলেন, ফিরে আসেন অসুস্থ হয়ে। পরে এ বইগুলোর আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। লেখক সে অসুখ থেকে আর সুস্থ হয়ে ওঠেননি। ফলে ঐ পাণ্ডুলিপিগুলোর খোঁজ-খবর নেয়া আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে ডক্টর গোলাম সাকলায়েন বলেন ঃ

"দুনিয়া কেন চাই না' এবং 'বেহেস্তের ফুল' নামক দুইখানি গ্রন্থের হদিস পাওয়া গিয়াছে। বাংলা ১৩২৭-২৮ সালে নজিবর রহমান যখন হাটিকুমরুল গ্রামে নিতান্ত অসুস্থ অবস্থায় বাস করিতেছিলেন তখন 'বেহেস্তের ফুল' বইখানির পান্ডুলিপি কলিকাতার মতান্তরে ঢাকার কোন এক পুস্তক-প্রকাশকের নিকট প্রদান করিয়াছেন 'দুনিয়া কেন চাই না' পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপিও এই সময়ই প্রস্তুত হইয়াছিল।" (মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৪, পৃ. ৩৩)।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করলে কিছুটা অসঙ্গতি চোখে পড়ে। প্রথমে ডক্টর সাকলায়েন উপরোক্ত 'দুইখানি গ্রন্থের হদিস পাওয়া গিয়াছে' বলে পাঠককে আশ্বস্ত করলেও তাঁর পরবর্তী বিবরণ থেকে আশ্বস্ত হবার মত সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাছাড়া, তিনি শুরুতে 'দুইখানি গ্রন্থে'র কথা বলে মাত্র একখানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি 'কলিকাতার মতান্তরে ঢাকার কোন এক পুস্তক-প্রকাশকের নিকট প্রদান করিয়াছেন' বলে উল্লেখ করেন। এতৎসঙ্গে লেখক ঐ সময় 'হাটি কুমরুল গ্রামে নিতান্ত অসুস্থ অবস্থায় বাস করিতেছিলেন' বলেও ডক্টর সাকলায়েন উল্লেখ করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, 'নিতান্ত অসুস্থ অবস্থায় কীভাবে কলকাতা বা ঢাকায় গেলেন? প্রকাশক তাঁর হাটিকুমরুল গ্রামে এসেছিলেন বলেও মনে হয় না। অতএব, যাঁরা বলেন যে, নজিবর রহমান উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলো কলকাতা বা ঢাকার কোন প্রকাশকের নিকট দিয়ে গ্রামে ফিরে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, সম্ভবতঃ তাঁদের কথাই অধিক গ্রহণযোগ্য। পাণ্ডুলিপিগুলো পরে মুদ্রিত হয়েছে কিনা, তা জানা যায় না। এতদিন পরেও যখন এ পাণ্ডুলিপিগুলো সম্পর্কে সঠিক কোন হদিস পাওয়া যায়নি, ফলে ধারণা করা যায় যে, এগুলোর উদ্ধার কার্য এখন আর কোন সহজ কাজ নয়। ফলে নজিবর রহমানের পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করাও কঠিন।

অতএব, নজিবর রহমানের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও আমাদেরকে সমগ্র নয়, খণ্ডিত নজিবর রহমান-সাহিত্যকর্মের আলোচনায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

কবি গোলাম মোস্তফা

১৮৯৫ ঈসায়ী মুতাবিক বাংলা ১৩০২ সন ৭ই পৌষ রবিবার মনোহরপুর, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ্‌তে কবি গোলাম মোস্তফার জন্ম। অনেকে তাঁর জন্ম সন ১৮৯৭ বলে উল্লেখ করে থাকেন। এর কারণ তাঁর প্রকৃত জন্ম সন আর সার্টিফিকেটে লিখিত জন্ম তারিখ এক নয়। তাঁর সার্টিফিকেটে উল্লিখিত জন্ম সন ১৮৯৭ কিন্তু প্রকৃত জন্ম সন ১৮৯৫। এ সম্পর্কে 'আমার জীবন স্মৃতি'তে কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন ঃ

"আমার জন্ম পল্লী হলো ঝিনাইদহ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) শৈলকুপা থানার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে। আমার ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের বর্ণনানুসারে দেখা যায় ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে আমার জন্ম। কিন্তু আমার মনে আছে শৈলকুপা হাইস্কুলে ভর্তি হবার সময় আমার আব্বা আমার বয়স প্রায় বছর দুই কমিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্রকৃত জন্ম হয়েছিল সম্ভবত ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে। তবে এটা ঠিক যে, যেদিন আমার জন্ম হয় সেদিন বাংলা তারিখ ছিল ৭ই পৌষ রবিবার।"

বিখ্যাত কুমার নদীর তীরবর্তী মনোহরপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রখ্যাত কবি গোলাম মোস্তফার জন্ম। কবির পিতার নাম কাজী গোলাম রব্বানী এবং দাদার নাম কাজী গোলাম সরোয়ার। তাঁরা উভয়েই শিক্ষিত ও কাব্য-রসিক ছিলেন। আরবী ও ফারসী ভাষায়ও তাঁদের যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। কবির আদি পিতৃভূমি ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত নিভেকৃষ্ণপুর গ্রামে। এ সম্পর্কে কবির দ্বিতীয় পুত্র মোস্তফা আজিজ লিখেছেন ঃ

"বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি গোলাম মোস্তফা ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে (?) যশোর জেলার (সাবেক ঝিনাইদহ মহকুমা, বর্তমানে জেলা) মনোহরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী গোলাম

রব্বানী আর দাদার নাম কাজী গোলাম সরোয়ার। তিনিও ছিলেন আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত; তখন তাঁর আদি বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার (বর্তমানে রাজবাড়ী জেলা) অন্তর্গত পাংশা থানার 'নিভেকৃষ্ণপুর' গ্রামে।... এরপরে আমার দাদা মরহুম কাজী গোলাম রব্বানী মনোহরপুরে বিয়ে করে এখানেই বসতবাটি হিসাবে বসবাস করার পরিপ্রেক্ষিতে মনোহরপুরেই আমাদের জন্মভূমি নামে সুপরিচিতি লাভ করেছে।"

মনোহরপুর কাজী পরিবারে পূর্ব থেকেই বিদ্যাশিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা চলে আসছিল। বাংলা ছাড়াও আরবী ফারসী ভাষার চর্চা ছিল সেখানে। কবির পিতা ও পিতামহ উভয়েরই গ্রাম্য কবি হিসেবে বিশেষ খ্যাতি ছিল। মনোহরপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী বিজুলিয়া গ্রামে এক সময় নীল কুঠি ছিল। ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারে নিরীহ গ্রামবাসী কৃষক অতিষ্ঠ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এ বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন কবির পিতামহ কাজী গোলাম সরোয়ার। তিনি নীলকরদের অত্যাচার-নির্যাতনের বর্ণনা সংবলিত একটি গান রচনা করেন, যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কথিত আছে, কবির পিতা গোলাম রব্বানী তৎকালে প্রকাশিত হিতবাদী, মিহির ও সুধাকর, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন এবং নিয়মিত সাহিত্য-চর্চা করতেন। তৎকালে মুসলিম সমাজে রাত্রিবেলা বাড়ী বাড়ী পুঁথি পাঠের আসর বসতো। কবির পিতা গোলাম রব্বানী নিজ বাড়ীতে পুঁথি পাঠের আসরে সুর করে পুঁথি পাঠ করতেন। এসব পুঁথির মধ্যে জঙ্গনামা, আমীর হামজা, কাসাসুল আম্বিয়া, গুলে বকৌলি ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবির পরিবার ও তাঁর পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে কবির জ্যৈষ্ঠা কন্যা ফিরোজা খাতুন তাঁর লেখা 'আমার আব্বা কবি গোলাম মোস্তাফা' নামক স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ

"কবি গোলাম মোস্তফার পিতার জন্ম কাজী বংশে। তিনি মুন্সীগিরি করতেন পোস্ট অফিসে, তাই তাঁর নাম ছিল মুন্সী গোলাম রব্বানী। পুঁথি পড়ার আসর বসাতেন, বিয়ের উপহারপত্র লিখতেন, নীলকর বিরোধীদের কবিতা ও শ্লোগান লিখে দিতেন। তবু আমার মনে হয় আব্বার প্রতিভা ও পরিবেশ দাদীর কাছ থেকেই বেশি প্রভাবিত। ... এক দিনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে, আব্বাস উদ্দীন সাহেবকে নিয়ে আমাদের দেশের বাড়ীতে আব্বা সাত দিন ধরে এক বিরাট গানের জলসা বসিয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের মান্যগণ্য গায়ক, শ্রোতা, সাধারণ মানুষের ভিড়ে বাড়ীসহ সারা গ্রাম মুখরিত। প্রতিদিন গরু-ছাগল-মুরগী পুকুরের মাছ রাঁধা হত, খাওয়া দাওয়া গান বাজনা, গল্প গুজবের সে যে কি আনন্দমুখর পরিবেশ– তা উপভোগ করা ছাড়া বর্ণনায় বলা সম্ভব নয়। তখন গায়ক আব্বাস চাচা গিয়েছেন দাদীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ীর মধ্যে। দাদী বললেন, 'কি দেখতে আসছো বাবা। খোকা (আব্বার ডাক নাম) আমার সরবরের পদ্মফুল– ওপর থেকে দেখাই ভাল... বোঁটা বেয়ে গোড়ায় গেলে শুধু পাক (কাদা) পাবে'। চাচা মুগ্ধ হয়ে উত্তর দিলেন– 'যে স্থান থেকে ঐ পদ্মফুলের উৎপত্তি সেই পাক স্থানকেই (পবিত্র) সালাম

করতে এলাম'। এ রকমভাবে সব সময় তিনি শ্লোক, উপমা, ছড়া ও স্বরচিত সুরসিক, সুমধুর বাক্যে কথা বলে মানুষ আকর্ষণ করতেন।" (নতুন কলম, অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ. ১৯)

মাত্র চার বছর বয়সে পিতার নিকট কবি গোলাম মোস্তফার লেখাপড়ায় বিসমিল্লাহখানি। তারপর প্রথমে পার্শ্ববর্তী দামুকদিয়া গ্রামের পাঠশালা অতঃপর ফাজিলপুর গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া করেন। এরপর কবি শৈলকুপা হাইস্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯১৪ ঈসায়ীতে। অতঃপর ১৯১৬ সনে খুলনার দৌলতপুর কলেজ থেকে আই.এ. ও ১৯১৮ সনে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। এরপর তিনি শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকাকালে কবি ১৯২২ সনে কলকাতা ডেভিড হেয়ার কলেজ থেকে বি,টি পাশ করেন।

শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হয়ে কবি প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুর সরকারী হাইস্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। ১৯২৪ সনে সেখান থেকে কলকাতা হেয়ার স্কুলে বদলী হন। এরপর ১৯৩২ সনে কলকাতা মাদ্রাসায় যোগ দেন। সেখান থেকে ১৯৩৫ সনে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট ডিমনস্ট্রেশন হাইস্কুলে প্রথম সহকারী প্রধান শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর কিছুকাল হুগলি কলেজিয়েট হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক, বাঁকুরা জেলা স্কুলে (১৯৪০-১৯৪৬) প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষে ফরিদপুর জেলা স্কুলে ১৯৪৬-১৯৫০ সন পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ঢাকায় শান্তিনগরে বাড়ী করে সেখানেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। এ সময় তাঁর বাড়ী 'মোস্তফা মঞ্জিল' সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৯৬৪ সনের ১৩ই অক্টোবর সেরিব্রাল থ্রম্বসিস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ৬৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি কবি গোলাম মোস্তফা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথেও জড়িত ছিলেন। ১৯২৭ সনে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র মুখপত্র 'সাহিত্যিকা' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি সুসাহিত্যিক এয়াকুব আলী চৌধুরীর সাথে যৌথভাবে এর সম্পাদনা করেন। ১৩৬৭ সনে প্রকাশিত পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পূরবী'র তিনি যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ আব্দুল হাই। 'পূরবী'র মাত্র একটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর গোলাম মোস্তফার একক সম্পাদনায় রাইটার্স গিল্ডের মুখপত্র 'লেখক সংঘ পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। 'নও বাহার' পত্রিকাটিও তিনি পরিচালনা করতেন। এ পত্রিকাটির সম্পাদিকা ছিলেন কবির দ্বিতীয়া স্ত্রী মাহফুজা খাতুন।

কবি গোলাম মোস্তফা প্রকাশনা ও পুস্তক পরিবেশনার কাজেও কিছুটা জড়িত ছিলেন। কলকাতার ৪৫নং মির্জাপুর স্ট্রীটে 'মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী' নামে তাঁর একটি লাইব্রেরী ছিল। ১৯৪৫ সনে তিনি উক্ত একই নামে ঢাকায় ৯৫নং ইসলামপুর রোডে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করেন এবং সে সাথে জিন্দাবাহার লেনে স্থাপন করেন 'মুসলিম বেঙ্গল প্রেস'। এ লাইব্রেরী ও প্রেস যতটা না তাঁর জীবকার্জনের সহায়ক ছিল, তার চে' বেশী সহায়ক ছিল তাঁর গ্রন্থাদি প্রকাশ ও পরিবেশনার কাজে।

শিক্ষকতার পাশাপাশি কবি গোলাম মোস্তফা বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাথে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রেখেছিলেন। কলকাতার 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি', 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি', বিভাগ-পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে ঢাকায় 'পাকিস্তান মজলিশ', 'রওনক', 'পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড', 'পাক-সাহিত্য সংঘ' প্রভৃতি সাহিত্য-সংস্কৃতি সংস্থার সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। রাইটার্স গিল্ড-এর পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান শাখার তিনি অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। 'রওনক'-এর বেশির ভাগ অনুষ্ঠান তাঁর নিজ বাড়ী 'মোস্তফা মঞ্জিলে'ই অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৬১ সনে ঢাকায় নবগঠিত পাক-সাহিত্য সংঘের দু' দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারের (১১-১২ নভেম্বর, ১৯৬১) প্রথম দিনে তিনি মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল ঃ 'ইসলামী সাহিত্যের স্বরূপ'। এতে সভাপতিত্ব করেন জ্ঞানতাপস বহু ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কায়দে আজম কলেজের (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী কলেজ) অধ্যাপক মহিউদ্দিন আহম্মদ ও অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শাহ আব্দুল হান্নান ও মুহম্মদ মতিউর রহমান।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষায় ঃ "আমার স্পষ্ট মনে আছে ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার মোসলেম ইনস্টিটিউটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম। সেই সভায় গোলাম মোস্তফা সাহেব 'কবি ও বৈজ্ঞানিক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সেই প্রবন্ধটি আমার এত ভাল লেগেছিল যে আমি আমার গলার হার তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়েছিলাম।" (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ কবি গোলাম মোস্তফা ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমাজ)।

এভাবে দেখা যায়, বহু সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ১৯৪১ সনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে'র সপ্তম অধিবেশনের কাব্য শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন। সভাপতির ভাষণে তিনি যে উদ্দীপনাপূর্ণ মূল্যবান বক্তৃতা দেন প্রখ্যাত সাংবাদিক, লেখক ও ভাষা-সৈনিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন তাঁর 'অতীত দিনের স্মৃতি' গ্রন্থে সে সম্পর্কে লেখেন ঃ

"কবি গোলাম মোস্তফা কাব্য-সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসাবে তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। তিনি মুসলমান কবিগণকে তাঁদের কাব্য সৃষ্টিকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, হিন্দু কবিদের অনুকরণ নয় বরং মুসলমানের বিশিষ্ট অনুভূতির রূপায়ণেই মুসলিম কাব্য-সাধনা সার্থক ও স্বকীয়তামণ্ডিত হবে।"

সাহিত্য-সংগঠক হিসাবে গোলাম মোস্তফার আন্তরিকতা ছিল অপরিসীম। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর উক্তি ঃ

"সমাজের জন্য কবির কতখানি দরদ ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলাম ১৯২৪ সনে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রক্ষাকল্পে তাঁর প্রচেষ্টার ভিতর। ঐ সময় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (তখন অবশ্য ডক্টর হননি) কলকাতা ছেড়ে সম্ভবতঃ ঢাকায় আসেন। কাজী আব্দুল ওদুদও চাকরি নিয়ে ঢাকা কলেজে যোগদান করেন। অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খান (তখন অধ্যক্ষ হননি) ল. পাস করে ময়মনসিংহ যান। কবি মোজাম্মেল হক (বরিশালী) নিজস্ব এক পাবলিকেশান কোম্পানী খুলে তাই নিয়ে ব্রিত হয়ে পড়েন। এইভাবে পুরাতন উদ্যোগী সদস্যগণ সকলেই দূরে যাওয়ায় সমিতি অচল হয়ে পড়ে। বাড়ী ভাড়ার দায়ে তার লাইব্রেরী নিলামে ওঠে। তখন অবশিষ্ট সভ্যেরা লাইব্রেরীর মূল্যবান বইগুলি মীর্জাপুর স্ট্রীটের এক বাড়ীতে সরিয়ে এনে কোনও মতে রক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু সমিতি চালাতে হলে অর্থের প্রয়োজন। কবি তখন হুগলী জেলা স্কুলে চাকরি করেন। সভ্যেরা তাঁকেই সম্পাদক করে অর্থের চেষ্টায় বের হন। কবি প্রতি রবিবারে হুগলি হতে কলকাতা এসে সমিতির জন্য পরিশ্রম করতেন।... কবির যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে আমি নিজে এবং আরও কতিপয় সদস্য কবির সঙ্গে চাঁদার খাতা নিয়ে কলকাতার সাহিত্যামোদী ও শিক্ষিত মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি।" (মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮-৫৯)

গোলাম মোস্তফা প্রধানতঃ কবি হিসাবে সুপরিচিত হলেও তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমাত্রিক। তিনি একাধারে কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, জীবনী গ্রন্থ, অনুবাদ প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কবিতার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বিচিত্র। তিনি একাধারে গীতি কবিতা, মহাকাব্য, শিশুতোষ কাব্য, গান ইত্যাদি রচনা করেন। রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তবে ক্রমান্বয়ে তিনি সে প্রভাবের উর্ধে ওঠার প্রয়াস পান। এ প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর রচিত "আমাদের জাতিসত্তার কবি গোলাম মোস্তফা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন ঃ

"এ কবির জন্মের পরেই ১৯১৩ সালে কবিগুরু নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং এদেশীয় সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বশালী প্রতিভাধর বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। রবীন্দ্র-প্রভাব ক্রমে এ দেশীয় কবি সমাজে অত্যন্ত অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় এবং

আমাদের কবিদের মধ্যে একটা বলয়ের সৃষ্টি করে। এ বলয়ের মধ্যে তখন চারজন কবি অবস্থান করেও স্বকীয় প্রতিভার দওলতে আমাদের ভাষাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁরা হচ্ছেন ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় ও যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী। সেই বলয়ের মধ্যে অবস্থান করেও পূর্বোক্ত কবিগণ তাঁদের নিজস্ব চিন্তা-ধারণা ও প্রত্যয়কে তাঁদের নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ হন। তাঁদের মধ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিগুরু থেকে স্বীকৃতি ও প্রসংশা লাভ করেছেন। কবি গোলাম মোস্তফা এ বলয়ের মধ্যেও ছিলেন। তাঁর 'রক্তরাগ' প্রকাশের পর তাঁকেও কবিগুরু স্নেহ ও উৎসাহ দান করেছেন।"

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ বলেন ঃ "গোলাম মোস্তফা যে নিঃসন্দেহে কাব্য-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, সে সম্বন্ধে কাঁরো মতভেদ নাই। তাঁর প্রতিভা কোন স্তরের অন্তর্গত ছিল, তাঁর সৃষ্টির কোন এবং কত অংশ নিছক কাব্য হিসাবে মহাকালের পরীক্ষায় অনাগত ভবিষ্যতের অমর ফলকে স্থান লাভ করবে, সে আলোচনায় আপাততঃ না গিয়ে আমরা অকুণ্ঠ-কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি যে, প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল তক তিনি মুসলিম বাংলার তরুণদের চিত্তে উদ্দীপ্ত প্রেরণার অন্যতম প্রতীক হিসাবে বিরাজমান ছিলেন। যেকালে বাংলা সাহিত্যের আকাশে নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন কারো আবির্ভাব ঘটে নাই, সেকালে মুসলিম বাংলায় গোলাম মোস্তফাই প্রায় একমাত্র কাব্য-পথযাত্রী, যাঁর কবিতা দেশময় ইস্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা ক্লাসে পড়তো, বাইরে আবৃত্তি করতো, মজলিশ-মহফিলে সুর সংযোগে গাইতো। বাংলার সে অবসাদক্লিষ্ট মুসলিম সমাজের ভীরু সমাজে গোলাম মোস্তফার কবিতা ছিল ভ্রাম্যমান চারণের উদ্দীপ্ত কণ্ঠের জাগরণী গান।" (ইব্রাহীম খাঁ ঃ কবি গোলাম মোস্তফার আদর্শ ও অন্তরঙ্গতা)।

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও গোলাম মোস্তফার জীবনীকার মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন ঃ "বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে আধুনিক বাংলা কাব্যে গোলাম মোস্তফার ভূমিকা ও অবদানের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর আবির্ভাবকালের পটভূমি এবং মুসলিম সমাজ প্রেক্ষিতের দিকে অবশ্যই বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।... যে কালে অতি অল্প বয়সেই তিনি কাব্য চর্চা শুরু করেন, সেকালে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাঙালী মুসলিম সমাজ ছিল শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ।" (গোলাম মোস্তফা/ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, পৃ. ১০)।

রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করে রবীন্দ্র কবি-প্রতিভার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও গোলাম মোস্তফা ছিলেন উপরোক্ত চার কবির মতই কিছুটা স্বতন্ত্রধর্মী। এ স্বাতন্ত্র্য নিজস্ব ভাব ও মননের ক্ষেত্রে। মুসলমান হিসাবে কবি এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, তৌহিদী চেতনা ও ভাব-সম্পদে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত হন। তাঁর বিভিন্ন কাব্যে ও গদ্য-রচনায় এর সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। তাই উপরোক্ত বলয়ের মধ্যে থেকেও রবীন্দ্রনাথ

ও উপরোক্ত চার কবি থেকে গোলাম মোস্তফা ক্রমান্বয়ে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছেন। এ সম্পর্কে কবির নিজস্ব মতামত উদ্ধৃত করছি। তিনি তাঁর এক অভিভাষণে বলেন ঃ

"যে যুগে আমার জন্ম, সে যুগ বাংলার মুসলমানদের অবসাদের যুগ। সে যুগে আমাদের সাহিত্যের না ছিল কোন স্বাতন্ত্র্য, না ছিল কোন স্বকীয়তা। প্রত্যেক জাতির মননশক্তি, ঐতিহ্য, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয় মাতৃভাষার মধ্যে। জাতির অন্তরমূর্তি ছায়া ফেলে তার সাহিত্যের মনোমুকুরে। সাহিত্য তাই জাতির মনের প্রতিধ্বনি। সাহিত্যের ভিতর দিয়েই গোটা জাতির সাচ্চা চেহারা দেখা যায়। সেই হিসাবে বাংলার মুসলমানদের কোন সাহিত্যই তখন রচিত হয়নি। আমি তাই ছোটবেলা থেকেই চেয়েছিলাম মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য রচনা করতে। রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগী হলেও আমার মনে জেগেছিল আমাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির একটা দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির তাগিদে নয় সহজভাবেই আমি বাংলা সাহিত্যে চেয়েছিলাম ইসলামী কৃষ্টির রূপায়ণ। মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ এঁরা প্রত্যেকে ছিলেন হিন্দু জাতির মর্মবাণীর উদ্গাতা।... বাঙ্গালীর অর্ধেকের বেশী হলো মুসলমান। কাজেই বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানদের জীবনের প্রকাশ যদি না থাকে তবে সে সাহিত্য কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামের রূপায়ণ তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই অনিবার্য হয়েছিল এবং এখনো আছে।"

গোলাম মোস্তফার সাহিত্য-চর্চার তাগিদ উপরে বিধৃত হয়েছে। সাহিত্য-চর্চার এ তাগিদই তাঁর মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও আবেদন সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ ও উপরোক্ত চার কবির চিন্তা-চেতনা, ভাব-বিষয় ও ঐতিহ্যিক অনুপ্রেরণা থেকে গোলাম মোস্তফার স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট তাই রবীন্দ্র-বলয়ের মধ্যে থেকেও তিনি তাঁর স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধারা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর লেখায় সঙ্গতভাবেই তাঁর কাঙ্ক্ষিত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামের রূপায়ণ' তথা 'মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য' সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় গোলাম মোস্তফার বিচিত্র অবদান নিম্নরূপ ঃ

কাব্য ঃ রক্তরাগ (১৯২৭), হাস্নাহেনা (১৩৩৪), খোশরোজ (১৯২৯), কাব্য-কাহিনী (১৯৩২), সাহারা (১৩৩৬), শেষ ক্রন্দন, তারানা-ই পাকিস্তান (১৯৪৮), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯)।

মহাকাব্য ঃ বনি আদম (১৯৫৮)।

গান ঃ গীতি-সঞ্চয়ন (১৯৬৮)।

শিশুতোষ কাব্য ঃ আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি।

অনুবাদ কাব্য ঃ এখওয়ানুস সাফা (১৯২৭), মুসাদ্দাস-ই-হালী (১৯৪১), কালামে ইকবাল (১৯৫৭), আল-কুরআন (১৯৫৭), শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া (১৯৬০)।

উপন্যাস ঃ রূপের নেশা (প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ), ভাঙ্গাবুক (১৯২৮)।

জীবনী গ্রন্থ ঃ হজরত আবু বকর।

প্রবন্ধ ঃ বিশ্বনবী (১৯৪২), মরুদুলাল (বিশ্ব নবীর কিশোর সংস্করণ), আমার চিন্তাধারা, গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন (১৯৬৮), ইসলাম, বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য, ইসলাম ও কমিউনিজম, ইসলামে জেহাদ।

পাঠ্য-পুস্তক ঃ আলোকমালা (সিরিজগ্রন্থ), আলোক-মঞ্জুরী (সিরিজ গ্রন্থ), মঞ্জু-লেখা (কথাশিল্পী মনোজ বসু সহযোগে), মণি-মুকুর (কথাশিল্পী মনোজ বসু সহযোগে), খোকা খুকুর বই, নতুন বাংলা ব্যাকরণ, School Boys Translation.

ইংরেজী রচনা ঃ The Mosalman, The Star of India, The Morning News, The Pakistan Observer, The Dawn ইত্যাদি দৈনিক এবং অন্যান্য সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহুসংখ্যক তথ্যপূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপা হয়। এগুলোও এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

এছাড়া, শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত তাঁর অসংখ্য কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এগুলো এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

বয়সের দিক দিয়ে গোলাম মোস্তফা কাজী নজরুল ইসলামের চার বছরের বড়। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান লিখেছেন ঃ "কাব্য জগতে গোলাম মোস্তফা নজরুল ইসলামেরও বহু পূর্ব হইতে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত। আধুনিক কালের অনেক কবির নামও যখন শোনা যায় নাই, গোলাম মোস্তফা সেইকাল হইতেই কবিতা রচনা করিয়া আসিতেছেন।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬১০)

১৩১৩ সনে গোলাম মোস্তফা যখন মাত্র দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'আন্দ্রিয়ানোপল উদ্ধার' শীর্ষক একটি কবিতা 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে ছাপা হয়। এটাই তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা। এ প্রথম প্রকাশিত কবিতার মাধ্যমেই তিনি সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং কবি হিসাবে তাঁর ভবিষ্যত সম্ভাবনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। এ সম্পর্কে কবি বন্দে আলী মিয়ার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"সেই সময় ইউরোপ খণ্ডে বলকান যুদ্ধ চলছিল। তুরস্ক সেনাবাহিনী বুলগেরিয়ানদের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় সমগ্র মুসলিম জাহানে একটি বিমর্ষতার ছায়া নেমে এসেছিল। এমন সময় সহসা সংবাদ পাওয়া গেল, কামালপাশা বুলগেরিয়ানদের নিকট থেকে 'আন্দ্রিয়ানোপল' পুনরুদ্ধার করেছেন, এই খবরে স্বজাতিবৎসল কিশোর কবির প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। তিনি 'আন্দ্রিয়ানোপল উদ্ধার' নাম দিয়ে এক রাত্রির মধ্যে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন। অতঃপর কবিতাটি তিনি 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তী সপ্তাহে কবিতাটি মুদ্রিত হলো।

কবিতাটির সূচনা ছিল এইরূপ ঃ

'আজিকে প্রভাত কি বারতা নিয়া
ধরায় আসিলি নামিয়া।'

"কবিতার ছন্দ, ভাব এবং প্রকাশভঙ্গী তখনকার দিনে সবই ছিল নতুন। এই কবিতায় পাঠক মহলে তাই একটা সাড়া পড়ে গেল। বাংলার মুসলিম সমাজে যে একজন আধুনিক কবির আবির্ভাব হয়েছে, একথা সহজেই স্বীকৃতি লাভ করলো। গোলাম মোস্তফাও নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেন। সেই থেকে তিনি কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতে শুরু করলেন।"

মূলতঃ কবি হলেও গোলাম মোস্তফার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হলো একটি উপন্যাস— 'রূপের নেশা'। কবি তখন সবেমাত্র বি.এ. ক্লাসের ছাত্র। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ভাঙাবুক' প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সনে। এতে সমকালীন বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত জীবনের আলেখ্য রূপায়িত হয়েছে। ঔপন্যাসিক হিসাবে গোলাম মোস্তফা খুব একটা সাফল্য অর্জন করেছেন বলে মনে হয় না। তবে এর দ্বারা কবির বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রক্তরাগ' প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সনে। প্রকাশের পর তিনি এর একটি কপি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জবাবে তাঁকে দু' লাইনের একটি চমৎকার কবিতা উপহার দিয়েছিলেন। লাইন দুটো এই ঃ

'তব নব প্রভাতের রক্তরাগখানি
মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।'

'রক্তরাগ' পাঠক সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, বিশেষতঃ মুসলিম পাঠক সমাজে। অবশ্য এ বইটি প্রকাশিত হবার বেশ আগে থেকেই কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রতিভার সূর্যকান্তি নিয়ে বাংলা কাব্য-জগতকে আলোড়িত করে তোলেন। সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি তখন নজরুল ইসলামের দিকেই আবদ্ধ। তাই 'রক্তরাগে'র মাধ্যমে গোলাম মোস্তফা সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম না হলেও এ গ্রন্থে তাঁর কবি-প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত দু' লাইনে এ উক্তির সমর্থন মেলে। ১৩৩৮ সনের কার্তিক সংখ্যায় 'সাম্যবাদী' পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয় ঃ "'রক্তরাগ' তাঁহার কবি পরিচয় বাঙ্গালী পাঠক সমাজে পূর্ণভাবেই করিয়া দিবে।"

'রক্তরাগ' কাব্যে মোট ২৮টি কবিতা স্থান লাভ করেছে। কবিতাগুলো মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে ধর্মীয় ভাবধারাসম্পন্ন কবিতা যেমন ঃ মরুর মহিমা, ঈদ উৎসব, মোস্তফা কামাল, বিজয় উল্লাস, স্বাধীন মিসর, হযরত মোহাম্মদ ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে প্রেমের কবিতা যেমনঃ প্রেমের জয়, পাশের বাড়ীর মেয়ে, প্রথম চিঠি ইত্যাদি। ফলে এ প্রথম কাব্যেই গোলাম মোস্তফার অনেকটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয়

ফুটে উঠেছে। ইসলামী চেতনা, স্বাজাত্যবোধ, প্রেম ও মানবতা গোলাম মোস্তফার সমগ্র সাহিত্যে মূলতঃ এ কয়টি ভাবধারাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। 'রক্তরাগ' সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি সমালোচক আব্দুল কাদির বলেন ঃ

"তাঁর 'রক্তরাগ' কাব্যখানি 'জাগরণ', 'প্রীতি' ও 'প্রেম' এই তিন ভাগে চিহ্নিত। 'জাগরণ' বিভাগে জাতীয় চেতনা পেয়েছে প্রধান সুর, 'প্রীতি' বিভাগে নিসর্গ-প্রীতি ও মানবতা হয়েছে সোচ্চার এবং 'প্রেম' বিভাগে 'চির সঙ্গিনী মহিয়ষী নারী নমস্কার' স্থান লাভ করেছে।

গোলাম মোস্তফার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হাস্নাহেনা' প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সনে (ইংরেজী ১৯২৭) এ গ্রন্থের কবিতাগুলো প্রধানতঃ গীতিধর্মী। এ গ্রন্থে ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন কবিতা নেই বললেই চলে, প্রেম ও সমসাময়িক জীবনচিত্র এ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর 'সওগাত' পত্রিকা এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ

"ইহা কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক।– 'রক্তরাগে' তাঁহার যে শক্তি 'ফুটেও ফুটে না' অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, 'হাস্নাহেনা'য় তা অনেকটা ফুটিয়াছে বলিয়া মনে হইল। কবি গোলাম মোস্তফার কাব্য সাধনা ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা আমরা আজ আনন্দ সহকারে ঘোষণা করিতেছি। প্রার্থনা করি কবির শক্তি দিন দিন পরিবর্ধিত হউক এবং তাহাতে দরিদ্র মুসলিম বঙ্গ সাহিত্য উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক।" (সওগাত, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩৪)।

গোলাম মোস্তফার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'খোশরোজ' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সনে। এ গ্রন্থে কবির ধর্মীয় চেতনার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ফাতেহা-ই দোয়াজদহম, শবে বরাত, কোরবানী, আল হেলাল, তরুণের অভিযান, তরুণের গান প্রভৃতি কবিতায় কবির এ ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। কবির অন্যান্য কাব্যেও ইসলাম, জাতীয় চেতনা, প্রেম ও মানবতাবাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষণীয়।

গোলাম মোস্তফার একমাত্র মহাকাব্য 'বনি আদম' প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সনে। ইংরেজ কবি মিল্টনের Paradise Lost and Paradise Regained-এর কাব্যাদর্শ, ভাব ও কাহিনীর অনুসরণে তিনি এ মহাকাব্য রচনার প্রয়াস পান। এতে হযরত আদমের (আ) বেহেশত থেকে বহিষ্কার ও পুনরায় সেখানে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কবি হিসাবে এতে তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি মূলতঃ রোমান্টিক। রোমান্টিক কবিদের পক্ষে ক্লাসিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মহাকাব্য রচনা করা সত্যিই দুরূহ, এক রকম দুঃসাধ্যই বলা চলে। তাছাড়া, আধুনিক যুগ-পরিবেশ মহাকাব্য রচনার উপযোগী নয় বলেই কলাবিদদের ধারণা। তা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে বনি আদম একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

অনুবাদক হিসাবে গোলাম মোস্তফা বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর অনুবাদ কাব্যের মধ্যে 'আল-কুরআন' মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের কতিপয় নির্বাচিত সূরা ও

আয়াতের অনুবাদ। বাকি সবই উর্দু কাব্য ও কবিতার অনুবাদ। তাঁর সূরা ফাতিহার অনুবাদ এত মনোমুগ্ধকর ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, পাকিস্তান আমলে এটি সকল বিদ্যালয়ে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসাবে ক্লাস শুরুর পূর্বে সমবেত কণ্ঠে গীত হতো। তাঁর উর্দু কাব্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মন্তব্য স্মরণীয় ঃ

"বাঙ্গালী হিসাবে একদিকে এ বাংলার জনগণ আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, ষড়ঋতু তাঁকে যেমন প্রভাবান্বিত করেছে–তাঁর পূর্ববর্তী মহাজ্ঞানী-মহাজনেরা যেমন তাঁর জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছেন তেমনি এ উপমহাদেশে তখনকার মুসলিম কবিদের মধ্যে শেখ আলতাফ হোসেন হালী, আল্লামা ইকবাল প্রমুখ কবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।... এতে স্পষ্টই বুঝা যায়, গোলাম মোস্তফা রবীন্দ্রনাথ থেকে ক্রমেই মুক্ত হয়ে ইসলামী রেনেসাঁর দ্বারা ক্রমেই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এ উপমহাদেশে মুসলিম রেনেসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আল্লামা ইকবালের প্রধান কাব্যগুলোর তিনি কেবল অনুসরণ করেননি অনুবাদও করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যসাধনার দ্বারা প্রমাণ করে গেছেন স্বদেশের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কবি ও সাহিত্যিকগণ এক সঙ্গে এ দু'টো ঐতিহ্যের গৌরবে অনুপ্রাণিত হতে পারেন।" (প্রাগুক্ত)

গান রচয়িতা হিসাবে গোলাম মোস্তফার জনপ্রিয়তা অসাধারণ। ইসলামী গান— হামদ্, নাত ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনায় তিনি যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেন। গোলাম মোস্তফা রচিত 'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি', 'বাদশাহ তুমি দীন ও দুনিয়ার', 'নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি' 'হে খোদা দয়াময় রহমানুর রহিম', 'আমার মোহাম্মদ রসূল", 'তুমি যে নূরের রবি নিখিলের ধ্যানের ছবি' প্রভৃতি হামদ্ ও নাত বাংলার ঘরে ঘরে সকলের মুখে মুখে এখনো প্রচলিত। এসব ইসলামী গানের জনপ্রিয়তা একমাত্র গানের সম্রাট নজরুল ইসলামের জনপ্রিয়তার সাথেই তুলনীয়। গোলাম মোস্তফা পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতের বাংলা অনুবাদক। পাকিস্তান আমলে এ গানটি ব্যাপকভাবে গাওয়া হতো। এছাড়া, গোলাম মোস্তফা আরো বিপুল সংখ্যক হামদ্, নাত, দেশাত্মবোধক ও প্রেমের গানের রচয়িতা হিসাবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সুরকার ও গায়ক হিসাবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁর নিজের বিশাল বৈঠকখানায় বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ছিল। ঘরোয়া পরিবেশে বিশেষতঃ সমঝদার অতিথি-অভ্যাগতদের আগমনে আবেগপ্রবণ কবি স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি ও গানের চর্চায় বিভোর হয়ে যেতেন। ১৯৬১ সনে আমি প্রথম যেদিন 'মোস্তফা মঞ্জিলে' তাঁর সাথে দেখা করতে যাই সেদিন আমিও এরূপ আবেগ-তাড়িত অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তাঁর অনবদ্য আবৃত্তি ও গানে বিস্মিত-বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। ঘরোয়া অনুষ্ঠান ছাড়া বাইরে জনসমক্ষেও তিনি মাঝে-মধ্যে গাইতেন এবং শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করে দিতেন। এরূপ একটি অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন বিশিষ্ট কবি-সমালোচক-গবেষক আব্দুস সাত্তার। 'কবি গোলাম মোস্তফা ও আমি' শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ

"সময়টা খুব সম্ভব ১৯৮৫ সাল। চট্টগ্রামে সাহিত্য সম্মেলনের তোড়জোড় চলছে। দর্শক শ্রোতা হিসেবে আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অগণিত জনসমুদ্রে আমরাও ছোট ঢেউ হিসেবে মিশে গিয়েছিলাম সেইখানে। বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা শুনলাম। আমাদের ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন সবাই। কিন্তু সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন কবি গোলাম মোস্তফা সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে এবং নিজেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে। চট্টগ্রামের স্থানীয় শ্রোতা দর্শকরা যারা কোনো দিন গোলাম মোস্তফা কিংবা সুরসম্রাট আব্বাস উদ্দীনকে দেখেননি, তারা কানাকানি শুরু করলেন, "উনিই কি গায়ক আব্বাস উদ্দিন? গোলাম মোস্তফা তো কবিতা লেখেন, তিনি তো কবি, গায়ক হলেন কবে থেকে?"

আজীবন শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকায় শিক্ষক হিসেবে তিনি যেমন কৃতবিদ আদর্শ শিক্ষক ছিলেন, পাঠ্য-পুস্তক রচয়িতা হিসাবেও তিনি তেমনি কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন। বিভাগ পূর্বকালে এক সময় সমগ্র বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে গোলাম মোস্তফার বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক সিরিজ স্কুলে পাঠ্য ছিল। পাকিস্তান আমলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুলসমূহে তাঁর বই পাঠ্য ছিল। পাঠ্যপুস্তক হিসেবে এগুলো যেমন সহজ পাঠ্য, শিক্ষণীয় আবার তেমনি শিশু-কিশোর মনস্তত্ত্বের বিকাশেও সহায়ক। পাঠ্যপুস্তক হিসেবে তাই এগুলোর জনপ্রিয়তাও ছিল অপরিসীম।

প্রবন্ধ রচয়িতা হিসেবে গোলাম মোস্তফার সাফল্য সন্দেহাতীত। কবি হিসেবে যদিও গোলাম মোস্তফা সমধিক পরিচিত তবে প্রবন্ধ-রচয়িতা হিসেবে তাঁর সাফল্য তুলনামূলকভাবে অধিক বলে অনেকের ধারণা। কবি হিসেবে তিনি নিঃসন্দেহে শিল্প সচেতন ও স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু সর্বদা তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারেননি। বিশেষতঃ শব্দ ব্যবহার ও শিল্প রীতির ক্ষেত্রে তিনি প্রথাগত গতানুগতিকতার উর্দ্ধে উঠতে পারেননি। তাঁর যেটুকু স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা তা শুধু তাঁর কবিতার ভাব, বক্তব্য, ঐতিহ্যানুসারিতা ও আবেদনের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করে নজরুল যেমন সর্বক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, গোলাম মোস্তফা হয়তো তা পারেননি। এমনকি, জসীমউদ্দিন ও তিরিশোত্তর যুগের কতিপয় কবি যেমন গতানুগতিক প্রথার বাইরে স্বতন্ত্র কবি-ভাবনা ও কাব্য-রীতির সাধনা করেছেন, গোলাম মোস্তফার মধ্যে তেমন কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি রবীন্দ্র-প্রভাব বলয়ের বাইরে এসে স্বকীয়তার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও দেখা গেল, তিনি অতি সহজ-স্বচ্ছন্দে খানিকটা নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। তাই দেখা যায়, স্বতন্ত্র কবি-কর্মের ক্ষেত্রে নয়; প্রথাগত কবিতা-চর্চায়ই তিনি সর্বদা ব্যাপৃত থেকেছেন। অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়; এসব ব্যতিক্রমী কবি-কর্মই গোলাম মোস্তফাকে অমরত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এ কারণেই তিনি হয়তো কোন 'যুগ-স্রষ্টা কবি' না হতে পারেন কিন্তু রবীন্দ্র-নজরুল যুগে একজন উল্লেখযোগ্য প্রধান কবি হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে গোলাম মোস্তফার কৃতিত্ব অসাধারণ। প্রবন্ধ রচনার জন্য যে সূক্ষ্ম মনন, বিচার-বিশ্লেষণ করার মত প্রখর বুদ্ধিদীপ্ততা, গভীর জ্ঞান, অধ্যবসায় ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন গোলাম মোস্তফার মধ্যে তার অভাব ছিল না। তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। কবিরা সাধারণতঃ স্বপ্ন-কল্পনার অতীন্দ্রিয় জগতের অধিবাসী হয়ে থাকেন। প্রকৃতি, প্রেম, সৌন্দর্যানুভূতি ও মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁদের হৃদয়কে সর্বদা চঞ্চলিত করে। কবি হিসাবে গোলাম মোস্তফার মধ্যে এগুলোর উপস্থিতি অবশ্যই লক্ষ্যযোগ্য। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্য আর এক স্বতন্ত্র শিল্পী সত্তার প্রচণ্ড উপস্থিতিকে অনিবার্য করে তোলে। সেখানে তাঁর গভীর সমাজ-সচেতনতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, ইতিহাস-জ্ঞান, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অপরিসীম অধ্যবসায় সকলকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর কবিত্বময় স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাষা। প্রাবন্ধিকের তত্ত্ব, তথ্য, যুক্তি ও বিশ্লেষণধর্মিতার সাথে কবিত্বময় ছান্দিক ভাষা লেখকের বক্তব্যকে শুধু পাঠকের সচেতন বিচার-বুদ্ধির কাছে নয়; হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির গোপন তন্ত্রীতে পর্যন্ত সাড়া জাগায়। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক-গবেষক শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ তাঁর 'প্রবন্ধ লেখক গোলাম মোস্তফা' শীর্ষক প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন ঃ

"তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তুই প্রমাণ করে তিনি তাঁর সমাজ-চিন্তায় অনুগত ছিলেন এবং সমাজের বিচিত্র বিষয় যে তাঁকে চিন্তান্বিত করতো এবং সে সমস্যার সমাধান কী তা নিয়ে যে তিনি ভাবিত হতেন তাঁর লেখার বিষয়-বৈচিত্র্য তা প্রমাণ করে। ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প ছাড়াও তাঁর প্রবন্ধের বিষয় সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন। তাঁর লেখায় প্রকাশিত তাঁর হৃদয়-ব্যাকুলতা এনে দেয় একটি কল্যাণধর্মী সমাজ নির্মাণে তাঁর ইচ্ছা কতটা প্রচেষ্টাধর্মী। সুনির্দিষ্ট আদর্শের অনুসরণের জন্য অনেকের সঙ্গে তিনি ঐকমত্যে আবদ্ধ হতে পারতেন; কিন্তু সে জন্য যুগধর্মের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতেও তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর বিশ্বাসের অনুকূলে যুক্তি দাঁড় করিয়ে প্রাচীর দৃঢ়তায় তাকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। এই যুক্তির প্রাচীর তৈরীতে উপাদান অন্বেষণে তিনি যে পরিশ্রম করেছেন তাঁর প্রতিটি পংক্তি এর স্বাক্ষর বহন করছে। আর এজন্যে রুশো, টলস্টয়, শেক্সপীয়ার, মিল্টন থেকে মুসলিম-বৌদ্ধ-ইহুদী ও হিন্দু কোন শাস্ত্র পাঠেই যেমন তিনি অনীহা প্রকাশ করেননি তেমনি দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি পাঠেও অনজ্ঞতাকে অনায়াসে মাড়িয়ে যেতে তিনি ছিলেন কুণ্ঠামুক্ত।"

এ প্রসঙ্গে কবির সমকালীন বিশিষ্ট গদ্য-লেখক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র মন্তব্য স্মরণীয় ঃ

"কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন মনে-প্রাণে মুসলিম কবি। এদিক দিয়ে তাঁকে তাঁর অগ্রসূরী সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর ভাবশিষ্য বলা যেতে পারে। শিরাজী সাহেব আজীবন ওজস্বিনী বক্তৃতা, উদ্দীপনাময়ী কবিতা এবং তেজগর্ভ উপন্যাস ও প্রবন্ধমালার

দ্বারা অবহেলিত ও অবসাদগ্রস্ত মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং প্রবলতর ও চোখ-ঝলসানো হিন্দু কৃষ্টির আওতা হতে মুক্ত করে নিজ পায়ে দাঁড় করাতে চেষ্টা করে গিয়েছেন। গোলাম মোস্তফার জীবনের লক্ষ্য ছিল পারিপার্শ্বিক অনগ্রসর মুসলিম সমাজের ভিতর প্রাণ সঞ্চার করা, শুধু প্রাণ নয়, ইসলামী প্রাণ সঞ্চার করা। এদিক দিয়ে কালানুসারে তিনি তাঁর সমধর্মী কবি নজরুল ইসলামের অগ্রবর্তী বলে তাঁর মনে গর্ব ছিল।" (মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৯)

বিশ্বনবী (১৯৪২), ইসলাম, বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য, ইসলাম ও কমিউনিজম, ইসলামে জেহাদ, মরু দুলাল (বিশ্বনবীর কিশোর সংস্করণ), হজরত আবু বকর ইত্যাদি ক্ষুদ্র-বৃহৎ আকারের কতিপয় গ্রন্থ ছাড়াও ১৯৬২ সনে তাঁর জীবৎকালে ৩৭টি প্রবন্ধের সংকলন 'আমার চিন্তাধারা' ও তাঁর ইন্তিকালের পর ১৯৬৮-এর জুনে সৈয়দ আলী আহসানের ভূমিকা সংবলিত ও তাঁর স্ত্রী মাহফুজা খাতুন সম্পাদিত ২৮টি প্রবন্ধের সংকলন 'গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন' প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত দুটি গ্রন্থ তাঁর শেষ জীবনের অবদান হিসাবে এগুলোতে তাঁর চিন্তা, মনন ও অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ রূপ বিধৃত। চল্লিশের দশকে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের সর্বত্র যখন কমিউনিজমের প্রচার-প্রসার কিছুটা দানা বেঁধে ওঠে গোলাম মোস্তফা তখন 'ইসলাম ও কমিউনিজম' বই লিখে কমিউনিজমের অন্তঃসারশূন্যতা যুক্তিসহ সপ্রমাণ করেন এবং ইসলামের স্রষ্টা-প্রদত্ত শাশ্বত কল্যাণকর আদর্শের সামনে তা মুক্তো খণ্ডের নিকট চোখ-ঝলসানো কাচের সমতুল্য বলে উল্লেখ করেন। এভাবে ইসলাম, স্বজাতি, স্বদেশ, স্বীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনই তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

গোলাম মোস্তফার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো তাঁর রচিত 'বিশ্বনবী'। এ ব্যাপারে সাহিত্য-সমালোচকরা সকলে একমত। সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই এ গ্রন্থটি একটি অসাধারণ পাঠকপ্রিয় গ্রন্থ। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' এবং মোহাম্মদ নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' উপন্যাসের সাথেই এর তুলনা চলে। ১৯৪২ সনের অক্টোবরে এ বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর ১৯৪৬ সনের এপ্রিলে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কবির জীবনকালে ১৯৬৩ সনের জুলাই মাসে এর অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক সংস্করণেই লেখক কিছু কিছু পরিমার্জনা ও সংযোজন করেছেন। ফলে প্রথম সংস্করণের প্রায় পাঁচ শো পৃষ্ঠার এ বইটি অষ্টম সংস্করণে গিয়ে ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দাঁড়িয়েছে। এটা কোন গতানুগতিক জীবনী গ্রন্থ নয়; লেখকের প্রগাঢ় নিষ্ঠা, গভীর ভক্তি-ভাব, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ইতিহাস-চেতনা সর্বোপরি কবিত্বময় সাবলীল ভাষা গ্রন্থটিকে যেমন অনবদ্য করে তুলেছে তেমনি করেছে একে সর্বশ্রেণীর নিকট গ্রহণযোগ্য। এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন ঃ

"হজরতের জীবনী সংক্রান্ত আরবী-উর্দু-ইংরেজী-বাংলা বহু গ্রন্থ দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে; কিন্তু সেগুলির মধ্যে একটা বিষয়ের অভাব লক্ষ্য করিয়া নিরাশ হইয়াছি।

অনুভূতির আবেদন (Emotional appeal) খুব কম গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়। ফলে অধিকাংশ লেখাই হজরতের জীবনীর সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করিতে পারে নাই। মহাপুরুষের জীবন শুধু ঘটনার ফিরিস্তি নহে; শুধু যুক্তি-তর্কের শয্যাও নহে; সে একটা ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও অনুভবের বস্তু; তাহাকে বুঝিতে হইলে একদিকে যেমন চাই সত্যের আলোক ও বিজ্ঞানের বিচারবুদ্ধি, অপরদিকে ঠিক তেমনি চাই ভক্তের দরদ, কবির সৌন্দর্যানুভূতি, দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টি, আর চাই প্রেমিকের প্রেম। আশেকে রসূল না হইলে সত্যিকার রসূলকে দেখা যায় না।"

পরবর্তী সকল সংস্করণে লেখক কিছু কিছু পরিমার্জনা ও সংযোজন করেছেন তার প্রমাণ গ্রন্থটির উত্তরোত্তর কলেবর বৃদ্ধি। গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকেও এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক সেখানে বলেছেন ঃ

"বিশ্বনবীর আগমনের আগাগোড়া এবার দেখিয়া দিয়াছি। বহু স্থানে ফুটনোট দিয়া অথবা কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া আমার ধারণাগুলোকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 'হজরতের বহু বিবাহের তাৎপর্য' স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'থিওসফি ও মিরাজ', 'ইসলাম কি?' এবং 'হজরত মোহাম্মদ কে?' এই তিনটি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে।"

কিন্তু লেখক এতেই পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেননি, তিনি আরো বলেছেন ঃ

"এ অনেকটা চূড়ান্ত নয়– নির্দেশনা। আরও এমন কথা আছে– যাহা এখনও বলা হয় নাই– যাহা এখনও এই অধম লেখকের মনে। চিন্তা ও দৃষ্টি-সীমার বাহিরে পড়িয়া আছে।"

'বিশ্বনবী' সাধারণ পাঠকের জন্য নয়; এটা শিক্ষিত বিদগ্ধ পাঠকের উপযোগী। এটা সাধারণ কোন জীবনীগ্রন্থও নয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের জীবনী, রিসালত, কারামত, অন্য সকল মহাপুরুষের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করার জন্য তিনি এ অমর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ সম্পর্কে এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন ঃ

"এই আলোকের যুগে ইসলাম ও হজরত মোহাম্মদকে উন্নতভাবে বুঝিবার সময় আসিয়াছে। 'বিশ্বনবী'তে আছে সেই প্রয়াস। আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান থাকা তাই পাঠক-পাঠিকার জন্য অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। জড়বাদ, অদ্বৈতবাদ, ডায়ালেকটিকস (dialectics) ইত্যাদি কাহাকে বলে, স্থান-কাল-পাত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের মত কি, বৈজ্ঞানিকদের লক্ষ্য এখন কোন দিকে– এসব বিষয়ে পাঠক-পাঠিকার সজাগ হইতে হইবে। মননশীলতার উৎকর্ষ না হইলে জাতীয় জীবন শক্তিশালী হয় না।"

'বিশ্বনবী' প্রণয়নে লেখক যে কী ধরনের পরিশ্রম ও অসাধারণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন এর অষ্টম সংস্করণের শেষে প্রদত্ত এ গ্রন্থ রচনায় সহায়ক গ্রন্থসমূহের তালিকা থেকে তা সুস্পষ্ট। এ তালিকায় বিশ্ববিখ্যাত মোট ৬২টি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হয়েছে। এতে রয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, আল-হাদীস, আরবী-উর্দু-ইংরেজী-বাংলা ভাষায় রচিত বহু খ্যাতনামা সীরাত গ্রন্থ। এমনকি, বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের রচিত গ্রন্থও তিনি অধ্যয়ন করেছেন। এ ধরনের মাত্র কয়েকটি বইয়ের নাম নীচে উল্লিখিত হলো। এ থেকেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

আর জীন জীন্‌স ঃ The Mystrious Universe, The Universe Around Us, স্যার জেম্‌স জীন্‌স ঃ The New Background of Science, The Growth of Physical Science, জে. ডব্লিউ.এন. সার্লিভ্যান ঃ Bases of Modern Science, Limitations of Science, আর্থার এডিংটন ঃ The Expanding Universe, The Nature of the Physical World, এ.এন. হোয়াইটহেড ঃ Science and the Modern World, আলবার্ট আইনস্টাইন ঃ The Theory of Relativity, বার্ট্রান্ড রাসেল ঃ The A.B.C. of Relativity, ই. স্নোসোন ঃ Easy Lessons in Einstein, আইভর এল. টাকেট ঃ Evidence for the Supernatural, জর্জ গ্যামোঃ One, Two, Three... Infinity, বার্নরেড-ব্যানেট-রাইচ ঃ New Handbook of the Heavens, আর্থার সি. ক্লার্ক ঃ The Exploration of Space, হ্যারোল্ড লেল্যান্ড গুড-উইন ঃ Space Travel, জে.এন. লিওন্যার্ড ঃ Flight into Space, ভন ব্রাউন এন্ড হুমিপ্পল ঃ Man on the Moon ইত্যাদি। এছাড়া, খ্রীস্টান ধর্ম, জোরাথ্রুস্ট, হিন্দু প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ এবং এসব ধর্মের উপর লিখিত বহু গ্রন্থ তিনি এজন্য পাঠ করেন। এ থেকে তাঁর কঠোর পরিশ্রম, সীমাহীন অধ্যবসায় ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। ফলে 'বিশ্বনবী' সর্বদিক দিয়েই হয়েছে এক অসাধারণ কালজয়ী মহৎ গ্রন্থ।

'বিশ্বনবী' প্রকাশের পর বহু ভাষাবিদ সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন ঃ

"মৌলভী গোলাম মোস্তফা কবিরূপে সুপরিচিত। তাঁর নব অবদান 'বিশ্বনবী'। বলাবাহুল্য, ইহা বিশ্বনবী হজরত মুহম্মদের (সঃ) একটি সুচিন্তিত প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী জীবন চরিত্র। এই গ্রন্থকার আঁহজরত সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘকালের গভীর চিন্তা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিচয় দিয়েছেন। আমরা এই পুস্তকখানিতে গোলাম মোস্তফা সাহেবকে একজন মোস্তফা-ভক্ত দার্শনিক ও ভাবুকরূপে পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। ভাষা, তথ্য ও দার্শনিকতার দিক হইতে গ্রন্থখানি অতুলনীয় হইয়াছে।"

'বিশ্বনবী' সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্যিক মনোজ বসু বলেন ঃ

"আপনার 'বিশ্বনবী' পড়লাম। অপূর্ব! জাতির একটা বড় কাজ করলেন আপনি। আমি ও আমার মত আরও অনেকে ধর্মে মুসলমান না হয়েও হজরতের একান্ত আপনার

বলে অনুভব করতে পারলাম। মহানবীর কাছে পৌঁছবার আপনার এ সেতু-রচনা আপনার অতুলনীয় সাহিত্য রীতি। ভাষা, কবিত্ব-ঝংকার ও ভাব-লালিত্যে অপরূপ মহিমা লাভ করেছে।"

অধ্যাপক আব্দুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসান-এর যৌথভাবে প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-এ বলা হয়েছে ঃ "গোলাম মোস্তফার' বিশ্বনবী' (১৯৪২) হজরত মোহম্মদের (সা) জীবনী এবং ইসলাম ধর্মের প্রচার ও বিস্তৃতি সম্পর্কে এ শতাব্দীতে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বইটি অত্যন্ত সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য। গোলাম মোস্তফা কবি 'বিশ্বনবী'তে তাঁর কবি মনের প্রকাশ সুস্পষ্ট এবং রচনাও আবেগপ্রণোদিত। 'বিশ্বনবী' গোলাম মোস্তফার সাহিত্যিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।"

'বিশ্বনবী'র নবম সংস্করণের ভূমিকা (প্রসঙ্গ-কথা) লিখতে গিয়ে বিশিষ্ট কবি-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান ১লা জানুয়ারী, ১৯৬৭ সনে লেখেন ঃ

"বাংলা সীরৎ গ্রন্থগুলির মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী' যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে অন্য কোনটির ভাগ্যে তা হয়নি। এর ভাব যেমন উচ্চস্তরের, ভাষাও তেমনি প্রাঞ্জল, গতিশীল ও ওজস্বিনী। গোলাম মোস্তফা সাহেব একাধারে সুনিপুণ বাক্‌শিল্পী, কবি ও ভক্ত। তাই তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ভক্তির ভাবোচ্ছ্বাস ও কাব্যের লালিত্য গ্রন্থটিকে সুষমামণ্ডিত করেছে। তাঁর ভাব ও ভাষায় ভক্তিপ্রবণ বাঙালি অন্তরের মর্মকথাই কাব্যের ললিত রচনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ভক্ত প্রেমিকের মধুঢালা রচনা-বিন্যাস বইটিকে অসাধারণ জনপ্রিয়তার অধিকারী করেছে।"

'বিশ্বনবী'র অষ্টম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন ঃ "বিশ্বনবীর উর্দু অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন মুদ্রণ ও প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। ভারতীয় মুসলমানদের আগ্রহের ফলে বিশ্বনবীর একটি ভারতীয় সংস্করণ ও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

'বিশ্বনবী'র দশম সংস্করণের ভূমিকায় ২৭ আগস্ট, ১৯৬৮ তারিখে সৈয়দ আলী আহসান আবার লেখেন ঃ "কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' একটি আশ্চর্যরূপ সফল গ্রন্থ। হৃদয়ের আবেগ বিশ্বাস শব্দে যেভাবে সমর্পিত হয়েছে, আন্তরিক অনুভূতি বর্ণনায় যেভাবে উচ্চকিত হয়েছে এবং চিত্তের উপলব্ধিজনিত আনন্দ ভাষার আবহে যেভাবে জাগ্রত হয়েছে তার তুলনা আমাদের গদ্য সাহিত্যে সত্যিই বিরল। যদিও কখনও কখনও কবি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিষ্ঠায় যুক্তির সমর্থন খুঁজেছেন কিন্তু সে সমস্ত যুক্তি উচ্ছ্বাসে সচকিত এবং বিশ্বাসের অবিছল নিষ্ঠায় প্রবহমান।"

'বিশ্বনবী' গোলাম মোস্তফার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এ এক অসাধারণ অমর কীর্তি, সমালোচকেরা এ ব্যাপারে সকলে একমত। গোলাম মোস্তফা অন্য কিছু না লিখে শুধু 'বিশ্বনবী' লিখলেও বাংলা সাহিত্যে চির অমর ও স্মরণীয় হয়ে

থাকতেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই বলে কবি হিসাবেও তাঁকে একেবারে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ফররুখের মত যুগ-প্রবর্তক কবি না হলেও সমকালের তিনি এক বিশিষ্ট কবিকণ্ঠ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সব কিছু মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যে গোলাম মোস্তফার অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, এটা আমাদের সর্বদা স্মরণে রাখা কর্তব্য। সবশেষে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করে আলোচনা শেষ করছি ঃ

"রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ হিন্দু কবি-সাহিত্যিকেরা গোলাম মোস্তফাকেই আধুনিক কবি রূপে প্রথম স্বীকৃতি দেন। ইহার পরে শাহাদাত হোসেন, নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দীন প্রমুখ কবি আত্মপ্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ভাব-ধারার রূপায়ণই তাঁহার সাহিত্য সাধনার প্রধান লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ হিন্দু মনীষীর আওতায় পড়িয়াও তিনি তাঁহার স্বকীয়তাকে বিসর্জন দেন নাই। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে নজরুল ইসলামের দ্বারা তিনি অনেকাংশে প্রভাবিত হইলেও তাঁহার মৌলিকত্ব বা স্বকীয়তা তিনি হারান নাই।"

সন্দেহ নেই, এখানে 'স্বকীয়তা' বলতে গোলাম মোস্তফার ভাব, বিষয় ও জীবন-দৃষ্টির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আবুল মনসুর আহমদের ভাষা-চিন্তা

ভাষা মনের ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম বাহন। ভাষা শুধু মনের ভাব প্রকাশেরই বাহন নয়; সাহিত্য, সংস্কৃতি জাতি ও রাষ্ট্রীয় পরিচয়েরও মাধ্যম হিসাব দেখা দেয় অনেক সময়। তাই ভাষার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ও বহুমাত্রিকতা লাভ করছে।

আদিতে মানুষের ভাষা ছিল একটাই। আদম-সন্তানের বংশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আদিম ভাষাও নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, বংশ-গোত্র-অঞ্চলভেদে ভাষারও রূপ-বৈচিত্র্য ঘটে এবং সেই সাথে বিভিন্ন সংস্কৃতিরও জন্ম হয়। মনের ভাব প্রকাশের আকুতি যখন শুধু কথ্য-রূপে সীমাবদ্ধ না থেকে লেখ্য-রূপ লাভ করে তখন সৃষ্টি হয় সাহিত্য। অতএব, ভাষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বাহন হিসেবে মানব-সভ্যতার অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে। সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় পরিচয় গড়ে উঠেছে। জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় পরিচয় নির্ধারণেও ভাষা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই আধুনিক বিশ্বে ভাষার বহুমাত্রিক গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

চলমান বা প্রবহমান জলধারাকেই যেমন নদী বলা হয়, ভাষার ধর্মও তেমনি গতিময়তা বা প্রবহমানতা। নদী যেমন বাঁকে বাঁকে গতি-পথ বদলায়, ভাষারও তেমনি বংশ-গোত্র-অঞ্চল ও কালভেদে রূপ বিভিন্নতা ঘটে। এটাই ঐতিহাসিক বাস্তবতা। বাংলাদেশের আদি ভাষা বাংলা ছিল না। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আদি ভাষা বর্তমান বাংলা ভাষার রূপ পরিগ্রহ করেছে। আদিতে বাংলা ভাষার যে রূপ ছিল; নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটাই ভাষার ধর্ম। এ প্রবহমানতা বা পরিবর্তনশীলতাই ভাষার বাস্তবতা। এক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তি খাটে না। ইংরেজ আমলে আমরা এর দৃষ্টান্ত লাভ করেছি। ১৮০০ ঈসায়ীতে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিত ও খ্রীস্টান পাদ্রীগণ সংস্কৃত শব্দবহুল

কৃত্রিম বাংলা ভাষা প্রচলনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অত্যল্পকাল পরেই এমন কি, গোড়া ব্রাহ্মণ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত সে ভাষাকে অস্বীকার করে বাংলা ভাষাকে অনেকটা জনগণের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসেন। তবে সে ভাষাও ছিল পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষের স্টান্ডার্ডাইজড্ রূপ। পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত বাংলা ভাষার সাথে তার পার্থক্য ছিল অনেক।

ইংরেজ আমলে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচলিত ভাষার যে স্টান্ডার্ডাইজড্ রূপ গড়ে ওঠে, কালক্রমে সেটাই সাহিত্যের ভাষা হিসেবে গৃহীত হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান সকলেই গোটা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সে ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করেন। বিংশ শতাব্দীতে এ ধারায় কিছু পরিবর্তন আসতে শুরু করে। প্রখ্যাত 'আনোয়ারা' উপন্যাস রচয়িতা মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের হাতেই এ পরিবর্তনের সূচনা এবং কাজী নজরুল ইসলামের হাতে তার পূর্ণাঙ্গ প্রবল প্রকাশ। নজরুল মুসলিম বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে আধুনিক অবয়বে সরাসরি তুলে ধরলেন তাঁর সাহিত্যে। একথা সর্বজনবিদিত যে, মুসলিম শাসনামলে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই বাংলা ভাষার নবজন্ম ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। আরবী-ফারসী-উর্দু ভাষার অসংখ্য শব্দ বাংলা ভাষায় আত্মীকরণের ফলে বাংলা ভাষা তখন সুসমৃদ্ধ ও নানা ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়ে ওঠে। মুসলিম শাসনামলে গড়ে ওঠা বাংলা ভাষার এ ঐতিহ্যের ভাগীদার ছিল তখন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই। ইংরেজ আমলে ফোর্ট উইলিমীয় ষড়যন্ত্রের ফলে এ মুসলিম বাংলা ভাষার ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হয়। এর প্রায় দেড়শো বছর পর নজরুল তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বলে মুসলিম বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে অত্যন্ত সফলতার সাথে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে এনে বলিষ্ঠভাবে দাঁড় করালেন। পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে মুসলমানরা তাদের এ স্বতন্ত্র ভাষার ঐতিহ্য সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। এ ভাষা-সচেতনতা যাঁদের মধ্যে প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায় আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। কাব্যক্ষেত্রে এ সচেতনতার উজ্জ্বল ও সার্থক পথিকৃৎ ছিলেন ফররুখ আহমদ।

পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে বিশেষত ১৯৪০ ঈসায়ীতে 'লাহোর প্রস্তাব' গ্রহণের পর কলকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' গঠনের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে এ ভাষা-সচেতনতা সংগঠিত রূপ লাভ করে। ১৯৪৪ সনের ৫ই মে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ মিলনায়তনে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রথম সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে আবুল মনসুর আহমদ বলেন ঃ

"বস্তুত বাঙলার মুসলমানের যেমন একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তেমনি তাদের একটা নিজস্ব সাহিত্যও আছে। সে সাহিত্যের নাম মুসলমানী বাঙলা সাহিত্য বা পুঁথি সাহিত্য।... পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক রেনেসাঁ আসবে এই পুঁথি সাহিত্যের বুনিয়াদে। আমরা আবার পুঁথি সাহিত্যে ফিরে যাব সে কথা বলছি না। আমার মতলব এই যে, বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের প্রাণ হবে মুসলমানের প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও

হবে মুসলমানেরই মুখের ভাষা। এই দুই দিকেই আমরা পুঁথি সাহিত্য থেকে প্রচুর প্রেরণা ও উপাদান পাব।... আজকার তথাকথিত জাতীয় সাহিত্যে বাংলার মেজরিটি মুসলমানের জীবনই যে শুধু বাদ পড়েছে তা নয়, তার মুখের ভাষাও সে সাহিত্যে অপাংক্তেয় রয়েছে। মুসলমানের আল্লা-খোদা, রোযা-নামায, হজ্জ-যাকাত, ইবাদাৎ-বন্দেগি, অযু-গোসল, খানাপিনা সমস্তই বাঙলা সাহিত্যের দিকপাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের কাছে বিদেশী ভাষা। এ যুলুমবাজির মধ্যে কোনো জাতির সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য রচিত হবে পূর্ব পাকিস্তানীদের মুখের ভাষায়।"

১৯৪৪ সনে পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে আবুল মনসুর আহমদ যে কথা বলেছিলেন তা ছিল তৎকালীন বাঙালী মুসলমানের সত্যিকার প্রাণের কথা। পাকিস্তান তথা ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মূলেও মুসলমানদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা অন্যতম প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। আবুল মনসুর আহমদ যখন উপরোক্ত প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন, তখন যথারীতি নজরুলের হাতে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের রূপরেখা তৈরি হয়ে গেছে। সে বলিষ্ঠ রূপরেখার আদলে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে 'পল্লী কবি' জসীম উদ্দীন, মুসলিম রেনেসাঁর অন্যতম প্রাণ-পুরুষ ফররুখ আহমদ, শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, বেনজীর আহমদ, তালিম হোসেন, মঈনুদ্দীন, আহসান হাবীব, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ আমাদের নিজস্ব ভাষা-সাহিত্যের ঐতিহ্য পুনুরুদ্ধার ও নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এ নতুন প্রাণাবেগ পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও কিছুকাল অব্যাহত ছিল।

আবুল মনসুর আহমদ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে এ ধারণায় উপনীত হন যে, মুসলিম শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ বঙ্গ, পুন্ড্র ও বঙ্গাল এ তিনটি জনপদে বিভক্ত ছিল। ভাষা-সাহিত্যের দিক দিয়ে এ তিনটি জনপদ আবার দুটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল— বর্তমান বাংলাদেশ মানে তৎকালীন পুন্ড্র-বংগাল ছিল বঙ্গ এলাকা এবং অন্যটি ছিল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ মানে তৎকালীন বঙ্গ ছিল অবঙ্গ বা অঙ্গ এলাকা। গুপ্ত ও পাল শাসনামলে উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ ছিল বিশুদ্ধ সংস্কৃতের আওতাভুক্ত। পক্ষান্তরে, পুন্ড্র-বঙ্গাল বৌদ্ধ-সংস্কৃতির আওতাভুক্ত ছিল। বৌদ্ধ-সংস্কৃত ছিল মাগধী-প্রাকৃত দেশজ ভাষাসমূহের সংমিশ্রণে সৃষ্ট চলতি ভাষা। পরবর্তীতে এ ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটে। এভাবে গোটা বাংলা তৎকালে দুটি স্বতন্ত্র ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়।

মুসলিম শাসনামলে রাজনৈতিকভাবে এক অবিভক্ত বাংলাদেশ গঠনের প্রয়াস চলে। ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও জনগণের মুখের ভাষাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এ মুখের ভাষার সাথে সমসাময়িক যুগের বাস্তবতা ও অনিবার্য তাগিদে আরবী-ফারসী-উর্দু-তুর্কী ভাষার অসংখ্য শব্দ প্রবিষ্ট হয়ে বাংলা ভাষাকে সুসমৃদ্ধ ও বিশ্বমানে উন্নীত করে। কিন্তু ইংরেজ আমলে কলকাতা রাজধানী হবার সুবাদে বঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতেরা

ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের ভাষার রূপ বদলের প্রয়াস পায় এবং পুনরায় সংস্কৃত ভাষা চালু করার চেষ্টা চলে। তবে এবারে সরাসরি সংস্কৃত ভাষা নয়; চতুরতার সাথে বাংলার পিঠে সংস্কৃতকে সওয়ার করানো হয়। তবে সে প্রয়াস যে সম্পূর্ণ সার্থক হয়নি, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কলকাতায় যখন এভাবে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতায়নের চেষ্টা চলছিল পুন্ড্র-বঙ্গাল তথা বর্তমান বাংলাদেশে কিন্তু তখনও জনগণের মুখে মুখে সনাতন বাংলা ভাষাই যথারীতি চালু ছিল। ফলে পুন্ড্র-বঙ্গাল, বিশেষত এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের ভাষা কলাকাতা-কেন্দ্রিক ভাষা থেকে ছিল স্বতন্ত্র। সে সাথে উভয় অঞ্চলের সংস্কৃতি, জীবনাচার ও আরো অনেক কিছুই ছিল স্বতন্ত্র। এ স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর মাত্র দু' বছর পূর্বে ১৯৩৯ সনে তাঁর 'ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"বাংলা একটা নয়, দুইটা। বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ়-বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয় অন্তরেরও ভাগ। সমাজেরও মিল নাই। এতকাল যে আমাদের বাঙালী বলা হয়েছে, তার সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলা বলে থাকি।"

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আট বছর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছেন। আজ যারা শুধু ভাষার ভিত্তিতে নিজেদেরকে বাঙালী বলে দাবি করেন, তাদের দাবি যে কত অসার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ যে ভাষার ঐক্যের কথা বলে গিয়েছেন সেটাও যে পূর্ণ সত্য নয়, আবুল মনসুর আহমদসহ অনেকেই তা যথাযথভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই নজরুল আমাদের জাতীয় ভাষায় আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিৎ নির্মাণ করে গেছেন। জসীমউদ্দীন, শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, ইব্রাহীম খাঁ, বেনজীর আহমদ, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, মোফাখ খারুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আব্দুস সাত্তার প্রমুখ সে ভিৎ-এর উপর সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। এখন চাই সে পথ ধরে নবীনেরা এগিয়ে চলবেন আত্মবিশ্বাস ও প্রতাপের সাথে। অতএব, রবীন্দ্রনাথের এ ভাষার ঐক্যের দাবি অর্ধসত্য, পূর্ণ সত্য নয়।

বিভাগ-পূর্বকাল থেকেই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজিবুর রহমান খাঁ প্রমুখ সে কথা বলে আসছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আবুল মনসুর আহমদ তাঁর এ স্বতন্ত্র ভাষার দাবিকে অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন ঃ

"আমাদের নিজস্ব কালচার বিকাশের ও নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির জন্য চাই আমাদের নিজস্ব ভাষা। আমাদের নিজস্ব ভাষা বাংলা, একথা আজ যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট নয় দুই কারণে। এক কারণ ঐতিহাসিক। অপর কারণ রাজনৈতিক।

"ঐতিহাসিক কারণ বাংলা ভাষার ইতিহাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলা ভাষার স্রষ্টা ও বাংলা সাহিত্যের পিতা আসলে বাংলার নবাব-বাদশারাই। সে হিসেবে বাংলা মুসলমানদের নিজস্ব ভাষা। কিন্তু প্রায় দুইশ' বছরের ইংরেজ শাসনে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে।... উনিশ শতকের গোড়া হইতে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা, ছিল পন্ডিতী ভাষা। উনিশ শতকের শেষ দিক হইতে টেকচাঁদ ঠাকুর, দ্বিজেন ঠাকুর ও রবিঠাকুরের শক্তিশালী কলমের জোরে ভদ্রলোকের পন্ডিতী বাংলা জনগণের ভাষায় রূপান্তরিত হইবার চেষ্টা করে। এমন কি, স্বয়ং, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতেও এ চেষ্টা প্রতিফলিত হয়।... দ্বিজেন ঠাকুর, রবিঠাকুর ও শরৎচন্দ্রের চেষ্টায় বাংলা ভাষা বড় জোর পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাষা হইতে পারিয়াছিল। প্রকৃত জনগণের ভাষা হইতে পারে নাই। কারণ বাংলার আসল জনগণ যে মুসলমানরাও এবং তাদের ভাষাও যে জনগণের ভাষা, এ সত্য হয়ত ঐ মনীষীদের নিকট ধরাই পড়ে নাই।

"তারপর নজরুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ প্রতিভা নিয়া ধূমকেতুর মত বাংলা সাহিত্য ও ভাষার আকাশে উদিত হন এবং মুসলিম বাংলার ভাষাকে বাংলা সাহিত্যের ভাষা করিবার সফল চেষ্টা করেন। নজরুলের এই চেষ্টার যে বিরুদ্ধতা আসে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতে, তাতে শুধু সাম্প্রদায়িক তিক্ততাই বাড়ে না, হিন্দু-বাংলা ও মুসলিম-বাংলার কালচারের পার্থক্যও তাতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।...

"রাজনৈতিক কারণ একেবারে আধুনিক। আজ বাংলা ভাগ হইয়াছে। এক বাংলা দুইটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপ নিয়াছে। এতে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার কি পরিবর্তন হইয়াছে, এইটাই আমাদের ভাল করিয়া বিচার করিতে হইবে।... (এক) বাংলা ভাগ হওয়ার আগেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিম-বাংলার ভাষা ও হিন্দু-বাংলার ভাষায় একটা পার্থক্য ছিল।... (দুই) বাটোয়ারার আগে বাংলার রাজধানী সুতরাং সাহিত্যিক কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। এখন সে জায়গা দখল করিয়াছে ঢাকা।" (১৯৫৮ সনের ৩রা মে চাটগাঁয় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাক সাহিত্য-সম্মিলনীর কালচার ও ভাষা শাখার সভাপতির ভাষণ)।

উপরোক্ত ভাষণে আবুল মনসুর আহমদ আমাদের ভাষা কী, কীভাবে তা গঠিত হবে, কী তার রূপ— এসব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর এ সম্পর্কে সাতটি প্রস্তাব পেশ করেন, যা আজো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষ গুরুত্বসহ বিবেচনাযোগ্য বলে নীচে তা উদ্ধৃত হলো ঃ

"(১) ভাষা ও সাহিত্যের উপর প্রভাব কলিকাতার বদলে এখন ঢাকা হইতে হইবে।

(২) পদ্মার পশ্চিম পারের আমাদের যে সব জিলা এতদিন রাষ্ট্রীয় কারণে নিজেদেরে 'বাঙ্গাল' হইতে স্বতন্ত্র ভাবিত, 'অধিকতর ভদ্র' পশ্চিম-বাংলার অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া গৌরব বোধ করিত এবং প্রেরণার জন্য স্বভাবতঃই কলিকাতার দিকে চাহিদা থাকিত, তারা এখন ঢাকার দিকে নযর দিতে শুরু করিয়াছে স্বাভাবিক কারণেই।

(৩) প্রায় চল্লিশ লাখের মত পশ্চিম-বাঙ্গালী মুসলমান পূর্ব-পাকিস্তানের স্থায়ী বাশেন্দা হইয়াছেন। সমাজ-সাহিত্য ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁদের অনেকেই

প্রভাব-প্রতিপত্তির স্থান দখল করিয়া আছেন। পূর্ব-পাকিস্তানের কথ্য ভাষায়, সুতরাং সাহিত্যে, এঁদের প্রভাবের ছাপ থাকিবেই।

(৪) কথ্য ভাষার দিক হইতে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জিলার আঞ্চলিক বাংলার মধ্যে যে প্রকট পার্থক্য দেখা যায়, তার বেশির ভাগই উচ্চারণে সীমাবদ্ধ।

(৫) প্রায় দশ লাখের মত উর্দু-ভাষী অবাঙ্গালী পূর্ব-পাকিস্তানের স্থায়ী বাশেন্দা বনিয়া গিয়াছেন। তাঁদেরও প্রভাব আমাদের কথ্য ভাষায় পাড়বে।

(৬) রাজধানী ঢাকায় বাটোয়ারার আগের মুদ্দতে কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের মত বাংলা-ভাষী কোন প্রভাবশালী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না।

(৭) ঢাকা শহরে বাটোয়ারার প্রাক্কালের যুগের বাংলা-সাহিত্যে পূর্ব-বাংলাবাসী প্রভাবশালী কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠী ছিল না।

সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের বাহন যেমন হইবে স্বাভাবিক কথ্য ভাষা তেমনি সেটা হইবে উপরোক্ত সমস্ত পরিস্থিতি-পরিবেশের সৃষ্ট ও হরেক ভাষার সংমিশ্রণের ফল এক নয়া ভাষা। সে ভাষার সৃষ্টিকার্য ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শুধু আমাদের সাহিত্যিকদের নযরেই সে বিপুল নির্মাণকার্য আজো ধরা পড়ে নাই।"

ভাষা-চিন্তায় আবুল মনসুর আহমদ কতটা বাস্তববাদী ও প্রাগ্রসর তা উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট। ১৯৫৮ সনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে তিনি আমাদের ভাষার রূপ, পরিচয় ও ভবিষ্যতে তা কী রূপ পরিগ্রহ করতে পারে বা করা বাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কে যে বক্তব্য পেশ করেছেন, দীর্ঘকাল পরে বর্তমান স্বাধীন বাংলার পরিবর্তিত পরিবেশেও তা একান্তভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। বাংলা স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। বাংলাদেশের তের/চৌদ্দ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। ঢাকা শুধু বাংলাদেশেরই রাজধানী নয়, বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চা ও বিকাশেরও কেন্দ্র। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য আমরা ১৯৫২ সনে রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস তৈরি করেছি। তার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০০ সনে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করেছে। এর প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার মর্যাদা ও বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আবুল মনসুর আহমদের ভাষা-চিন্তা ও তাঁর যৌক্তিক অভিমতকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার সময় এসেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিক দিয়েই বিভক্ত নয়, ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়েও উভয় অঞ্চলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। অনুরূপভাবে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য মোটেই উপেক্ষা করার মত নয়। আবুল মনসুর আহমদের দৃষ্টিতে ঃ

"অবিভক্ত বাংলায় বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল হিন্দুদের। তার মানে বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত এবং প্রধানত হিন্দু কালচারের বাহক। সে সাহিত্য বাংলার মুসলিম কালচারের বাহক ত ছিলই না বরঞ্চ তার প্রতি বিরূপ ছিল। সুতরাং সে সাহিত্যে

গোটা-কতক মুসলমানী শব্দ ঢুকাইয়া দিলেই তা মুসলিম কালচারের বাহক সাহিত্য হইয়া যাইত না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দের ভাল-ভাল বই-এর হিন্দু চরিত্রগুলির জায়গায় মুসলমান নাম বসাইয়া দিলেই ওগুলি মুসলিম চরিত্র হইয়া যাইবে না। তাতে মুসলিম-সাহিত্যও হইবে না। পক্ষান্তরে 'বাংগাল' বা 'মুসলমান' বলিয়া নিজেদের বাপ-দাদার আমলের মুখের লফ্‌যগুলি বাদ দিলেই আমরা 'আধুনিক' ও 'প্রগতিশীল' হইয়া যাইব না। গোশতের বদলে 'মাংস', আন্ডার বদলে 'ডিম', জনাবের বদলে 'সুধী', আরযের বদলে 'নিবেদন', তসলিমবাদ এর বদলে 'সবিনয়', দাওয়াতনামার বদলে 'নিমন্ত্রণপত্র' শাদি-মোবারকের বদলে 'শুভ বিবাহ' ব্যবহার করিলেই আমরা 'সভ্য' 'কৃষ্টিবান' ও 'সুধী বিগদ্ধ' হইলাম, নইলে হইলাম না, এমন ধারণা হীনমন্যতার পরিচায়ক। কৃষ্টিক চেতনা রেনেসাঁর জন্য এটা অশুভ ইঙ্গিত। আমাদের তরুণ 'প্রগতিবাদীদের মধ্যে ইদানীং এই বাতিক খুব জোরসে দেখা দিয়াছে। এটা আশংকার কথা।" (বাংলাদেশের কালচার, বর্দ্ধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৬, পৃ. ২১৭)।

১৯৫৮ সনে আবুল মনসুর আহমদ যে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, সেটা ক্রমান্বয়ে অনেকটাই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাঙালী মুসলমানদের ব্যবহৃত শব্দ আর বাঙালী হিন্দুদের ব্যবহৃত শব্দ বহু ক্ষেত্রে ভিন্ন এবং মুসলমানদের ব্যবহৃত শব্দ আর বাঙালী হিন্দুদের ব্যবহৃত শব্দ বহুক্ষেত্রে ভিন্ন এবং মুসলমানদের ব্যবহৃত শব্দ হিন্দুদের ব্যবহৃত শব্দ থেকে শ্রেষ্ঠ এবং ব্যাপক জনমন্ডলীর পক্ষে বোধগম্য এ বিষয় বুঝাবার জন্য আবুল মনসুর আহমদ দুটি দৃষ্টান্ত পেশ করেন। দৃষ্টান্ত দুটি এরূপ ঃ "ফজরের আউয়াল ওয়াকতে উঠিয়া ফুফু-আম্মা চাচীজীকে কহিলেন ঃ আমাকে জলদি এক বদনা পানি দাও। আমি পায়খানা ফিরিয়া গোসল করিয়া নামায পড়িয়া নাশতা খাইব।' হিন্দু বাঙালীর মুখের বাংলার দৃষ্টান্ত ছিল নিম্নরূপ ঃ "অতি ভোর বেলা উঠিয়া পিসিমা খুড়া মশায়কে বলিলেন ঃ আমাকে শীগ্‌গির এক গাড় জল দাও। আমি প্রাতঃক্রিয়া সারিয়া চ্যান করার পর সন্ধ্যা করিয়া মাধাগ্নি খাইব।' .... মুসলমানের মুখের ঐ বাংলা ভাষা বিহার হইতে কুমারিকা পর্যন্ত জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী বুঝিবে। পক্ষান্তরে হিন্দুর মুখের ঐ বাংলা বাংলাদেশের বাইরের হিন্দুরা বুঝিবে না, অন্য ত পরের কথা।"

এভাবে তিনি বাঙালী মুসলমান ও বাঙালী হিন্দু একই বাংলা ভাষী হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মুখের ভাষার মধ্যে যে ফারাক রয়েছে তা উদাহরণসহ তুলে ধরেছেন এবং মুসলমানের মুখের ভাষা যে ব্যাপকতর জনগোষ্ঠীর বোধগম্য তা প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন। এভাবে উভয়ের মুখের ভাষা যে বাস্তবতার নিরিখে উত্তরোত্তর আরো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হবে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"অবিভক্ত বাংলা সাহিত্য-কেন্দ্র ছিল যেমন কলিকাতা, পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) সাহিত্য-কেন্দ্র হইবে তেমনি ঢাকা। অবিভক্ত বাংলা সাহিত্যকে গণ-সাহিত্য করিবার প্রয়োজনের তাগিদে যে কারণে কলিকাতার কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের ভাষার সম্মান দিতে হইয়াছিল, ঠিক সেই প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের রাজধানী ঢাকার কথ্য

ভাষাকেও আমাদের সাহিত্যের ভাষার মর্যাদা দিতে হইবে। সাহিত্যে ব্যবহারোপযোগী কোন নিজস্ব ভাষা ঢাকার নাই। তাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। গোড়াতে কলিকাতারও ছিল না। জনগণের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী পশ্চিম-বাংলার জিলাসমূহের কথ্য ভাষার সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে যেমন একটি 'কোলকেতেয়ে' কথ্য ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেই কলিকাতার কথ্য ভাষা পশ্চিম বাংলার তথা গোটা বাংলা সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব বাংলার (বাংলাদেশের) সাহিত্যিকদের সমবেত চেষ্টায় তেমনি ঢাকায় পূর্ব বাংলার (বাংলাদেশের) বিভিন্ন জিলার ভাষার সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে একটি 'ঢাকাইয়া' কথ্য বাংলা গড়িয়া উঠিবে এবং সেই ভাষাই পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) সাহিত্যের ভাষা হইবে। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জিলার আঞ্চলিক ডায়লেক্টের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকায় শান্তিপুরী ডায়লেক্ট যেমন তাদের ভাষিক একতার কিউক্লিয়াস হইতে পারিবে।

"আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের চিন্তা-নায়ক হিসাবে তাই বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের তাই করিতে হইবে দুইটি কাজ। প্রথমত ঃ পূর্ব বাংলার (বাংলাদেশ) প্রাচীন সভ্য মানুষের নয়া রাষ্ট্র ও নয়া জাতি গঠনে সাহায্য করার জন্য তাদের নয়া যিন্দিগির ও নয়া কালচারের ধারক ও বাহক নয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সেই সাহিত্যের মিডিয়াম রূপে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) সমস্ত অঞ্চলের বোধগম্য ও ব্যবহারোপযোগী একটি ঢাকাইয়া কথ্য বাংলা গড়িয়া তুলিতে হইবে।" (পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২১-২২২)

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে আমাদের নিজস্ব ভাষা-সাহিত্যের চর্চা করার জন্য আবুল মনসুর আহমদ আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই ১৯৫৮ সনেই। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য একবিংশ শতাব্দীতে আরো বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। নিজস্ব ঐতিহ্য-কৃষ্টি, আত্মমর্যাদা, জীবনবোধ ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংহত ও সংরক্ষণের জন্য এর অন্য কোন বিকল্প নেই।

একাধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ আমাদের জাতীয় জীবনে ছিলেন অন্যতম পথিকৃত। ১৮৯৮ সনের ৩ সেপ্টেম্বর সাবেক ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালে ধানীখোলা গ্রামে তাঁর জন্ম। গ্রামের পাঠশালা ত্রিশাল দরিরামপুরে পড়ার পর তিনি ১৯১৭ সনে ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯১৯ সনে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ) থেকে আই.এ, ১৯২১ সনে ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ ও ১৯২২ সনে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে বি.এল পাশ করেন। অতঃপর বি.এ ডিগ্রী হাসিলের পর তিনি কলকাতায় সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯২৩ সনে আবুল কালাম শামসুদ্দিন সম্পাদিত 'মুসলিম ভাগ্য' নামক সাপ্তাহিকে তাঁর সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। এরপর ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত তিনি যথাক্রমে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সাপ্তাহিক 'সুলতান' ও মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'তে সহকারী সম্পাদক হিসেবে

দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৫–১৯২৯ পর্যন্ত মৌলভী মজিবর রহমানের 'দি মুসলমান' পত্রিকায় কাজ করেন। অতঃপর ১৯২৯–১৯৩৮ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জজকোর্টে আইন ব্যবসা করেন। আইন ব্যবসায়ে মনঃসংযোগ করতে না পারায় তিনি পুনরায় ১৯৩৮ সনে 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সনে শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে কাজ করেন। ১৯৪৬–১৯৪৮ পর্যন্ত তিনি কলকাতাস্থ 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি আবুল মনসুর আহমদ রাজনৈতিক তৎপরতাও শুরু করেন। খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলন, কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টি এবং পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। ১৯৫৩–১৯৫৮ পর্যন্ত তিনি আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৫ সনে তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ১৯৫৬ সনে শিক্ষামন্ত্রী এবং ১৯৫৬–১৯৫৭ সনে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইতোপূর্বে ভাষা আন্দোলনেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

আবুল মনসুর আহমদের প্রধান পরিচয় সাহিত্যিক হিসেবে। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান তাঁকে চির অমর করে রাখবে। মননশীল রচনা ছাড়াও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ ঃ

উপন্যাস ঃ ১. সত্য মিথ্যা (১৯৫০), ২. জীবন ক্ষুধা (১৯৫৫), ৩. আবেহায়াত (১৯৬৮)

গল্পগ্রন্থ ঃ ১. আয়না (১৯৩৫), ২. ফুড কনফারেন্স, (১৯৫০) ৩. আসমানী পর্দা (১৯৫৫)

প্রবন্ধ ঃ বাংলাদেশের কালচার (১৯৬৬)

রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ ঃ ১. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৮), ২. শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭৩)

স্মৃতিকথা ঃ আত্মকথা (১৯৭৮)

শিশু কিশোর সাহিত্য ঃ ১. ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া (১৯৬৬), ২. গালিভারের সফরনামা (১৯৪৯)

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যপূর্ণ সার্থক অবদানের জন্য আবুল মনসুর আহমদ ১৯৬০ সনে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (ছোট গল্প) লাভ করেন।

আমাদের রাজনীতি, সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষা-চিন্তার ক্ষেত্রে অসামান্য ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের অধিকারী আবুল মনসুর আহমদ ১৯৭৯ সনের ১৮ মার্চ ইন্তিকাল করেন।

গদ্যশিল্পী মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ

বাংলা গদ্য সাহিত্যকে যাঁরা নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, সুসাহিত্যিক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ তাঁদের অন্যতম। তিনি একজন বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী হিসাবে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। মননশীল গদ্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মহিমাময় ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর।

১৮৯৮ ঈসায়ীর ২রা মার্চ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত বেলতৈল ইউনিয়নের ঘোড়াশাল গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম হাজী আজম আলী, মাতার নাম তছিরন বিবি। হাজী আজম আলী ছিলেন শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি নিজ গ্রামে কবিরাজী চিকিৎসা করতেন। তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ পুত্র রহমতুল্লাহ গ্রামে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন। একমাত্র কন্যা কদরজান, তাঁর বিয়ে হয়েছিল পার্শ্ববর্তী গ্রাম কাদাইবাদলার মোহাম্মদ সামশাদ আলীর সাথে। ঘোড়াশালের পার্শ্ববর্তী অন্য একটি গ্রাম– নাম চরবেলতৈল, এ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন প্রখ্যাত 'আনোয়ারা' উপন্যাসের রচয়িতা পণ্ডিত মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ পার্শ্ববর্তী গ্রামে বেলতৈল এম.ই. স্কুল (বর্তমানে বেলতৈল হাইস্কুল) থেকে ১৯০৬ সনে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১০ সনে উক্ত একই স্কুল থেকে এম.ই. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি শাহজাদপুর হাই ইংলিশ স্কুলে (বর্তমানে শাহজাদপুর পাইলট হাইস্কুল) ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১৯১৪ সনে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১৬ সনে তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুনরায় বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১৮ সনে তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ. পাশ করেন এবং ১৯২০ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে দ্বিতীয় বিভাগে এম.এ. পাশ করেন।

১৯২২ সনে তিনি এল.এল.বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি.এ. ক্লাসের ছাত্র থাকাকালে তিনি জোবেদা খাতুনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ১৯২৩ সনে অনুষ্ঠিত প্রথম বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (বি.সি.এস.) পরীক্ষায় হিন্দু-মুসলিম প্রার্থীদের সম্মিলিত তালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। তিনি প্রথমে স্বল্পকালের জন্য ইনকাম ট্যাক্স অফিসার পদে কাজ করার পর প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন বিভাগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে চাকুরী নেন। ক্রমান্বয়ে তিনি উভয় বাংলার বিভিন্ন এলাকায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কালেকটর, মহকুমা অফিসার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সর্বশেষে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ডেপুটি সেক্রেটারী হিসাবে ১৯৫৩ সনে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৫৫ সনের ২৬শে নভেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার বাংলা একাডেমীর আয়োজক (প্রিপারেটারী) কমিটি গঠন করে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহকে একাডেমীর স্পেশাল অফিসার (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) নিযুক্ত করেন। ১৯৫৬ সনের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থেকে মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী বাংলা একাডেমী গঠনের গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৬২-৬৩ সনে তিনি বাংলা একাডেমীর সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৬০ সনে বাংলা একাডেমী যে বছর সর্বপ্রথম সাহিত্য পুরস্কার চালু করে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ সে বছরই প্রবন্ধ-গবেষণা ক্ষেত্রে এ মূল্যবান জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া, তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে 'সিতারা-এ-ইমতিয়াজ' খেতাব প্রদান করেও সম্মানিত করেন।

১৯১৫ সনে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর রাজশাহী কলেজে অধ্যয়ন কালে রাজশাহীতে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলা গদ্যে কথ্যরীতির সার্থক প্রবর্তক প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী। তরুণ বরকতুল্লাহ সে সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় তিনি অনেক কবি-সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন এবং নিজেও সাহিত্য-চর্চার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ঐ সময় কলেজে প্রবন্ধ রচনা আহ্বান করা হলে তাতে তাঁর লেখা দুটো প্রবন্ধ 'পদ্মাবক্ষে' এবং 'ভগ্নদেউল' পুরস্কৃত হয়। পরে প্রবন্ধ দুটি রাজশাহী কলেজ ম্যাগাজিনে যথাক্রমে ১৯১৬ ও ১৯১৭ সনে প্রকাশিত হয়। 'ছাত্র সমাজে জাতীয়তা' শীর্ষক তাঁর একটি প্রবন্ধ 'আল্ এসলাম' পত্রিকার মাঘ, ১৩২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত প্রবন্ধের নীচে সম্পাদক মনিরুজ্জামান ইসলামবাদীর উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্যও সংযোজিত হয়। আল্ এসলাম পত্রিকায় ফাল্গুন, ১৩২৪ সনে এম. আনসারী ছদ্মনামে 'অর্ঘ্যভার-হজরতের প্রতি' শীর্ষক তাঁর একটি কবিতাও ছাপা হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের ছাত্র থাকা কালে 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিনের অনুরোধে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ 'ধ্রুব কোথায়' শীর্ষক কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন এবং তা 'সওগাতে' ১৩২৭ সনের অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ,

ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় ছাপা হয়। পরে এটি 'মানুষের ধর্ম' (১৯৪০) গ্রন্থে সংকলিত হয়। এ প্রবন্ধটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সওগাত-সম্পাদক নাসিরুদ্দিন লিখেছেন ঃ

"এ-প্রবন্ধে লেখক সত্যের বিচার, জীবন ও জগত, জীবন ও মৃত্যু, ইহকাল ও পরকাল, জড় ও চৈতন্য, বিরাট প্রাকৃতিক শক্তি, ধর্মীয় বিবর্তন ও সর্বশক্তিমানের স্বীকৃতি প্রভৃতি জটিল বিষয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের মতবাদ দক্ষতার সাথে অতি সহজ ও সুন্দর ভাষায় আলোচনা করেছেন।" (বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, পৃ. ১৫২৩-২৪)

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে কলকাতার 'ইমপেরিয়াল লাইব্রেরী'তে তিনি যাতায়াত করতেন। সেখানে ব্যাপক পড়াশোনার পর বরকতুল্লাহ্ পারস্য সাহিত্য এবং পারস্যের জগৎ-বিখ্যাত কয়েকজন কবি ও মনীষী সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করে 'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'সওগাত' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। প্রবন্ধগুলি পরে সংশোধিত আকারে তাঁর সুবিখ্যাত 'পারস্য-প্রতিভা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'পারস্য-প্রতিভা'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সনের ৭ই জানুয়ারী। প্রথম খণ্ডে কয়েকজন সাহিত্য-সাধকের জীবনী আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ ঈসায়ীতে। এতে প্রধানতঃ পারস্য সাহিত্যে প্রতিফলিত ধর্ম ও দর্শনের দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৬৪ সনে লেখক 'পারস্য প্রতিভার দু' খণ্ড একত্রে প্রকাশ করেন এবং খণ্ডবিভাগ তুলে দেন।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর সর্বশেষ্ঠ ও সর্বাধিক জনপ্রিয় সাহিত্য-কীর্তি হলো 'পারস্য-প্রতিভা'। এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের সাথে সাথেই তিনি অভাবিত যশ ও খ্যাতির অধিকারী হন। বিদগ্ধ পাঠক সমাজ এর ভূয়সী প্রশংসা করে। বিভাগ-পূর্বকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিক ক্লাসে "পারস্য-প্রতিভা'র প্রথম খণ্ড থেকে 'কবি ফেরদৌসীর প্রতিভা' পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে। প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সে যুগের প্রায় সবগুলো পত্রিকায় এ গ্রন্থের উপর আলোচনা ছাপা হয়। এখানে সেসব পত্রিকার কয়েকটি থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"এই পুস্তকে ফেরদৌসী, হাফেজ, ওমর খইয়াম, সা'দী ও জালাল উদ্দীন রুমী– এই কয়কজন পারস্য কবির জীবন কথা আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে।... আলোচনা ও বিশ্লেষণের ভাষা সর্বত্রই গম্ভীর অথচ মধুর, সারগর্ভ অথচ সরস, –কোথাও কষ্ট কল্পনার আভাসমাত্র নাই– ভাষা সর্ব্বত্রই সরল স্বচ্ছন্দ গতিশালিনী এবং সহজ ভঙ্গীময়ী। কার্লাইলের 'হিরো ওয়ার্শিপ' প্রভৃতি গ্রন্থে যেরূপ অন্তর্দৃষ্টিশীলতা এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট,– রাস্কিনের গ্রন্থে কারুশিল্প বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যানুভূতির যেরূপ মনোমদচিত্র দেদীপ্যমান, এই 'পারস্য-প্রতিভা' গ্রন্থের গ্রন্থকারেরও সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টিশীলতা এবং সৌন্দর্যানুভূতির প্রোজ্জ্বল পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার যে একাধারে কবি, ভাবুক এবং জীবনী-আলেখ্যের সুপটু চিত্রকর,

তাহা এই গ্রন্থে উত্তমরূপেই বুঝা যাইবে। এ পুস্তক একবার পড়িয়া তৃপ্তি হয় না,– আবার–আবার পড়িবার ইচ্ছা হয়। আর, কবি ফের্দৌসী প্রভৃতির জীবন-সমালোচনা পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারের কবিত্বময়ী আবেগময়ী ছন্দময়ী মধুময়ী ভাষায় আত্মহারা হইয়া মহা-প্রকৃতির কবিত্বকোলে ঘুমাইয়া পড়িতে ইচ্ছা জন্মে। এইরূপ কবিত্ব-লীলাভঙ্গীময় ভাব-মাধুর্য্য-মনোহর এবং মহাকবি ও মহাপ্রাণের জীবনী আলোচনাপূর্ণ পুস্তকই এদেশের উচ্চ শ্রেণীর অধ্যয়ন এবং আলোচনার জন্য পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়া একান্ত কর্তব্য।... পারস্যের কাব্য-মালঞ্চের কবি-কোকিলগণের মধুর স্বরে এবং তদধিক সুমধুর সার-তত্ত্বে যাঁহারা নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে চাহেন, তাঁহারা এই 'পারস্য-প্রতিভা' পুস্তকে সে আস্বাদ প্রচুর পরিমাণেই পাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মুসলমান গ্রন্থকারগণের ভিতর যে এমন চিন্তাশীল এবং সুমধুর অথচ প্রাঞ্জল বঙ্গভাষার লেখক আবির্ভূত হইতেছেন– ইহাও বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে অতীব আনন্দ ও আশার কথা। 'পারস্য প্রতিভা'র গ্রন্থকার মহাশয়ের লেখনী জয়যুক্ত হউক, তাঁহার সধানিস্যন্দিনী লেখনী পারস্য কাব্য-সাহিত্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া এমনই সুধারস গ্রন্থাকারে প্রদান করতে রহুক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।" (বঙ্গবাসী, ১৮ ফাল্গুন, ১৩৩০)।

"–গ্রন্থকার এই নূতন সৃষ্টির মধ্য দিয়া যে বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, বাস্তবিকই তাহা প্রশংসনীয়।" পারস্য-সাহিত্যের ধারা গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাতে জানিবার, বুঝিবার ও শিখিবার মত অনেক কিছু আছে। এতদ্ব্যতীত জগৎবিশ্রুত পারস্য কবিগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথার সঙ্গে তাঁহাদের কাব্যাবলীর আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি যে সূক্ষ্মদর্শিতার ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে কোনও দেশের, যে কোনও জীবনী-লেখক বা সমালোচকের পক্ষে গৌরবের কথা বলিয়া আমরা মনে করি।" (সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, ২রা মাঘ, ১৩৩০)

"মৌলবী... সাহেব কাব্যরসিক ব্যক্তি; তাঁহার ভাষাসৌষ্ঠব ও ভাবগাম্ভীর্য্য কাব্যালোচনার রসধারাকে কোথাও ক্ষুণ্ন করে নাই। বস্তুতঃ তিনি যেরূপ সুন্দরভাবে আলোচ্য পুস্তকখানিতে পারস্য-কবিগণের জীবনী ও কাব্যের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজেরই অসাধারণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কাব্যামোদী পাঠকগণ ইহাতে উপভোগের বহু উপকরণ পাইবেন।" (মোসলেম জগৎ, ১১ই মাঘ, ১৩৩০)।

"আমরা নিঃসন্দেহে বলিব,– বাঙ্গালা মোস্‌লেম-সাহিত্যে এমন দান এক প্রকার নূতন। ভাষার অনাবিল ভাব, অব্যবচ্ছেদ গতি ও বর্ণনা কৌশলে ঈরানী কুঞ্জ মনে পড়ে।" (ছোলতান, ১৮ই মাঘ, ১৩৩০)

"ফির্দ্দৌসী, হাফেজ, ওমর খইয়াম, সা'দী, জালাল উদ্দীন রুমী প্রভৃতি জগৎ প্রসিদ্ধ পারসী কবিগণের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। যদি তাঁহাদের রহস্যময় জীবন ও কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিতে চান, তবে এই গ্রন্থ পাঠ করুন। গ্রন্থকার কবিদের জীবনী ও কাব্য আলোচনা করিতে যাইয়া যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও মধুর

কবিত্বময়। তাঁহার লেখনী যশস্বী হউক। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের প্রত্যাশায় রহিলাম।" (আনন্দ বাজার, ফাল্গুন, ১৩৩০)

"গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমে বিশ্ব-সাহিত্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ এইসব অমর কবিদের জীবনী লিপিবদ্ধ করে বঙ্গ-সাহিত্যে একটা অমূল্যরত্ন দিয়েছেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বঙ্গ ভাষার প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার এই বইখানি পড়া উচিত।... গ্রন্থকার বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় পুস্তকখানি রচনা করেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে দিয়েছেন কবিদের জীবনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে নানাবিধ জ্ঞানের কথা, প্রেমের কথা, সাধনার কথা ইত্যাদি।..." (বিজলী, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৩০)

"গ্রন্থকার কবিদের জীবনচরিত সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কবিত্বের আলোচনা বা সমালোচনাও পারস্য অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকদের পক্ষে তাঁহাদের কবিত্বরস আস্বাদনে অনেকটা সাহায্য করিবে।" (দৈনিক বসুমতী, ২৩ শ্রাবণ, ১৩৩১)

"গ্রন্থকার নিজের জ্ঞান ও বিচারের সহিত বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গবেষণার সংমিশ্রণে এই উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ধর্ম্মে ও সাহিত্যে জাতিভেদ নাই; স্থান ও কালের বিভিন্নতায় ধর্ম্মে ধর্ম্মে সাহিত্যে সাহিত্যে যে পার্থক্য ঘটে তাহাতে অসীম-রস-পিপাসু মানবগণ বিভিন্নতার রসাস্বাদ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিবার অবসর পায়। গ্রন্থকার এই অসাধারণ আনন্দ বঙ্গের নর-নারীকে পরিবেশন করিয়া সকলের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। কবির জীবনের সহিত তাঁহার কাব্যের সম্পর্ক প্রদর্শন ও তাঁহার কাব্যের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ বিশেষ নিপুণতার সহিত করা হইয়াছে।" (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩১)

"এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি।... গ্রন্থকার পারস্য কবিগণের কাব্যের দার্শনিক তত্ত্ব ও তাঁহাদের জীবনের আধ্যাত্মিকতা বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; পুস্তকখানি ভাষার মাধুর্য্যে, বর্ণনা-চাতুর্য্যে ও ভাবের প্রাচুর্য্যে সকলের আদরণীয় হইবে।... আমাদের বিশ্বাস, পারস্যের কবি-সাহিত্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থই বাঙ্গালায় প্রথম।" (সঞ্জীবনী, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৩১)

"... গ্রন্থকার এই পুস্তকে পারস্য সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্যের পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন। তাঁহার নিপুণ হস্তে বর্ণনীয় বিষয়টি সুপরিস্ফুট ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। ভাষাটিও উত্তম ও বিষয়োপযোগী। বইখানি পড়িলে পারস্য সাহিত্যের সহিত আরও অধিক পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিয়া উঠে।" (মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভাদ্র, ১৩৩১)

"বাস্তবিক ইহা বাঙ্গালী সাহিত্যামোদীগণের একখানা পরম আদরের গ্রন্থ হইয়াছে। গ্রন্থকার যে ভাবুক এবং কবিত্বরস সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যে অসামান্য তাহার পরিচয় তাঁহার গ্রন্থের প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট। এই গ্রন্থ দ্বারা তিনি বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের সহিত

পারস্য কাব্য সাহিত্যের যে যোগসূত্র স্থাপন করিলেন, তজ্জন্য চিরদিন বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে।" (সওগাত, বৈশাখ, ১৩৩৪, ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)।

"The book chronicles the life-work of the more famous poets of Persian would critical review of their poetical works. The author is thoroughly wellversed with Persian Literature and Persian History and the book under review bears ample evidence of a finished writer and a mature critic. The language is highly chaste and elegant and the style is almost classical and bears the impress of Bankim Chandra's inimitable productions. The ease and facility with which the autor traverses the whole field of Persian Literature is indeed remarkable and the traces of scholarly industry which are evident in every page easily distinguish the book from the other publications which are generally met with in the market."

"The book begins with a historical review of the gradual evolution of Persian Poetry and the circumstances which have imported to it, its peculiar characteristics. The first chapter of the book is therefore highly fascinating and the beautiful style of the author makes it a most pleasant study... And one can hardly go through the book without being tempted to finish it as quickly as possible. We congratulate the author who seems to be preeminetly a Poet, on the remarkable parts he has exhibited in this book and assure him that he has afforded us real satisfaction to go through it. We need hardly say that public will find in it a degree of intellectual hardly to be found in the usual publications of the day." (THE SERVENT 13.2.1924)

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর পারস্য-প্রতিভার রচনার স্টাইলে মুগ্ধ হয়ে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন এটাকে 'Racy sweet Bengali style' বলে উল্লেখ করেন। বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ঃ

"I am also delighted to find that as a literary work this book is not essentially Muslim in character but is based on a broad cosmopolitan idea and a comparative study of the Poetical Literatures of different countries."

বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও ভাষা-সৈনিক সানাউল্লাহ্ নূরী পারস্য প্রতিভা সম্পর্কে বলেন ঃ "মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্র অন্বিষ্ট জগত আমার আলোচ্য। বর্ষীয়ান এই লেখক সাহিত্যের বলয়ে আর ব্যক্তি-জীবনের বৃন্তে উঠেছিলেন প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট একটি চূড়ায়। দায়িত্বশীল একজন প্রশাসক হয়েও সারাটা জীবন বিচরণ করেছিলেন তিনি সুকুমার সৌন্দর্যের অন্বেষায়। অবগাহন করেছিলেন প্রাচ্য ভাষা, সাহিত্য এবং চিন্তার গভীর রহস্যালোকে। সেই অতল মন্থন করে বাংলা সাহিত্যকে তিনি উপহার দিলেন

ফেরদৌসীর ক্লাসিক্যাল মহাকাব্যের সুধাভান্ড। হাফিজের এবং সা'দীর গজল আর গীতি কবিতার অপার গৌরব, তার বর্ণাঢ্য সৌন্দর্য। রুমীর মসনবী আর ওমর খৈয়ামের রুবাইর অন্তর্লীন সুষমা।

"ফার্সী সাহিত্যেরই এই অমর কবিদের মুখ আমরা উজ্জ্বল হয়ে ভাসতে দেখি মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচিত 'পারস্য প্রতিভা'য়। এই একটি গ্রন্থে তিনি ধরে রেখেছেন ইরানের কাব্য-কাননের সব ক'টি সুকণ্ঠ বুলবুলির সুর এবং গান। তাঁদের আমরা স্পন্দিত হতে দেখি আপন আবেগে, যন্ত্রণায়, ক্ষোভে, ঈর্ষায় এবং ভালবাসায়।

"কাব্যের সমঝদার আর সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে এখানেই অসামান্য কৃতিত্ব মোহাম্মদ বকতুল্লাহর। ঘনিষ্ঠ আলোকে তিনি চিত্রিত করেছেন ইরানী কবিদের জীবন এবং কবিতার জগতকে। তাঁদের নিয়ে এসেছেন আমাদের প্রাণের কাছে অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে। কেমন যেন এক যাদুর ছোঁয়ায় তিনি ঘুচিয়ে দিলেন বাংলাদেশ আর পারস্যের দূরত্ব। আমরা দেখলাম, এই মেদুর আকাশের নীচে আমাদের মেটে ঘরের সামনে শিশির ভেজা আঙিনা দিয়েই যেন হেঁটে যাচ্ছেন পারস্যের অবিস্মরণীয় সেই কবিরা। তাঁদের কণ্ঠের ললিত স্বর কানে এসে বাজছে আমাদের। তমালের ছায়াতলে বসে ছন্দ গাঁথছেন তাঁরা। আবৃত্তি করছেন কবিতা।" (সানাউল্লাহ নূরী ঃ বরকতুল্লাহ ও তাঁর পারস্য প্রতিভা)।

পারস্য-প্রতিভার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সনে। ইতোমধ্যে প্রথম খণ্ডের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এর দ্বারা এ গ্রন্থের অসাধারণ জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর এ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকা যেসব মন্তব্য করে তার কিছু কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত হলো ঃ

"পারস্য-প্রতিভা', দ্বিতীয় খণ্ডে পারস্যের উর্বর যুগ, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, নাসির খসরু ও ইসমাইলী মত, নেজামী, জামী, সুফীমত ও বেদান্ত, সুফীমত ও নিও-প্রোটোনিজম–এই সাতটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে যেমন পারস্য কবিদের ও তাঁহাদের কাব্যের পরিচয় মিলিবে, দ্বিতীয় খণ্ডে তেমনি পারস্য দার্শনিক কবি-মনীষীদের জীবন ও মতামত আলোচিত হইয়াছে। এই দুই খণ্ড একত্রে পাঠ করিলে মধ্যযুগে পারস্যে যে অমর কাব্য ও দর্শন তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সঙ্গে শিক্ষিতজনের পরিচয় হইবে। পারস্য-প্রতিভা বাস্তবিকই বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।" (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪৪)

"... পুস্তকখানিতে ৭টি প্রবন্ধ স্থান লাভ করিয়াছে। প্রবন্ধগুলি দার্শনিক তথ্যে অলংকৃত।... গ্রন্থকারের লিপিকৌশল মনোরম।" (দৈনিক বসুমতী, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৮)

"বরকতুল্লাহ্ সাহেব কাব্যরসজ্ঞ ও চিন্তাশীল লেখক, একথা ১ম খণ্ড 'পারস্য প্রতিভা' পড়িয়া সাহিত্য সমাজ স্বীকার করিয়াছিলেন। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডও লেখকের সে যশ অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিয়াছে।" (মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র, ১৩৩৯)

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মানুষের ধর্ম' বাংলা ভাষায় মুসলিম রচিত প্রথম এবং এক অসাধারণ দার্শনিক গ্রন্থ। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সনে। এতে মোট ছয়টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়। প্রবন্ধগুলি হলো ঃ 'মানুষের ধর্ম্ম', 'ধ্রুব কোথায়', 'জড়বাদ', 'চৈতন্য', 'বস্তুরূপ' ও 'জীবন প্রবাহ'। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৭ সনে। এতে আটটি প্রবন্ধ স্থান লাভ করে। প্রথম সংস্করণের 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধটি তিনটি ভিন্ন নামে স্বতন্ত্র তিনটি প্রবন্ধাকারে দ্বিতীয় সংস্করণে স্থান লাভ করে। এর পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হয় ১৯৫৯ সনে। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেন ঃ

"গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়গুলি দর্শনমূলক হইলেও দুরূহ দার্শনিকতার অবতারণা ইহাতে করা হয় নাই। সাধারণতঃ আমাদের মনে জীবন ও জগৎ, ইহলোক ও পরলোক, আত্মা ও পরমাত্মা, জড় প্রকৃতি ও মনোজগৎ ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে সময় সময় যেসব প্রশ্ন জাগে সেইগুলির উপর দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোকপাতের চেষ্টা করা হইয়াছে। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ই প্রগতিশীল। তাই তিনটি নূতন প্রবন্ধ (১) পরমাণু জগৎ ও প্রাণশক্তির উন্মেষ (২) পরমাণু যুগে ধর্ম ও সভ্যতা (৩) পারমার্থিক জগৎ ও জীবন–এবারে সংযোজিত হইল। প্রবন্ধ তিনটী কিছুদিন পূর্বে 'মাহে নও' পত্রিকায় উহার সম্পাদক সাহেবের সৌজন্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

১৯৬৮ সনে 'মানুষের ধম'-এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ সংস্করণে লেখক তাঁর নিবেদনে বলেন ঃ "কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি আমার আলোচনার ভিতর জড়বাদের উপর অন্যায় কটাক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। ... আমি অধ্যাত্মবাদের সমর্থক। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি জড়বাদ প্রত্যক্ষ প্রমাণভিত্তিক বলিয়া অকাট্য, কিন্তু উহা মানুষের অন্তর্লোকের সন্ধান দিতে অপারগ; অথচ অন্তর্লোকই ধর্ম ও পরমার্থের ক্ষেত্র।"

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তথ্য-যুক্তির মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে শৃংখলা, শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের জন্য ধর্মের আবশ্যকতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে মানব জীবনে ধর্মের অপরিহার্যতা প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন। এ গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও দার্শনিক বিষয়বস্তুর আলোচনা থাকলেও তিনি দৃঢ়তার সাথে একথা বলার প্রয়াস পেয়েছেন যে, ধর্মের মূলভিত্তি বিশ্বাস। অন্যদিকে, বিজ্ঞান ও দর্শন শুধু যুক্তি-নির্ভর। মানুষের নিরন্তর সাধনা হলো চরম সত্যকে আবিষ্কার করা। বিজ্ঞান বস্তুজগত সম্পর্কে অনেক কিছু আবিষ্কার ও নতুন নতুন তথ্য প্রদান এবং আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করতে সক্ষম হলেও বিজ্ঞান বা দর্শন সবকিছু আবিষ্কার বা চরম সত্যে উপনীত হতে আজো সক্ষম হয়নি। তাছাড়া, বৈজ্ঞানিকগণ আজ যে আবিষ্কার বা নতুন উদ্ভাবনায় সফলকাম হলেন, আগামীতে হয়ত তা ভ্রান্ত বা ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। দর্শনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রয়োজ্য। তাই মানুষের সীমিত জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে ধর্মকে বিচার করা সঙ্গত নয়।

ধর্মের মূল ভিত্তি বিশ্বাস– এ বিশ্বাসের পথ বেয়েই ধীরে ধীরে চরম সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। এ সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য ও দার্শনিক প্রজ্ঞার সমার্থক। কারণ ধর্মের যিনি স্রষ্টা, বিজ্ঞান ও দর্শনের স্রষ্টাও তিনিই। তাই ধর্মের মূলভিত্তি বিশ্বাসের মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন ও মানব জীবনের অন্য সকল কিছুর একটি সুসমঞ্জস সম্বন্ধ ও সমীকরণ বিদ্যমান। এভাবে তিনি তাঁর জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা ধর্মের আবশ্যকতা এবং মানব জীবনে তার অনিবার্য শুভ পরিণাম সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। নানা দিক থেকে এ গ্রন্থটি অতি মূল্যবান ও উচ্চ দার্শনিক জ্ঞানসমৃদ্ধ।

এ গ্রন্থটি আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন সমাজ-পরিবেশ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৫ সনের ১৯শে জানুয়ারী। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু এর মূল উদ্যোক্তা ও পরিচালনায় ছিলেন অধ্যাপক আবুল হোসেন (পরে উকিল), অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, মোতাহার হোসেন চৌধুরী প্রমুখ। তাঁরা মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতেন এবং সব কিছু বৈজ্ঞানিক সত্য ও যুক্তির আলোকে বিচার করার পক্ষপাতি ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় ও কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এঁদের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস। তুরস্কের কামাল পাশা, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ও কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিও তাঁদের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। দীর্ঘ প্রায় দুই দশককাল পর্যন্ত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বিশেষ সক্রিয় ছিল এবং ঐ সময় আমাদের ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন কিন্তু 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র নেতৃবৃন্দের অনুসৃত রবীন্দ্রনাথের বাণী ঃ 'যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র',– এই মত ও চিন্তাধারার সাথে তিনি একমত ছিলেন না। 'বুদ্ধি মুক্তি' আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ধর্ম, বিশেষতঃ ইসলাম সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের অবতারণা করেন। এজন্য জ্ঞানতাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পরবর্তীতে সাহিত্য সমাজের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মুখ্যতঃ ধর্ম সম্পর্কে এ বিভ্রান্তিকর প্রচারণার জবাব হিসাবেই সাহিত্যিক বরকতুল্লাহ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তবে এতে প্রচারণামূলক কিছুই নেই, দার্শনিক প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের সত্যকেই তিনি নির্লিপ্তচিত্তে যুক্তিসহ উত্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের একটি প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য এখানে তুলে ধরছি ঃ

"আব্দুল ওদুদের মত বরকতুল্লাহও প্রবন্ধ সাহিত্যিক কিন্তু তাঁহার আলোচনার ক্ষেত্র ভিন্ন। ধর্ম বিষয়ে বরকতুল্লাহও আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে ইসলামের আলোচনা না করিয়া ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতামত উপস্থিত করিয়া

দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন– বিজ্ঞান সত্যের চরম রূপ আবিষ্কারে অসমর্থ। বিজ্ঞান অনেক পথ আসিয়াছে সত্য কিন্তু সম্মুখে এক অভেদ্য রহস্য-জাল, এই শেষ সীমায় পরীক্ষা আর অগ্রসর হয় না। তাই আধুনিক জগতের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণু সংস্থার পশ্চাতে চেতনশক্তির অতুলনীয় নৈপুণ্যে। এই বিশ্বাসেই ধর্মের ভিত্তি স্থাপন। গ্রন্থকার যে প্রবন্ধ সমষ্টিতে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন তাহার নাম 'মানুষের ধর্ম্ম'। অবশ্য এই 'মানুষের ধর্ম্ম' রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম্ম হইতে পৃথক, বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারা উভয় দিক হইতে।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস ঃ নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, তৃতীয় প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯২, পৃ. ৬১৫)।

পারস্য-প্রতিভার ন্যায় 'মানুষের ধর্ম' প্রকাশের পরও তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। নীচে সংক্ষেপে কয়েকটি পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"The Book is a collection of six very thoughtful articles published in monthlies coming from the pen of one who is well known for his masterly publication 'Parashya Prativa'. The author is a Mohammedan : but nowhere in this book he preaches Mahammedanism or anyother 'ism' than universalism. The great reality behind the creation of universe has diverse ways of emancipation and expression and the learned writer is liberal enough to accomodate and appreciate every path leading to the one and same destination. Yet he does not present himself as having the vanity of a seer but as an humble seeker after truth... Throughout the book there is present proof enough of the rare gift of visualising good in everything... The Religion of Maknkind, according to him, evolves itself through seers and sinners, and nothing exists anywhere but adds something to the glory of that Supreme Reality which is immanent in spirit and matter as well, and unifies the both ... It heartened me a lot to believe with the author that humanity has been constantly striving, thriving, through apparent strifes and setbacks, towards the realisation of truth and we have not left the Golden Age in the primitive past but rather it is ahead of us. This treatise, though brief,forces the readers into a better religion, and, the highest thoughts being clothed in the happiest and most lucid style have been made all the more accessible to all- even to neophytes like the reviewer". (East Bengal Times, 23.3.1935).

"বরকতুল্লাহ্ সাহেব একজন সুবিখ্যাত দার্শনিক লেখক। এদিক দিয়ে তিনি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য–বোধহয় অদ্বিতীয়ও। আলোচ্য 'মানুষের ধর্ম্মে' তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি।... তাঁর ভাষার

লীলাচাতুর্য্য, চিন্তার গভীরতা, নিপুণ বিশ্লেষণ-শক্তি এ পুস্তকে তাঁর স্বকীয়ত্বকেই প্রমাণিত করেছে। এ পুস্তকখানা বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।" (বুজর-চে-মেহের, মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৩৪২)।

"এই পুস্তকখানি কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধের সমষ্টি; প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলিই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।... প্রবন্ধগুলি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। সর্ব্বত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদের আলোচনা ও তাহাদের তুলনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এমন সুবোধ্য ভাষায় ও সরল ভঙ্গীতে বিষয়গুলি বর্ণিত ইয়াছে যে, পাঠকগণ প্রবন্ধগুলি পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। বিশেষতঃ 'জড়বাদ' ও 'বস্তুরূপ' শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটী অতি উপাদেয় হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান সর্ব্বপ্রকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতগুলির সমন্বয়ে এমন চিত্তাকর্ষকভাবে লিখিত রচনা বাংলা ভাষায় খুব অল্পই প্রকাশিত হয়। লেখকের ভাষায় ফার্সী শব্দের উৎপাত (?) নাই এবং অযথা উচ্ছ্বাসও নাই। ভাষা সর্ব্বত্র সরল, বিষয়োপযোগী ও সুখপাঠ্য।" (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪২)

"মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ সাহেব তাঁহার নব-প্রকাশিত 'মানুষের ধর্ম্ম' পুস্তকখানিতে জড় ও জীবন সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বৈজ্ঞানিক যুগের অতিন্দ্রিয়বাদীদের অনুভাবেই অনেকখানি পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁহার নিজের বিশিষ্ট মানস-কেন্দ্রটির পরিচয় এমন সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন যে, তাহাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার স্বকীয়তা। এক চৈতন্যশক্তিকে তিনি বিশ্ববস্তুর মূলে কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ব্রহ্মাণ্ডের সেই মূল-বস্তু একক। তাঁহার অদ্বৈতবাদ হইতেছে মওলানা রূমীর Mystical monism; Hacckel-এর Scientific monism নয়।" ('সবুজ বাংলা', অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ এবং 'মোয়াজ্জিন', ভাদ্র, ১৩৪২)

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র তৃতীয় গ্রন্থ 'কারবালা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সনে। 'কারবালা' গ্রন্থের শিরোনামের সঙ্গে বন্ধনীতে লেখা আছে ঃ 'কারবালার যুদ্ধ ও নবীবংশের ইতিবৃত্ত'। 'কারবালা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সনে। এ সংস্করণে গ্রন্থের শিরোনাম ঃ 'কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত'। এ সংস্করণের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেন ঃ

"কারবালা গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সনে। তারপর ১৯৬৩ সনে উহা পুনর্মুদ্রিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফর্মাগুলি প্রেস হইতে ডেলিভারী লওয়ার পূর্বেই, ১৯৬৪ সনের জানুয়ারী মাসে, আকস্মিকভাবে আগুনে পুড়িয়া যায়। তাই সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি আবার নূতন করিয়া মুদ্রিত করিতে হইল। ইহাতে সময় লাগিল অনেক।"

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের আমূল সংশোধন, সংযোজন ও বিষয় বিন্যাসের পরিবর্তন সাধিত হয়। 'কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত' শিরোনামে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণ মূলতঃ দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। এটি একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

কিচ্ছা থেকে ইতিহাসকে পৃথক করার উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থটি রচিত। কারবালার বিষাদময় ইতিহাসের ভিত্তিতে আমাদের দেশে সেই মধ্যযুগ থেকেই অসংখ্য কিচ্ছা-কাহিনী রচিত হয়েছে। এসব রচনায় যতটা ভাবাবেগ ও মানবিক সংবেদনার প্রকাশ ঘটেছে, ইতিহাসের দিকে ততটা খেয়াল রাখা হয়নি। এমনকি, উনবিংশ শতকে মীর মশাররফ হোসেন রচিত সুবিখ্যাত ও অতি জনপ্রিয় 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থও এ গতানুগতিক ধারার অনুসরণে রচিত। বরকতুল্লাহ্‌র গ্রন্থটি এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। লেখক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন ঃ

"কারবালার কাহিনী সম্পর্কে একটি কথা উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। কারবালার যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু ভক্তদের লেখনিতে উহার অনেক অতিরঞ্জন ঘটিয়াছে। দীর্ঘ তেরো শত বৎসর ধরিয়া কবি সাহিত্যিকেরা উহার উপর তুলিকা চালাইতে চালাইতে উহাকে উপকথার পর্যায়ে দাঁড় করাইয়াছেন। নানা কাল্পনিক গল্পের অবতারণা দ্বারা মূল কাহিনীকে যথাসাধ্য মর্মস্পর্শী করার চেষ্টা চলিয়াছে। নারীঘটিত প্রণয় কাহিনীও উহাতে সংযোজিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আবদুল জব্বার ও তৎপত্নী যয়নাব সংক্রান্ত কাহিনী নিতান্তই কাল্পনিক। মুহম্মদ হানাফিয়ার যুদ্ধে গমন ও ইয়াযিদের পশ্চাদ্ধাবন ইত্যাদি কিচ্ছারও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।... ইমাম হুসায়েনের কুফা গমনের পূর্বে মুসলিম বিন আকিল কুফায় প্রেরিত হইয়াছিলেন গোপনীয় দৌত্য কার্যে। সেক্ষেত্রে মুসলিমের দুইটি নাবালক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া অস্বাভাবিক। অথচ তাঁহার দুই সুকুমার পুত্রের নিষ্ঠুর হত্যার এক করুণ চিত্র সযত্নে অঙ্কিত করা হইয়াছে পাঠকদের চক্ষুতে অশ্রু আনয়নের জন্য। এই ধরনের বহু অমূলক কিচ্ছা মূল ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ফলে এখন আসল ও নকল পৃথক করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য মূল ইতিহাস হইতে মাল-মসলা সংগ্রহ করিতে আমাকে বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।"

গ্রন্থের প্রথম দিকে লেখকের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা, অতঃপর 'কারবালা যুদ্ধের পটভূমিকা', 'পূর্ব ইতিহাস' ও 'খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল' এসব শিরোনামে লেখক ইমাম বংশ ও কারবালার যুদ্ধের পটভূমি তথ্য ও ইতিহাস-নির্ভর আলোচনার পর মোট ১৭টি অধ্যায়ে কারবালা যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সত্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থটি ইসলামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা। লেখক এখানে সর্বদা নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করেছেন। তবে ভক্তের আবেগ-উচ্ছলতা মাঝে-মধ্যে তাঁর বর্ণনাকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর করে তুলেছে। কাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন ঃ

"পৃথিবীর যুদ্ধ-ইতিহাসে কারবালার যুদ্ধ একটি সামান্য ঘটনা। কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়া উহার গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। উহা শুধু মদীনা, মক্কা ও কুফায় বিপ্লব আনে

নাই, দামেস্কের উমাইয়া রাজবংশের পতনেও উহার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল।...

"আব্বাসীয় বংশের শাসন আমলেও ইমাম বংশের উপর কম অত্যাচার সাধিত হয় নাই। ইমাম হাসানের প্রপৌত্র ইমাম মুহম্মদ (নাফ্সে জাকিয়া) ও ইব্রাহীমের নিধন, হুসায়েন বংশীয় ইমাম মু'সা আল্ কাযিম এবং তাঁহার বংশধরদের মদীনা হইতে নির্বাসন ও বন্দী শিবিরে তাঁহাদের প্রাণত্যাগ ইত্যাদি বহু শোকাবহ ঘটনা কারবালার বিষাদময় কাহিনীর সহিত এক সূত্রে গাঁথা। এইসব কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমনি করুণ। এ জন্য কারবালা কাহিনীর সহিত এইসব ঘটনার বিবৃতি সংযোজিত হইয়াছে। মহানবীর ওফাতের পরবর্তী 'দ্বাদশ ইমামের' কথাও প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

"দুই শতাব্দীরও অধিককাল দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার পর ইমাম বংশ কিভাবে আব্বাসীয় খলিফাদের সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে এবং পরিশেষে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীয় সাম্রাজ্য ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়, সেই বিস্ময়কর কাহিনীর বিবৃতির দ্বারা গ্রন্থের পরিসমাপ্তি টানা হইয়াছে। উপসংহারে আব্বাসীয় শাসনের কিভাবে অবসান হয় এবং বিভিন্ন যুগে খিলাফত কিভাবে এক বংশ হইতে অন্য বংশে হস্তান্তরিত হয় তাহার একটি ধারাবাহিক বিবরণী, কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, জিজ্ঞাসু পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বিবৃত হইয়াছে।"

'কারবালা' গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখক তাঁর ভূমিকায় মোটামুটি ইঙ্গিত দিয়াছেন। লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম সহকারে ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে গ্রন্থের কাহিনী পরম্পরা সাজিয়েছেন। শুধু কারবালার বিষাদময় ঘটনার বিবরণ প্রদানই লেখকের উদ্দেশ্য নয়। কারবালার পটভূমি, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চরিত্র, ঘটনার প্রতিক্রিয়া, পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনাবলী, এমনকি, এর পরবর্তী দু'শো বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাস অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ঐতিহাসিক নির্লিপ্ততার সাথে তিনি বিধৃত করেছেন। তাঁর ভাষা ও বর্ণনার মাধুর্য সবকিছু মিলিয়ে গ্রন্থটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে লেখক প্রধানতঃ দুটি নির্ভরযোগ্য সূত্র অবলম্বন করেছেন। তার একটি প্রসিদ্ধ লেখক সৈয়দ আমীর আলীর A Short History of the Saracens এবং অন্যটি বিখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক অধ্যাপক হিট্টির History of the Arabs. এছাড়া আরো বহু ইংরেজী, উর্দু, বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন তিনি।

এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এর উপর যে আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয় তা থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে দু' একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"যে বয়সে অন্য মানুষ বিশ্রাম ও বৈরাগ্যের কথা ভাবে, অর্জিত সিদ্ধি ও যশের মূলধনেই জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দিতে চায়, সেই বয়সে জনাব বরকতুল্লাহ্‌র এই অভিযান দুঃসাহসিক, এতে কোন সন্দেহ নাই। উল্লেখিত 'কারবালা' গ্রন্থে মননশীল

লেখক কল্পনার প্রলেপে রহস্যময় কারবালার যুদ্ধ ও নবীবংশের ইতিবৃত্তের সঠিক সত্য ও তথ্য নিরূপণে প্রচেষ্ট হয়েছেন এবং এতে সাফল্য লাভ করেছেন বলেই আমার বিশ্বাস।... এ ব্যাপারে তিনি সৈয়দ আমীর আলী, অধ্যাপক হিট্টি, অধ্যাপক এম. খোদাবক্স, স্যার উইলিয়ম মুর, নিকলসন, খাজা হাসান নেজামী, অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন, অধ্যাপক মুহম্মদ ইসহাক প্রমুখের ইংরেজী, উর্দু ও বাংলা 'ইসলামের ইতিহাস' পর্যালোচনায় এর মধ্য থেকে কল্পনা বিবর্জিতভাবে সঠিক ঘটনাকে তুলে ধরেছেন।

"জনাব মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ সুবিখ্যাত দার্শনিক লেখক। তাঁর সারা জীবনের সাহিত্য সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য হইল সত্যনিষ্ঠা, ভাবের গভীরতা আর ভাষার ওজস্বিতা। উল্লেখিত গ্রন্থেও তাঁর নিপুণ বিশ্লেষণী শক্তি তাঁর স্বকীয়ত্বকেই প্রমাণ করেছে।" (তোফাজ্জল হোসেন/ দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা আগস্ট, ১৯৫৮)।

"মোছলেম ইতিহাসের করুণতম কাহিনী কারবালায় এমাম হোছায়েনের শাহাদৎ বরণের সত্য ঐতিহাসিক বিবরণ আলোচ্য 'কারবালা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙলা সাহিত্যে কারবালার করুণ কাহিনী অবলম্বনে এ যাবৎ যত বই প্রকাশিত হইয়াছে, সে-সবের একখানাতেও সম্ভবত আলোচ্য বইয়ের মতো সত্য ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশের চেষ্টা হয় নাই। 'কারবালা' এদিক দিয়া ব্যতিক্রম এবং একক।... শুধু কারাবালা কাহিনী নয়, এ কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত সময়কার আরবের ইতিহাসও ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। হাশেমী ও উমাইয়া গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিহিংসা এর প্রাথমিক ইতিহাস, কারবালায় এই শোচনীয়তম পরিণতি– এসব সুন্দর সাবলীল ভাষায় এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।... বিষয়বস্তু যেমন শোকাবহ, লেখকের ভাষাও তেমনি বলিষ্ঠ ও সাবলীল– ফলে 'কারবালা' পড়িতে উপাখ্যানের মতোই পাঠককে টানিয়া লইয়া যায়। লেখক বইয়ের পরিশিষ্টে কারবালার ঘটনার ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে মিঃ খোদাবক্স ও মিঃ মু'য়ের দুইটি দীর্ঘ মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বইয়ের মূল্য বাড়িয়াছে।" (নূরী/ দৈনিক আজাদ, ২৭ জুলাই, ১৯৫৮)।

"কারবালা প্রান্তরের শোচনীয় ঘটনা ইসলামের ইতিহাসের এক 'বিষাদময়' অধ্যায়।... কারবালার সেই বিষাদময় কাহিনী নিয়ে বাংলাদেশেও অসংখ্য গান গল্পের অভাব নেই। একদিকে যেমন মুক্তাল হোসেন, জঙ্গনামা প্রভৃতি মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য পর্যায়ের বহু পুঁথি কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি 'বিষাদ সিন্ধু'র মতো বৃহৎ কাব্যোপন্যাসেরও জন্ম নিয়েছে। ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে সাহিত্যিক তথ্যের সংমিশ্রণেই কারবালা কাহিনীকে ভিত্তি করে বাংলাদেশে এক বৃহৎ সাহিত্য গড়ে উঠেছে।... আলোচ্য 'কারবালা' গ্রন্থে লেখক ঐতিহাসিক ও গবেষকের দৃষ্টিতে ইসলামের ইতিহাসের সেই বিষাদময় অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেছেন। বরকতুল্লাহ সাহেবের সমগ্র সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রতি তাকালে দেখা যায়, তার পিছনে

একটি দীর্ঘ অধ্যয়ন ও নীরব সাধনা রয়েছে। তাঁর বিদগ্ধতা, দার্শনিকতা গভীর জ্ঞান সাধনা, ভাষার শাণিত দীপ্তি এবং সর্বোপরি তাঁর মনীষাদীপ্ত প্রতিভার স্পর্শ পাঠক শ্রেণীকে মুগ্ধ করে। আর তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাধনার তুলনায় তা কত অকিঞ্চিৎকর, তবে এ অল্প ক'টি গ্রন্থ থেকেই তাঁর সাহিত্যিক পরিমাপ এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন নির্ধারণ করতে অসুবিধা হয় না।" (আল ইসলাহ্, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৪)।

"জনাব বরকতুল্লাহ্ সাহেব চাকুরী জীবনে ন্যায়নিষ্ঠ ও সুবিচারকের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁর এই নূতন 'কারবালা' পুস্তকে ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংবলিত খেলাফত লাভের দ্বন্দ্ব ও কোন্দলের এবং ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের যে সত্যকার ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে এই রূপ ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।..." (আব্দুস সালাম/ দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান, ১৬ জুলাই, ১৯৫৮)।

লেখকের চতুর্থ গ্রন্থ 'নবীগৃহ সংবাদ' প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। মাসিক 'সওগাত' পত্রিকার ফাল্গুন, ১৩৩২, বৈশাখ, ১৩৩৪ এবং জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সংখ্যায় মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ বিবি খাদিজা (রা) সম্পর্কে ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধগুলির ভিত্তিতেই এ গ্রন্থ রচিত। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেন ঃ

"বাংলা ১৩৩৩-৩৪ সনে বিবি খাদিজা সম্বন্ধে আমার কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ মাসিক সওগাতে প্রকাশিত হয়।... খাদিজা চরিত্র অঙ্কিত করিলে নবী চরিত্র সে আলেখ্যে আপনা আপনি আসিয়া পড়ে কেননা দুইটি চরিত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার নবী চরিতের অর্থই ইসলামের ক্রমবিকাশের কাহিনী। তাই নবী চরিত্রের সঙ্গে ইসলামের ক্রমবিকাশও এই প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

"নবী চরিত্র বাদ দিয়া প্রথমে খদিজা চরিত্র কেন লিখিয়াছিলাম, তার কারণ, নবী চরিত্র সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তথা বাংলা ভাষাতেও, অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কিন্তু খদিজা চরিত্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা এ যাবৎ খুব অল্পই হইয়াছে। অথচ নবী চরিত্রের বিকাশ এবং ইসলামের উন্মেষ ব্যাপারে খদিজার অবদান অবিস্মরণীয়। বিভিন্ন জাতির যত নারী চরিত্র পাঠ করিয়াছি তার মধ্যে খদিজার চরিত্র, প্রগাঢ় স্বামী ভক্তি ও অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ যে কোনও যুগে নারী সমাজের আদর্শ স্থানীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

'নবীগৃহ সংবাদ' গ্রন্থে লেখক আরবজাতির ইতিহাস, এর ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক অবস্থা, বিভিন্ন যুগে এর সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, এর ঐতিহ্যিক পরিচয়, বিভিন্ন নবী-রাসূলদের আগমন, মহানবীর (স) আবির্ভাব, ইসলামের ক্রমবিকাশ, মহানবী (স) ও ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার সাথে বিবি খদিজার (রা) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, মক্কায় মহানবীর (স) সংগ্রাম-জীবন ও সে সাথে মহানবীর (স) পারিবারিক

জীবনের পরিচয় গভীর পাণ্ডিত্য ও ঐতিহাসিক নির্লিপ্ততা ও সত্যনিষ্ঠতার সাথে লেখক এতে ফুটিয়ে তুলেছেন। বইটি সম্পর্কে একটি পত্রিকার অভিমত ঃ

"আলোচ্য বইটিতে লেখক নবীর জীবনের শৈশব থেকে শুরু করে নবীর মদীনা প্রস্থান পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মূলতঃ নবী জীবন ও নবী পরিবারকে কেন্দ্র করে বইটি লিখিত হলেও প্রাসঙ্গিকভাবেই তৎকালীন মক্কার সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক এতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ইসলামের ত্বরিৎ ক্রমবিকাশে বিবি খদিজার মহৎ অবদান এবং তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য সম্পর্কে লেখকের সাবলীল ও অনাড়ম্বর বর্ণনা বইটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

"ইসলামের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশে মহৎ অবদানের জন্যই শুধু নয়, স্বীয় চারিত্রিক মাধুর্য, পতিভক্তি এবং আদর্শনিষ্ঠার জন্য বিবি খদিজা মানুষের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। গৃহিনী হিসাবেও তিনি বিশ্বের ইতিহাসে আদর্শ স্থাপন করে গেলেন।

"জনাব বরকতুল্লাহ্ সাহিত্যিক। তাই তিনি ঐতিহাসিক সত্যকে অক্ষুণ্ন রেখেও সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর ভাষার একটা সাবলীল গতিছন্দ ও মাধুর্য লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের প্রবন্ধধর্মী জীবনী গ্রন্থের জন্য বলিষ্ঠ শব্দ একান্ত প্রয়োজন। জনাব বরকতুল্লাহ্ শব্দচয়নের এই দিকটি সম্পর্কে সচেতন।" (দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৬০)

"নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ" মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্র পঞ্চম গ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সনে। গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক এ গ্রন্থ লেখার পটভূমি এবং এতে বিধৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেন ঃ

"ত্রিশ বৎসর আগের কথা। কতিপয় সাহিত্যামোদী ব্যক্তি আমার পারস্য প্রতিভা পাঠ করার পর আমাকে প্রাঞ্জল ভাষায় একখানি নবী-চরিত্র লিখিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি আত্মজিজ্ঞাসা হইতে উপলব্ধি করিলাম, নবী-চরিত্রের আসল স্বরূপ আমার বোঝা হয় নাই। তারপর পড়িয়াছি যথাসাধ্য এবং শুনিয়াছি বিস্তর। কিন্তু এখনও সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের সকল দিক সম্যক বুঝিয়াছি এ দাবী করিতে পারি না। বিষয়টি বাস্তবিকই দুরূহ। তবে যতটুকু বুঝিয়াছি সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম। হয়ত, আমার দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল অকিঞ্চিৎকর হইলেও কাহারও কিছু কাজে লাগিতে পারে।"

"নবীকে বুঝিতে হইলে শুধু তাঁহার পারিবারিক জীবন এবং তাঁহার পত্নীগণের সহিত তাঁহার দৈনন্দিন আচরণ, ইত্যাদি সম্বন্ধেও অবগত হওয়া দরকার। নবী-চরিত্রের স্ফুরণে তাঁহার পত্নীগণের বিশিষ্ট অবদান রহিয়াছে। ইহারা সকলেই ইতিহাস-কীর্তিতা রমণী। তাই নবী-চরিত্রের বিবৃতির সহিত এই সকল মহিলার, বিশেষ করিয়া অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী বিবি আ'য়িশার, ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক সৌন্দর্য এবং নবীর কর্তব্যকার্য সম্পাদনে তাঁহাদের সহযোগিতার বিবরণও যথাসাধ্য দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

"চরিত্র চিত্রণে কল্পনার আশ্রয় লওয়া চলে না। শুধু লিখিত-দস্তাবেজ এবং পূর্বসূরীদের গবেষণা-প্রসূত প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করিতে হয়। আমিও তাহাই করিয়াছি এবং যথাস্থানে তাহা সাধ্যমত উল্লেখ করিয়াছি। বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ আল্ কুরআনের সূরাসমূহেরও যথাসম্ভব সাহায্য লইয়াছি।

"নবী-জীবন সংক্রান্ত আমার অপর গ্রন্থ 'নবীগৃহ সংবাদ' বর্তমান গ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র। উহা মূলতঃ বিবি খদিজার আত্মত্যাগ ও সেই সঙ্গে নবীর সাধনা-জীবনের ইতিহাস। বর্তমান গ্রন্থ নবীর সৃষ্টি ও বহুমুখী কর্মজীবনের ইতিবৃত্ত। দুইটি গ্রন্থের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।"

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ তাঁর এ গ্রন্থের ভূমিকায় এর বিষয়বস্তু ও মূল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। এটা তাঁর এক অসাধারণ নৈপুণ্য। এখানে তার কিছুটা নমুনা পেশ করছি ঃ

"হযরত মুহম্মদের (স) জীবন-কাহিনী আরবের নবধর্ম ও নয়াজাতির উত্থানের বিচিত্র ইতিহাস।... দুর্নীতি, দলীয় বিদ্বেষ, অত্যাচার, অবিচার ও প্রবল কর্তৃক দুর্বলের শোষণ দ্বারা জাতি যখন উৎসন্ন যাইতেছিল, মদ, জুয়া, সূদ ও অবাধ নারী সম্ভোগ যখন সমগ্র জাতির অন্তঃসার নিঃশেষিত করিতেছিল, ভাই হইয়া ভাই-এর বুকে ছুরিকা বিদ্ধ করিতেছিল, মানুষ পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বাজারে বিক্রীত হইতেছিল এবং তাহারা মনিব-গৃহে পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছিল, এবং পৃথিবীর পুরাতন ধর্মসমূহ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময় আরব জাতির, তথা সমগ্র মনুষ্য জাতির, পাপভার হরণের জন্য মক্কায় আবির্ভূত হইলেন মহামানব হযরত মুহম্মদ (সঃ)।

"তিনি এই অধঃপতিত জাতিকে দিলেন ধর্ম, নীতি এবং পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস।... নবী মুসলিমদিগকে শুধু ধর্ম, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; তাহারা যাহাতে সম্মানের সহিত দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তারও ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। তিনি তাহাদিগকে দিলেন সামরিক শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা এবং আত্মপ্রত্যয়।... মহান নবীর অবদানের এখানেই শেষ নয়। তিনি সমাজ হইতে দুর্নীতি দূরীভূত করার জন্য সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিলেন, বিচার ও ইনসাফকে দিলেন ধর্মের মর্যাদা এবং ন্যায়নীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে নূতন রাষ্ট্রনীতি গড়িয়া দিলেন। নবীর সৃষ্ট নয়াসমাজে অভিজাত বা পুরোহিত বলিয়া কোনও বিশিষ্ট সমাজ থাকিল না। যোগ্যতা থাকিলে আযাদ ক্রীতদাসও খলিফা হইতে পারিবে, ইহাই ছিল নবী-প্রদত্ত বিধান। নবী নারী জাতিকে দিলেন আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্ব। ক্রীত দাস-দাসীদিগকে মুক্তিদানের পথ তিনি উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।... তিনি এই নয়াজাতিকে শুধু শক্তিমন্ত্রে নয়, কর্মযোগেও দীক্ষা দিয়া তাহাদের ভিতর জাগ্রত করিলেন অদম্য জ্ঞান ও কর্মস্পৃহা, যার ফলে তাহারা গ্রীক দর্শন, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যামিতি ইত্যাদি শাস্ত্র মন্থন করিয়া পৃথিবীর জ্ঞানগুরুর আসন অলংকৃত করিয়াছিল এবং ভৌগোলিক বিজয়ের বহু পূর্বেই

মনোরাজ্যের দিক দিয়া পৃথিবী জয়ে সক্ষম হইয়াছিল।... এই নয়া জাতি শুধু পৃথিবীর ভিতর বৃহত্তর সাম্রাজ্য গড়িতেই সমর্থ হয় নাই, তাহারা পৃথিবীকে উন্নত সভ্যতা, মার্জিত রুচি এবং বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা দিতেও সমর্থ হইয়াছিল। কেননা তাহাদের ধর্মে রহিয়াছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের এক অপূর্ব সমন্বয়।"

'নবীগৃহ সংবাদে' লেখক যেখানে মহানবীর (স) মক্কী জীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন, 'নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ'-এ সেখানে মহানবীর (স) মদ্‌নী জীবন, বিভিন্ন জেহাদ, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও আল্ কুরআনের ভিত্তিতে এক আদর্শ ও অতুলনীয় রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে লেখক ইসলামের সাথে অন্যান্য সকল বৃহৎ ধর্মের ও মহানবীর (স) সাথে অন্য সকল বিশিষ্ট ধর্ম-প্রচারকদের তুলনামূলক আলোচনা করে অন্য সকল ধর্ম ও তার প্রচারকদের মুকাবিলায় ইসলাম ও মহানবীর (স) অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। উপরোক্ত গ্রন্থ দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর সম্পূরক। একটিতে মহানবীর (স) মক্কী জীবন অন্যটিতে মদ্‌নী জীবনের বিবরণ রয়েছে। দুটি মিলে মহানবীর (স) সম্পূর্ণ জীবনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এ দুটি গ্রন্থেই গভীর অধ্যবসায় সহকারে ইতিহাসকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী কীভাবে আরবের জাহিলিয়াতের যুগে জন্মগ্রহণ করে নবুওত প্রাপ্তির পর শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে ধীরে ধীরে একটি আদর্শ সমাজ ও নতুন মহান রাষ্ট্র গঠন করলেন এতে তার অতুলনীয় বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা রয়েছে। আজকের অন্ধকারাচ্ছন্ন, পাপময়, দুরাচারগ্রস্ত অশান্ত পৃথিবীতে এ গ্রন্থটি এক আদর্শ, শান্তিপূর্ণ, কল্যাণময় সমাজ ও পৃথিবী গড়ার অনুপ্রেরণা প্রদানে সক্ষম। মহানবীর (স) সর্বোত্তম আদর্শ জীবন কোন একটি বিশেষ সমাজ, ধর্ম বা যুগের জন্য নয়, তিনি সর্বকালের সকল মানুষ ও জাতির চির অনুসরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ। 'নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মোহাম্মদ (স)' গ্রন্থে লেখক সে কথাই ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গ্রন্থের জন্য তিনি 'দাউদ পুরস্কার' লাভ করেন।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর ষষ্ঠ গ্রন্থ 'হযরত ওসমান' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সনের জুন মাসে। এ গ্রন্থের শুরুতে 'লেখকের নিবেদন' শিরোনামে গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

"... হযরত ওসমানের জীবনী সঙ্কলনের জন্য আমি যখন কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ড (পরে বাংলা একাডেমীর সাথে একীভূত) কর্তৃক আদিষ্ট হই তখন ভাবি নাই এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভবপর হইবে।... খুলাফায়ে রাশেদীনের ভিতর হযরত ওসমানের জীবনী যে সর্বাপেক্ষা দুরূহ কার্য, তাহা অভিজ্ঞ পাঠককে বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সম্বন্ধে সমসাময়িক লেখকগণের ঔদাসীন্য খুবই সুস্পষ্ট। পরবর্তীকালেও তাঁহার সম্বন্ধে গবেষণা অল্পই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার স্বগোত্র উমাইয়াগণ তাঁহার শাহাদৎকে মূলধন করিয়া নিজেদের রাজনৈতিক উত্থানের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার

নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করেন নাই।... পরবর্তী আব্বাসীয় যুগ অবশ্য গবেষণা ও জ্ঞান-চর্চার যুগ ছিল; কিন্তু সে যুগেও হযরত ওসমান সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজ সম্যক আলোকপাত করেন নাই। গ্রন্থপঞ্জীর এই প্রকার দুর্ভিক্ষবশতঃ আমাকে ইতিহাসের নানা অন্ধিসন্ধি হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইয়াছে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য... মোটামুটি যে কয়খানি প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর আমি নির্ভর করিয়াছি, সেগুলি হইল ঃ সৈয়দ আমীর আলী প্রণীত A Short History of the Saracens, অধ্যাপক পি. কে. হিট্টীর রচিত, The Arabs, মু'য়র প্রণীত Annals of the Early Caliphate, আর. এ. নিকলসনের Literary History of the Arabs, ডক্টর তোহা হোসেন (মিসরী) প্রণীত 'হযরত ওসমান'-এর মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ কৃত বঙ্গানুবাদ এবং মৌলানা হাজী মঈনউদ্দীন প্রণীত (উর্দু) খুলাফায়ে রাশেদীন। এই সব ছাড়া, রোমক-শক্তির সহিত মুসলিমদের সংঘর্ষের বেলায় গীবনেরও সাহায্য লইয়াছি। মু'য়র নির্ভর করিয়াছেন সাধারণতঃ তাবারী ও বালাজুরীর ইতিহাসের উপর। কাজেই আমার গ্রন্থে এ দুই প্রসিদ্ধ আরব-ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব পড়িয়াছে।"

লেখকের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এ গ্রন্থ রচনার পটভূমি ও বিভিন্ন তথ্য-সূত্রের উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তিনি এর রচনায় কতটা সনিষ্ঠ ছিলেন। ইংরেজী, আরবী, উর্দু, বাংলা বিভিন্ন ভাষার নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সেদিক থেকেই ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান বিন আফ্ফানের (রা) উপর রচিত বাংলা ভাষায় এটিই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। লেখকের রচিত এটিই সর্বশেষ গ্রন্থ। এরপর তিনি আরো কিছু বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কিন্তু গ্রন্থ হিসাবে এটাই তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ। হযরত ওসমান সম্পর্কে লেখক গ্রন্থের শুরুতেই এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"মক্কার লোকেরা বলিত, কেহ যদি দুনিয়ায় হযরত ইউসুফের রূপরাশি দেখিতে চায়, তাহাকে আফ্ফানের পুত্র ওসমানের দিকে তাকাইতে বল। ওসমান শুধু রূপেই অনিন্দ্যসুন্দর ছিলেন না, গুণেও কুরাইশ-যুবকদের ভিতর তাঁহার তুলনা ছিল বিরল। ফুলের মত সুকুমার দেহ এবং শিশিরের মত শুচিশুভ্র মন লইয়া তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ সওদাগর আফ্ফানের গৃহ আলোকিত করিয়াছিলেন। পিতা-মাতা স্বগৃহে তাঁহার বাল্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেকালে মক্কায় স্কুল-মাদ্রাসার অভাব ছিল। ধনীর সন্তানেরা নিজ নিজ গৃহেই লেখাপড়া শিখিত। ব্যবসায়ের জন্য বেশী লেখাপড়ার প্রয়োজন হইত না। হযরত ওসমান ঘরে বসিয়া মোটামুটি ভালো লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।"

লেখক তাঁর স্বভাবসুলভ কবিত্বময় বর্ণনায় হযরত ওসমানের দৈহিক ও চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে ঃ

"হযরত ওসমান বাল্য বয়সেই পিতৃহারা হন। তৎপর তিনি পিতৃব্য হাকামের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর ওসমান পিতৃব্যের

সহযোগিতায় বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। এবং বিদেশ গমন আরম্ভ করেন। এই প্রিয়দর্শন ব্যবসায়ীর কমনীয় কান্তি, অমায়িক ব্যবহার দেশে ও বিদেশে পণ্যের বাজারে তাঁহার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিত। তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে রাবীগণ এইরূপ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ দেহ নাতিদীর্ঘ, নাতিস্থূল ও সুঠাম মুখমণ্ডল লাবণ্যময় ও কমনীয়; বর্ণ সুপক্ক গমের মত হরিদ্রাভ, আবার কাহারও কাহারও মতে শ্বেত-রক্তাভ। উচ্চতা মধ্যমাকৃতি, নাসিকা উন্নত, দেহ মাংসল, তদুপরি গুটিকার দাগ। শ্মশ্রু ঘন-বিন্যস্ত ও দীর্ঘ। মস্তকের কেশ গ্রীবাদেশ পর্যন্ত লম্বিত। রক্তিম ওষ্ঠাধরের পশ্চাতে শুভ্র দন্তপাঁতি, সর্বোপরি তাঁহার নীলাভ আয়ত চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি– সমস্ত মিলিয়া দর্শকমাত্রকেই মোহিত করিত। চরিত্রের দিক দিয়া হযরত ওসমান বাল্যকাল হইতেই সংযমী, সত্যনিষ্ঠ এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কখনও মদ্যপান করিতেন না এবং কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইতেন না।

"তিনি লাজুক স্বভাব ও বিনয়ী ছিলেন। কাহাকেও কষ্ট দেওয়া তিনি সহিতে পারিতেন না। এই সকল গুণরাশি তাঁহাকে যুব-সমাজে আদর্শ-স্থানীয় করিয়াছিল। বয়স্কদের নিকটও তিনি অতি আদরের পাত্র ছিলেন।... ইসলামের আহ্বানে মক্কায় প্রথম যে চল্লিশ ব্যক্তি তৌহিদে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাহাদেরই ভিতর ছিলেন এই হযরত ওসমান (রা)।"

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) নানা গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, দানশীল, ধর্মভীরু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি যেমন ধনী ছিলেন, তেমনি ছিলেন দাতা। এ জন্য তাঁকে 'গনী' বলা হতো। মহানবীর (স) দুই কন্যা– রোকাইয়া (রা)-কে প্রথমে এবং তাঁর মৃত্যুর পর উম্মে কুলসুমকে (রা) বিয়ে করার জন্য তাঁকে 'জুন্নুরাইন' অর্থ্যাৎ যুগল নূরের অধিকারী বলা হতো। তিনি ছিলেন অতি সরল প্রকৃতির মহৎ ব্যক্তি। তাঁর সরলতার সুযোগে তাঁর খিলাফতকালে তাঁর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই নানারূপ সুযোগ-সুবিধা আদায় করে। এ কারণে অন্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। পরিণামে তাঁকে শাহাদত বরণ করতে হয়। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ এসব বিষয় অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণার অপনোদন ঘটিয়েছেন। মোট পঁচিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত ২৩৫ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি অতিশয় সুখপাঠ্য।

'বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারা' নামে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর ১৮ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা 'সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ' ১৯৬৯ সনের অক্টোবরে প্রকাশ করে। এটি মূলতঃ একটি অভিভাষণ। ১৯৪৩ সনের ৮ ও ৯ মে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি'র সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসাবে তিনি এ অভিভাষণটি পাঠ করেন। কলকাতা ইসলামিক হলে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন কবি সৈয়দ এমদাদ আলী। এটি 'ছায়াবীথি' নামক পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয়। পুস্তিকাকারে প্রকাশের পূর্বে লেখক এতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন।

এছাড়া, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর আরো কয়েকটি মূল্যবান অভিভাষণ, প্রবন্ধ ও কতিপয় কবিতা রয়েছে। তাঁর অপ্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ হলো ঃ 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন', 'ডাঃ লুৎফর রহমান' ও 'নবযুগের আহ্বান'। 'জীবন স্মৃতি' নামে তিনি একটি স্মৃতিকথা লেখা শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে গভীর পাণ্ডিত্য, দার্শনিক চিন্তা, নিরপেক্ষ তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও পরিচ্ছন্ন চিন্তা-ভাবনার পরিচয় মেলে। তাঁর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সাবলীল, অলংকারময় ও প্রসাদগুণসম্পন্ন।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ একজন মননশীল সাহিত্যিক। দার্শনিক প্রজ্ঞা, ইতিহাস-সচেতনতা, গভীর ধর্মবোধ, সত্য-সন্ধিৎসা ও বুদ্ধিদীপ্ততা তাঁর গদ্য রচনাকে দিয়েছে অপরিসীম মহিমা, সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য। দর্শনের ছাত্র হিসাবে দর্শনের চর্চা ও দার্শনিক প্রজ্ঞা ছিল তাঁর সহজাত। পারিবারিক পরিবেশ থেকে এবং আশৈশব সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে ধর্ম-কর্ম পালনের ফলে তাঁর ধর্মবোধও ছিল একান্ত সহজাত। তাঁর ইতিহাস-চেতনার পটভূমি সম্পর্কে বলা যায়, শৈশব-কৈশোর এমনকি, যৌবনেও তিনি পুঁথি পাঠ শুনতেন গভীর আগ্রহের সাথে। সেকালে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই রাত্রি বেলা পুঁথি পাঠের আসর বসতো। তিনি সে আসরে শরীক হয়ে গভীর মনোযোগের সাথে পুঁথি পাঠ শুনতেন। পুঁথির কাহিনী মূলতঃ ইতিহাস-ভিত্তিক। ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন খ্যাতনামা চরিত্র, পীর-পয়গম্বর, শহীদ-গাজী, বীর যোদ্ধাদের পূত জীবন-কাহিনী ও বীরত্বব্যঞ্জক বর্ণনা শুনে তাঁর মধ্যে ইতিহাস-প্রীতির সঞ্চার ঘটে।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর গদ্যের ভাষা একদিকে যেমন সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, ভাব-গম্ভীর ও প্রসাদ গুণসম্পন্ন অন্যদিকে তেমনি উচ্ছ্বাসময়, অলংকারবহুল, শব্দ-ঝংকার ও ব্যঞ্জনায় অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। উচ্চ দার্শনিক ভাব তাঁর বর্ণনাকে কখনো দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় করে তোলেনি। সালংকার উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনায় কাব্যিক ছন্দময়তা থাকলেও তা কখনো তাঁর মননশীলতা ও ইতিহাস-চেতনাকে ক্ষুণ্ন করেনি। তাঁর গভীর ধর্মবোধ তাঁর লেখাকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন করেনি। ধর্ম প্রকৃতপক্ষে মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন, মহৎ ও উদার হতে শিক্ষা দেয়। তাঁর ধর্মবোধ তাঁকে মহৎ, উদার ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনে প্রেরণা যুগিয়েছে। ফলে এক উদার, মহত্তম মানবিক চেতনা সর্বদা তাঁকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে, মিথ্যা থেকে সমুজ্জ্বল দীপ্তির পথে, সংকীর্ণ গোঁড়ামী ও কুসংস্কার থেকে চিরন্তন মানবতার পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মূলতঃ তিনি যে ধর্মের অনুসারী ছিলেন, সে ধর্ম কোন গতানুগতিক ধর্ম নয়, সেটা হলো আল্লাহর দেয়া এক সর্বজনীন, চিরন্তন, সম্পূর্ণাঙ্গ কল্যাণময় জীবন-বিধান। সে কারণেই তাঁর ধর্মবোধ, দার্শনিক প্রজ্ঞা ও ইতিহাস-চেতনা হয়েছে সুস্পষ্ট, সত্যাশ্রয়ী ও মানবিক মহত্তম কল্যাণ-চেতনায় সর্বদা দীপ্যমান। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তাঁর লেখার মধ্যেও তেমনি তা সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তাঁর লেখা হয়েছে সাবলীল, স্বচ্ছ

স্রোতধারার ন্যায় মানবিকবোধসম্পন্ন ও সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকট গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয়। জনৈক সমালোচকের ভাষায় ঃ

"মানুষের মনন-জগতেই বেশী বিচরণ করেছেন বরকতুল্লাহ। কিন্তু পাণ্ডিত্য কিংবা চিন্তার গাম্ভীর্য কখনো আড়ষ্টতা সৃষ্টি করতে পারেনি তাঁর বক্তব্যে। তাঁর গদ্য আশ্চর্যজনকভাবে ঋজু, সাবলীল এবং শক্তিমান। ভাষার সৌকর্য আর শিল্প-গুণে বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্যিকদের প্রথম কাতারে তাঁর স্থান। গোটা বাংলা সাহিত্যেই এদিক থেকে তিনি কৃতি পুরুষ।" (বরকতুল্লাহ ও তাঁর পারস্য প্রতিভাঃ সানাউল্লাহ নূরী)।

আরেকজন সমালোচকের ভাষায় ঃ "অপরূপ কলাসৌন্দর্যমন্ডিত ক্লাসিকধর্মী পদ্য ভাষায় পারস্যের বিশ্রুতনামা কবি-দার্শনিকদের জীবন কৃতির প্রকাশ ও দর্শনের গহনলোকে জীবন-জগতের স্বরূপ সন্ধান আমাদের সাহিত্যে তাঁকে অমরতা দিয়েছে।... তাই লেখক হিসাবে তাঁকে চিহ্নিত করা যেতে পারে একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক পরিচয়ে।" (ড. হাবিব রহমান/মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ)।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর সাহিত্য প্রতিভার পূর্ণ পরিণত রূপ পরিলক্ষিত হয়। ইতোমধ্যে বাংলা গদ্য সাহিত্য নানা দিক দিয়ে সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোট গল্প, রম্য রচনা, নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায় বাংলা গদ্য যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করে। ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই বাংলা গদ্য ধীরে ধীরে নানা পর্যায় অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে একটি পরিণত, সমৃদ্ধ পর্যায়ে উপনীত হয়। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত এক্ষেত্রে যাঁদের অবদান আমাদের গদ্য সাহিত্যকে বিশেষ মর্যাদায় সমুন্নত করেছে তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪–১৮৩৩), প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪–১৮৯৪), দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮১৭–১৯০৫), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০–১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৮৯৯), ভুদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০–১৮৭৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮–১৯১১), কাজেম আল কোরাইশী ওরফে কায়কোবাদ (১৮৫৮–১৯৫১), মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন (১৮৬০–১৯২৩), মোজাম্মেল হক (১৮৬০–১৯৩৩), মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ (১৮৬১–১৯১৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১), মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ (১৮৬২–১৯৩৩), রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪–১৯১৯), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮–১৯৪৬), আব্দুল করীম সাহিত্য-বিশারদ (১৮৬৯–১৯৫৩), মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫–১৯৫০), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬–১৯৩৭), মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৭৭–১৯৬৬), বেগম রোকেয়া সাখাওয়ত হোসেন

(১৮৮০-১৯৩২), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), একরাম উদ্দিন (১৮৮২-১৯৩৫), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), মোহিত লাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), ডাঃ লুৎফর রহমান (১৮৯১-১৯৩৭), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪), বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৫-১৯৫১), কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৫- ?), এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) প্রমুখ। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ তাঁর উপরোক্ত পূর্বসূরী ও সমসাময়িক বিশিষ্ট গদ্য-লেখকদের কাতারে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

ড. হাবিব রহমান তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বলেন ঃ "(মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর) প্রবন্ধগুলোতে সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটলেও সেগুলোর কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে মুসলিম সমাজ। এদিক থেকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বরকতুল্লাহকে উনিশ শতকের 'সুধাকর দল' এর একজন মননশীল উত্তরসূরী হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।"

তাঁর এ বিশেষ মানস-প্রবণতা সম্পর্কে ডক্টর সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেনঃ "এ যুগের আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বাঙালী মুসলমানের কাছে বরকতুল্লাহ একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের বাণী নিয়ে উপস্থিত। তাঁর সাহিত্য সাধনা মুসলমানের জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হতে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি তাদের চিন্তার দিগন্ত প্রসারণের পথেরও ইঙ্গিত দিয়েছে।"

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ প্রধানতঃ জীবনীমূলক ও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে এ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এটা একটি অতি সমৃদ্ধশালী ধারা। মধ্যযুগে এটা ছিল কাব্যে, উনবিংশ শতক থেকে বাংলা গদ্যেও এ ধারার বিশেষ উৎকর্ষ ঘটে। উনবিংশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্য-লেখক মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাস জাতীয় রচনা। বাংলা সাহিত্যে এটা এক অনন্য সৃষ্টি এবং সম্ভবতঃ সর্বাধিক পঠিত অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ। কিন্তু ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত হলেও ঐতিহাসিক সত্যতা এতে পুরাপুরি রক্ষিত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্রসহ যাঁরাই ঐতিহাসিক উপন্যাস বা কাহিনীমূলক রচনা লিখেছেন তাঁরা সকলেই কম-বেশী ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েছেন। কেউ এ বিকৃতি ঘটিয়েছেন ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আর কেউ কল্পনার রঙ মিশিয়ে কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রথমোক্তদের শীর্ষে আর মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন শেষোক্তদের অগ্র সারিতে। এক্ষেত্রে মহাকবি কায়কোবাদ ছিলেন বিরল ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে, বিশেষতঃ তাঁর মহাকাব্য 'মহাশ্মশানে' যথার্থ ইতিহাস-সচেতনার উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান

করেছেন। এক্ষেত্রে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ মহাকবি কায়কোবাদকেই অনুসরণ করেছেন। তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও উদার দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক সত্যকে উদ্ধার করার প্রয়াস পেয়েছেন। ইতিহাসের নামে কল্পকাহিনী নয়; প্রকৃত ঘটনা ও সত্যকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা সাহিত্যিক মান ও উৎকর্ষতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন, যে কাজটি নিঃসন্দেহে অতি দুরূহ। তিনি সেই দুরূহ কর্মটিই তাঁর সহজাত প্রতিভা ও নৈপুণ্যে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর রচনা ইতিহাস পদবাচ্য না হয়ে যথার্থ সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। তিনি গদ্য-রচয়িতা ছিলেন কিন্তু তাঁর ভাষা ও বর্ণনা কাব্যময়, অনুপম সৌন্দর্য সুষমায় ভরপুর। সুনির্বাচিত শব্দের সুললিত ধ্বনি ও সুমধুর ব্যঞ্জনা অসাধারণ প্রসাদ গুণে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর গদ্যের ভাষা হয়ে উঠেছে কাব্য-সৌন্দর্যে অপরূপ।

১৯৬০ সনে বাংলা একাডেমী প্রথম যে বছর সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করে, সে বছরই মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ 'বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার' (প্রবন্ধ শাখা) লাভ করেন। ১৯৬২ সনে তিনি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'সিতারাই-ইমতিয়াজ' খেতাব ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৬৩ সনে তিনি তাঁর 'নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ' গ্রন্থের জন্য 'দাউদ পুরস্কার' পান। ১৯৭০ সনে তিনি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'প্রেসিডেন্ট মেডাল ফর প্রাইড অব পারফরম্যান্স' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৪ সনে তাঁকে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার' (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

১৯৭৪ সনের ২রা নভেম্বর মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ইন্তিকাল করেন।

তথ্য সূত্র ঃ

১. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ রচনাবলী, সম্পাদনা-মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, প্রকাশক–বাংলা একাডেমী, ঢাকা
২. বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান
৩. সিরাজগঞ্জের কৃতিসন্তান, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩
৪. বরকতুল্লাহ ও তাঁর পারস্য-প্রতিভা, সানাউল্লাহ নূরী
৫. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, ড. হাবিব রহমান

নজরুলের বিদ্রোহী-সত্তার স্বরূপ

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম "বিদ্রোহী কবি" হিসাবে সমধিক পরিচিত। সুবিখ্যাত "বিদ্রোহী" কবিতার বিজয় নিশান উড়িয়ে প্রলয়ংকরী ঝড়ের মত যেদিন তিনি বাঙলা সাহিত্য-গগনে অকস্মাৎ আবির্ভূত হলেন, সেদিন থেকেই বিদ্রোহীর বর-মাল্য তাঁর চির লগ্ন হয়ে আছে। কবির বিদ্রোহী সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে কবির নিজের বক্তব্য ঃ

"বিদ্রোহী মানে কাউকে না মানা নয়, বিদ্রোহ মানে যেটা বুঝি না তাকে মাথা উঁচু করে বুঝিনা বলা। তোমার মন যা চায়, তাই কর। ধর্ম, সমাজ, রাজা, দেবতা, কাউকে মেন না। সত্যকে জানবার জন্য বিদ্রোহ চাই। নিজেকে শ্রদ্ধা প্রশংসার লোভ থেকে রেহাই দেওয়া চাই।... বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ যদি করতে পার, প্রলয় যদি আনতে পার তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই, কল্যাণ আসবেই।"

যে কোন নতুন সৃষ্টির জন্য চাই বিদ্রোহ। বিদ্রোহের প্রলয়-বেগে জরা-জীর্ণতা নিশ্চিহ্ন হয়ে নতুন সৃষ্টির উন্মুখরভা আসে। তাই অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ও শক্তিধর প্রতিভা ছাড়া বিদ্রোহ করা সম্ভব নয়। নজরুল অত্যন্ত শক্তিধর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সন্দেহ নেই; তবে আত্মবিশ্বাসী হিসাবে তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয় সঙ্গত কারণেই। কারণ নজরুলের বিশ্বাসের কেন্দ্র-বিন্দু সর্বদা একস্থানে সংবদ্ধ থাকেনি, তাঁর অস্থিরচিত্ততা, অতিমাত্রার আবেগ ও সংবেদনশীলতা ঋতু-বদলের মতোই তাঁর বিশ্বাসের কেন্দ্র-বিন্দু পরিবর্তনে নিয়ত তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। পরিবর্তনশীলতাকে যদি জগতের নিয়ম বলা হয়, তাহলে নজরুল হয়ত সে নিয়মেরই অধীন ছিলেন এবং তাঁর সৃজনশীলতার আত্যন্তিক বিকাশ ও বিচিত্র বর্ণাঢ্য প্রকাশ ঘটেছে এ পরিবর্তনশীলতার মধ্যেই। তবে বিশ্বাসের নির্দিষ্ট কেন্দ্র-বিন্দুতে সর্বদা স্থিতধী হতে না পারলেও নজরুল যখন যেটা ধারণা করেছেন তখন সেটা ঐকান্তিক একাগ্রতার সাথেই ধারণ করেছেন। তাই বলা যায়, বিশ্বাসের কেন্দ্র-বিন্দু

কখনো পরিবর্তিত হলেও তিনি যখন যেটাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তখন সেটাতে তাঁর বিশ্বাস হয়েছে নিটোল, নিখাদ ও আত্যন্তিক অন্তরঙ্গতায় উজ্জ্বল। মূলতঃ এটা না হলে বিদ্রোহী হওয়া যায় না। নজরুল বিদ্রোহের ধ্বজা তুঙ্গে ধারণ করেছিলেন তাঁর প্রতিভা ও এ ধরনের আত্যন্তিকতার জোরেই।

ইংরেজী সাহিত্যে বায়রন, শেলী, কীট্স প্রমুখ অমর কবিদের কাব্যে কোন না কোনভাবে বিদ্রোহের সুর অনুরণিত। মূলতঃ তাঁদের বিদ্রোহ ছিল জীবন ও জগতকে উপলব্ধির ক্ষেত্রে। তাঁরা সকলেই ছিলেন রোমান্টিক কবি। রোমান্টিসিজমের মধ্যে আসলে এক ধরনের বিদ্রোহ লুকিয়ে থাকে। সে অর্থে তাঁদের কবি-সত্তার মধ্যে বিদ্রোহের অনুভব লুকিয়ে ছিল। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আগে মাইকেল মুধসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর প্রমুখের মধ্যেও কোনও না কোন ধরনের বিদ্রোহের ভাব ছিল। ইংরেজী শিক্ষিত, ইংরেজী কৃষ্টি-সভ্যতার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত মাইকেলের বিদ্রোহ ছিল স্বধর্ম এবং তৎকালীন সামাজিক সংস্কার ও মনোভাবের বিরুদ্ধে। তাই প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তিনি রাবণ ও তৎপুত্র মেঘনাদকে রাক্ষস হিসাবে নয়; মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন যে মানুষের মধ্যে গভীর স্বাজাত্যবোধ, অকৃত্রিম দেশপ্রেম, প্রজা-হিতৌষণা, বীরত্ব ও অপরিসীম প্রেম-প্রীতি বিদ্যমান। অন্ধ কুসংস্কার ও প্রথাগত সামাজিক জীবনাচরণে ব্যক্তি-মানুষের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। মাইকেল সেই ব্যক্তি-মানুষকে উদ্ধার করে তাকে স্বীয় মহিমায় উজ্জ্বলভাবে স্থাপন করেছেন। তাঁর প্রহসনগুলোর মধ্যেও সামাজিক অসংগতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মুধসূদন দ্রোহের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। অন্য আরো একটি ক্ষেত্রে তাঁর বিদ্রোহ সুস্পষ্ট। সেটা হলো তাঁর বাক্য-রীতি, বাক্য-প্রকরণ ও ছন্দের ক্ষেত্রে। এসব ক্ষেত্রেই তিনি প্রচলিত বাংলা কাব্যের ধারা থেকে সরে গিয়ে পাশ্চাত্যের সফল অনুসরণ করেছেন। ফলে বাংলা কাব্যে প্রথম সফল মহাকাব্য রচনা, ট্রাজেডী নাটক নির্মাণ, সনেট তৈরী, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনা ইত্যাদি মুধসূদনের অমর কীর্তি হয়ে রয়েছে। এটা তাঁর বিদ্রোহী-চেতনারই ফসল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার ও সীমাহীন অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এঁরা ছিলেন মূলতঃ মানবতাবাদী সমাজ-সংস্কারক। সমাজ সংস্কারের প্রেরণাই তাঁদেরকে সাহিত্য-কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

প্যারীচাঁদের বিদ্রোহ ছিল নিছক সাহিত্যিক ধরনের। বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস রচয়িতা ও বাংলা গদ্য রীতিতে চলতি ভাষা ব্যবহারের কৃতিত্ব তাঁরই প্রথম প্রাপ্য। অবশ্য আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এবং রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগে জন্মগ্রহণ করে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার পরেও তাঁর মত একজন ইংরেজী শিক্ষিত, উনবিংশ শতকের বাঙালী সমাজের অন্যতম কৃতি পুরুষ শেষ জীবনে সতীদাহ প্রথাসহ হিন্দু সমাজের অনেক কুসংস্কারকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দিয়ে গেছেন। তাই বলা যায়, সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রে নয়, একমাত্র সাহিত্য-রীতি ও ভাষা-রীতির ক্ষেত্রেই তাঁর মধ্যে নতুনত্বের প্রেরণা কাজ করেছে।

তুলনামূলক বিচারে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা ছিল ব্যাপক ও সর্বত্রগামী সেটা যেমন সাহিত্য-রীতির ক্ষেত্রে, তেমনি সামাজিক শোষণ, অন্যায়, জুলুম, কুসংস্কার ও মানবতাহীনতার বিরুদ্ধে, এমনকি, সাম্রাজ্যবাদ, পরাধীনতা ও রাজনৈতিক নির্যাতনের বিরুদ্ধেও তাঁর বলিষ্ঠ কবি-কণ্ঠ ছিল নিরন্তর সোচ্চার। এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার সাথে অন্য কারো তুলনা চলে না। তাই 'বিদ্রোহী' বলতে অবলীলায় আমরা একমাত্র নজরুলকেই বুঝি।

বাংলা সাহিত্যে যখন রবীন্দ্রনাথের একাধিপত্য এবং সমকালীন সকল কবি-সাহিত্যিক কম-বেশী রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত, ঠিক সেই রবীন্দ্র একাধিপত্যের যুগে নজরুল 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য' বলে একেবারে হৈ হৈ রৈ রৈ বেগে সহসা সকলকে সচকিত করে প্রবল ঝঞ্ঝার বেগে আবির্ভূত হলেন বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে। নজরুল ভাব ও ভাবনার ক্ষেত্রেই কেবল নতুনত্ব নিয়ে এলেন তাই নয়, তাঁর ভাষা, ভঙ্গী ও ঐতিহ্য চেতনার ক্ষেত্রেও ফুটে উঠলো নতুনত্ব ও বীরত্বব্যঞ্জক, বিদ্রোহাত্মক অভিব্যক্তি। সাহিত্য-রীতির ক্ষেত্রে এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ব্যাপক তাৎপর্য ও গুরুত্বের অধিকারী। এদিক থেকে, অর্থাৎ সাহিত্য-রীতির ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ যেরূপ অভূতপূর্ব কৃতিত্বের অধিকারী নজরুলও তেমনি এক অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের দাবীদার। জনৈক সমালোচকের ভাষায় ঃ

"নজরুল তাঁর সাহিত্যে ও কাব্যে আঙ্গিকগত দিক থেকে কোন পরিবর্তন আনতে পেরেছিলেন কিনা- যেমনটি পেরেছিলেন মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ? খুব স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হাঁ, পেরেছিলেন। প্রথমতঃ ভাষার ওজস্বিতা সৃষ্টি করে, দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার মিশ্রিত অসংখ্য আরবী-ফারসী শব্দকে সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত করে, তৃতীয়ত: হিন্দু পুরাণাশ্রিত কাহিনী, নাম ও নামবাচক বিশেষ্যকে রূপকে প্রতীকে প্রকাশ করে, চতুর্থত: ফারসী ও তৎসম তদ্ভব শব্দ দ্বারা যৌগিক শব্দ সৃষ্টি করে, পঞ্চমত: মুসলিম ও হিন্দু পুরাণের চিত্র ও চিত্রকল্প উপমা ও উৎপ্রেক্ষার যৌগিক সমাহার ঘটিয়ে, ষষ্ঠত: এলায়িত মাত্রাবৃত্ত ও লঘুবৃত্তের মধ্যে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে, সপ্তমত: ফারসী ছন্দের সূক্ষ্ম ধ্বনিকে বাংলা শব্দে রূপান্তরিত করে এবং অষ্টমত: 'মুক্তক মাত্রাবৃত্ত রচনা করে।" (শাহাবুদ্দিন আহমদ : নজরুল বিদ্রোহী কী?-নজরুল প্রতিভা পরিচয়, সুফী জুলফিকার হায়দার সম্পাদিত পৃ. ৩৫২-৩৫৩)।

সাহিত্য-রীতির ক্ষেত্রে নজরুলের সুস্পষ্ট স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপরোক্ত উদ্ধৃতি পাঠের পর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। এক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের সাথে নজরুলের উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যে ওজস্বিতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে মধুসূদনের নাম স্মরণ হয়। অমিত্রাক্ষর শব্দের প্রবর্তন, বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী ও ভাবের বিন্যাস এবং গুরু-গম্ভীর সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহারে মধুসূদন নিঃসন্দেহে বাংলা কাব্য-শরীরে ওজস্বিতা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা কাব্যের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মধসূদনের এ অসাধারণ কৃতিত্ব ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়নি। তার প্রধান কারণ সংস্কৃতের মত মৃত ভাষা থেকে বেছে বেছে কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দ চয়ন

করায় তাঁর কাব্যের ভাষা সাধারণের বোধগম্যতার মধ্যে থাকে নি; ফলে সাধারণ পাঠক মুধসূদনের সাথে সর্বদা একাত্মতা অনুভব করতে সক্ষম হয়না। অবশ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম মহাকাব্য, সনেট, নাটক ও প্রহসন লিখে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে তিনি অভূতপূর্ব কৃতিত্ব অর্জনের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারা প্রবর্তনে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছেন।

মধুসূদনের পরে আর একটি সার্থক ও সুস্পষ্ট ধারার প্রবর্তক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম স্মতর্ব্য। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল ব্যাপক ও বহুগামী। তিনি একাধারে কাব্য, গান, গীতিকাব্য, নাট্যকাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুতোষ রচনা ইত্যাদি সাহিত্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছেন। কেবল নতুন সাহিত্য-রীতির প্রবর্তক হিসাবেই নয়, নিজস্ব সাহিত্য-ধারার ধারক-বাহক-নির্মাতা হিসাবেও তিনি অভূতপূর্ব সাফল্যের অধিকারী। তাঁর সমকালে, তাঁর বলয়কে অস্বীকার করে সাহিত্য চর্চা করা ছিল অনেকটা দুরূহ ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের এহেন একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগে নজরুল ছিলেন সকলের কাছেই এক নিরতিশয় বিস্ময়। রবীন্দ্র একঘেয়েমীর যুগে স্বতন্ত্র উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর বহনকারী নজরুলকে সকলে সাদরে বরণ করলেন। বিশেষতঃ একটা নতুনতর, বিচিত্রতর, ভিন্ন স্বাদ ও রূপের প্রত্যাশী একদল তরুণ কবি-সাহিত্যিক তখন রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্নতর একটা কিছুর জন্য ছিলেন উন্মুখ। তাঁরা বিশেষভাবে উৎফুল্ল হলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ তরুণদের ধারণা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"....তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংগ্রামের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন,... তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।" (বুদ্ধদেব বসু, "রববীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক," সাহিত্য চর্চা, পৃ. ১২৬)।

এ তরুণদের নিকট নজরুল কেবল বিস্ময়করই ছিলেন না, ছিলেন তাদের কল্পনার রাজ্যে বিদ্রোহের বাণী-নূপুর, নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচনকারী এক দীপ্ত অনাস্বাদিত প্রতিভা। "কল্লোলের কাল" নামক ইতিহাস গ্রন্থের লেখক ড. জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের ভাষায় ঃ

"বিদ্রোহ কল্লোল পত্রিকা ও কল্লোল গোষ্ঠীর প্রজাতিক লক্ষণ। সে বিদ্রোহ বিচিত্র বিষয়ে, বিচিত্র ভঙ্গিমায়।... কল্লোলের গল্প ও প্রবন্ধের চেয়ে কবিতায় বিদ্রোহের কথা বেশী পাই। এবং সেক্ষেত্রে নজরুলই অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।"

নজরুলের এ বিস্ময়কর বিদ্রোহ প্রধানতঃ বিশেষ কয়েকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। প্রথমতঃ তাঁর প্রাণস্পর্শী ওজস্বিতা ও বলিষ্ঠ কবি-ভাষা। দ্বিতীয়তঃ এ বলিষ্ঠ কবি-ভাষার অন্যতম প্রধান উপকরণ ছিল জনগণের মুখে প্রচলিত অসংখ্য আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দের ব্যাপক ও সার্থক ব্যবহার। তৃতীয়তঃ তাঁর কবি-ভাবনায় বাস্তব জীবন ও সমাজ-চিন্তার সনিষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ। চতুর্থতঃ ইসলামী ঐতিহ্য ও ইতিহাস-সংলগ্নতা যা তাঁর ভাবের

প্রকাশকে করেছিল অবারিত, বহিঃর্মুখী ও খানিকটা স্বপ্নের আশ্লেষজড়িত ধ্রুপদ আকাঙ্ক্ষায় দুর্মর। নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা ও স্বকীয়তা আলোচনা প্রসঙ্গে এ কয়টি প্রধান বৈশিষ্ট্য স্মরণে রাখা একান্ত অপরিহার্য।

প্রত্যেক কবি-কর্মের সাথে সেই কবির জীবন-পরিবেশ ও জীবন-অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই উপরোক্ত বিষয়গুলো আলোচনার পূর্বে তাঁর জীবন-পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার একটি দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ধর্মীয় মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। পারিবারিক পরিবেশে বাল্যকালেই তিনি ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। পরিবারের দারিদ্র্য ভাগ্যান্বেষণে তাঁকে বাল্যকালেই ঘর-ছাড়া করে। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য তিনি ঘর ছাড়লেও, দারিদ্র্য তাঁকে কখনো ছাড়েনি। কৈশোর থেকেই জীবনের সাথে মুখোমুখি হয়ে প্রতিনিয়ত তাঁকে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। জীবিকার্জনের জন্য রুটির দোকান থেকে লেটোর দল পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁকে আনাগোনা করতে হয়েছে। মুসোলিনীর সেই বিখ্যাত উক্তি ঃ "Life is a perpetual strugggle for existence"— 'জীবন হলো বেঁচে থাকার জন্য এক নিরন্তর সংগ্রাম'– নজরুলের বেলায় যেন হুবহু মিলে যায়। এ সংগ্রামশীল জীবনের দুঃখময়তার মধ্য দিয়ে তিনি পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এই জীবন-বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার জারক-রসে সিক্ত হয়েছে তাঁর কবিতা। কবি তাই লিখতে পারেন ঃ

> "হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছো মহান!
> তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীস্টের সম্মান
> কণ্টক মুকুট শোভা।– দিয়াছ, তাপস,
> অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
> উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার,
> বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার।"

নিরতিশয় দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা ও নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কেটেছে নজরুলের শৈশব, কৈশোর ও জীবনের এক বৃহত্তর অংশ। যৌবনের প্রথম উন্মাদনামত্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি যখন জগতের দিকে তাকালেন তখন পৃথিবীর এক বৃহৎ জনপদে কমিউনিজম নামক এক নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ঐ একই বছর বিশ্বযুদ্ধের দাবানল এশিয়া-ইউরোপ-আমেরিকার বিশাল ভূভাগকে বিপুলভাবে আলোড়িত করলো। সে যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়লো উপমহাদেশেও। প্রাণ-চঞ্চল তরুণ নজরুল নিজেকে সামলাতে পারলেন না, যোগ দিলেন সেনাবাহিনীতে। অবশ্য সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়ার পেছনে নজরুলের অন্যরকম একটা মহৎ উদ্দেশ্যও ছিল। বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দের ভাষায় তা হলো ঃ "নজরুল যুদ্ধবিদ্যা শিখে এসে ভারতবর্ষে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী গঠন করে দেশ থেকে ইংরাজ তাড়াবে তার এই গোপন মতলবের কথা সে আমাকে বলেছিল একদিন।"

যুদ্ধ-শেষে নজরুল ফিরে এলেন ব্যারাক থেকে। কিন্তু সৈনিক-চেতনা তাঁর মধ্যে চিরস্থায়ী বাসা বাঁধলো। তাই রণ-ক্ষেত্রে অসি-চালনার কাজ সমাপ্ত করে সাহিত্যাঙ্গনে যখন তিনি মসী চালনায় আত্মনিয়োগ করলেন তখন দেখা গেল, মসীর তালে তালে অসির ঝনঝনা এক অপরূপ ঐকতান সৃষ্টি করেছে। বাংলা সাহিত্যের নিস্তরঙ্গ, শান্ত, সমাহিত পরিবেশে নজরুল এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। নজরুল তাঁর এ সৈনিক-চেতনার পরিচয় দিয়ে বলেন ঃ

"নিত্য যুদ্ধ করেছি বাধার সাথে চির নির্ভীক,
মোর পরিচয় আমি জানি, আমি আজন্ম সৈনিক।
কোন ভয় মোরে ফিরাতে পারেনি মোর 'আগে চলা' থেকে,
কে যেন স্বপ্নে জাগরণে মোর নাম ধরে গেছে ডেকে।"

উপরোক্ত জীবন-পরিবেশ ও জীবন-অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে নজরুল-কাব্যে যে ওজস্বিতা সৃষ্টি হয়েছে বাংলা সাহিত্যে তা অপূর্ব ও অসাধারণ। এর মূলে তিনটি প্রধান কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ভাবকে বেগবতী ঝর্ণাধারার ন্যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশের উপযোগী শব্দ চয়নে নজরুল ছিলেন একান্ত স্বচ্ছন্দ। দ্বিতীয়তঃ নজরুল শব্দকে ছন্দের বশীভূত না করে ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রকাশের উপযোগী ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তাই দেখা যায়, নজরুলের পূর্ববর্তী অধিকাংশ কবিই যেখানে পয়ার বা তান প্রধান ছন্দে কবিতা চর্চা করেছেন, নজরুল সেখানে মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কবিতা রচনায় অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। তৃতীয়তঃ তারুণ্যের উদ্দীপনা ও যৌবনের উদ্বেল উত্তেজনা নজরুল-কাব্যে এক অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্য ও দীপ্ত ওজস্বিতার প্রাণময়তা নিয়ে এসেছে। এখানে দু' একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"বল বীর-
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি, আমারি নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির!" (বিদ্রোহী)
অথবা,
"কারার ঐ লোহ্-কবাট
ভেঙ্গে ফেল্ কর্‌রে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান।
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ।
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি!" (ভাঙার গান)

অন্যত্র,

"বিরান মুলুক ইরানও সহসা জাগিয়াছে দেখি ত্যজিয়া নিঁদ,
মাশুকের বাহু ছাড়ায়ে আশিক কসম করিছে হবে শহীদ!"

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশগুলোতে কবির যৌবনদীপ্ত, বিদ্রোহী-চেতনাপুষ্ট অনুভূতি স্বচ্ছন্দ আবেগে মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সাবলীল অবয়বে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লাভ করেছে। শব্দ-চয়ন, শব্দের ঐতিহ্যগত পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি উদার ও নিপুণ। একটি দৃষ্টান্ত ঃ

"আবু বকর উসমান উমর আলী হাইদর
দাড়ী যে এ তরণীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী-মুখে সারি গান– 'লা-শরীক আল্লাহ'।" (খেয়াপারের তরণী)

উপরোক্ত কবিতাংশের প্রশংসায় প্রখ্যাত কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার ১৯২৭ সনে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদককে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

"বাঙ্গালা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ-ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ-ঝঙ্কারে আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কণ্ঠ-ভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকুতি ও হৃদয়-স্পন্দনের সহচর না হইয়া, ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণ প্রীতিকর প্রাণহীন চারুচাতুরীতে পরিণত হইয়াছে, সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় হৃদয়নিহিত তাহার ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া, মানব কণ্ঠের স্বর-সপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী। 'খেয়া পারের তরণী' শীর্ষক কবিতার ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও, মাত্রাবিন্যাস, ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে কোন খানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই– এই প্রকৃত কবিত্ব শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতা আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ-বিন্যাস ও ছন্দ-ঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

উক্ত একই শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর পত্রে আরো বলেন ঃ

"এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দ-বিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডম্বরুধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে; বিশেষতঃ এর শেষ ছত্রের

শেষ বাক্য "লা-শরীক আল্লাহ"– যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ! ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য যোজনা বাঙলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।"

শুধু আরবী-ফারসী শব্দের সুপ্রযুক্ত, অর্থপূর্ণ এবং অপূর্ব ঝংকারময় বাণীরূপ রচনাই নয়; শব্দের অনুষঙ্গ হিসাবে ইতিহাস-সচেতনতা ও ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে নজরুলের কৃতিত্ব অপরিসীম। রূপক ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে মুসলিম ঐতিহ্য ও আদর্শের মনোগ্রাহী উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ সাফল্য আমাদের কাব্যে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়। সে সম্ভাবনার দিগন্ত-পথে পরবর্তীকালে মুসলিম রেনেসাঁর যুগান্তকারী কবি ফররুখ আহমদের দীপ্ত পদাচারণা আমাদেরকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করেছে। কবি মঈনুদ্দীন, বেনজীর আহমদ, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, মোফাখ্খারুল ইসলাম, আব্দুর রশীদ খান, আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, আব্দুস সাত্তার, আল মাহমুদ প্রমুখ সেই সমুন্নত কাব্যাদর্শেরই সফল অনুসারী। নজরুলের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী হলেও নজরুল সমকালের কবি শাহাদত হোসেন, গোলাম মোস্তফা, আবুল হাশিমও সেই একই কাব্যাদর্শের সার্থক অনুসারী ছিলেন।

রূপক ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের রূপরেখা জীবন্তভাবে তুলে ধরে পাঠকের মনে আবেগাপ্লুত অনুভূতি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে নজরুলের অভূতপূর্ব সাফল্যের আর একটি উদাহরণ ঃ

"বাজ্‌লো কি রে ভোরের সানাই
নিঁদ মহলার আঁধার-পুরে।
শুনছি আজান গগন-তলে
অতীত রাতের মিনার-চূড়ে॥" (ভোরের সানাই)

'ভোরের সানাই' এবং অনুরূপ আরো অনেক কবিতায় এন্তার আরবী-ফারসী শব্দের সহজ, স্বচ্ছন্দ ও ছন্দময় ব্যবহারে কাব্যের গতি যেমন অবারিত হয়েছে, কাব্যের ভাব ও ব্যঞ্জনার মধ্যেও তেমনি এক অপূর্ব মাধুর্য ও ওজস্বিতার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা কাব্যে এটা শুধু নতুন নয়; এক অভাবিতপূর্ব মহত্তম, গৌরবময় কীর্তি। নজরুল এ গৌরব-কীর্তির সফল যশস্বী পথিকৃত। এক্ষেত্রে নজরুল এক বিশেষ ধারার প্রবর্তক। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এ সম্ভাবনার অনাস্বাদিত মাধুর্য ও ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হয়েই পূর্বোক্ত চিঠিতে নজরুলের প্রতিভার তারিফ করে "কবির লেখনী জয়যুক্ত হউক" বলে আনন্দময় প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

জাতীয় পুনরুজ্জীবনে গৌরব-দীপ্ত জাতীয় ঐতিহ্য-ইতিহাসের স্মরণ, ঐতিহ্যের প্রতীকী শব্দ, উপমা, রূপক ও ধ্বনি তরঙ্গের মাধ্যমে জাতির প্রাণ-স্পন্দনকে আবেগে-অনুভবে উচ্চকিত করা জাতীয় কবির প্রধান কাজ। নজরুল সে কাজটি অতি সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছেন। ইসলামী ভাব, ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনার ফলে তাঁকে কিছুটা বহিঃর্মুখী হতে হয়েছে। ফলে তাঁর কাব্যের দিগন্ত আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল ছুঁয়ে গেছে।

শুধু ভাব ও চেতনার ক্ষেত্রেই নয়, কাহিনী, উপকরণ, ভাষা, উপমা, ছন্দের ক্ষেত্রেও তাঁর এই আন্তর্জাতিকতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নজরুলের কবি-ভাবনায় বাস্তব জীবন ও সমাজ-চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। নজরুলের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে এ দিকটি প্রায় উপেক্ষিতই ছিল। বলা বাহুল্য, জীবনের সাধারণ সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-বঞ্চনা ইত্যাদি যা কাব্যে একান্ত স্বাভাবিক তার প্রকাশ অবশ্যই ঘটেছে, কিন্তু প্রচলিত সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে ত্রুটি ও অনিয়ম, যে কারণে জীবন ও সমাজের দুর্দশা ও সমস্যা জটিল ঘূর্ণাবর্তের ন্যায় বিপদ-সংকুল হয়ে উঠেছে নজরুল তার বিরুদ্ধেই কঠোর কুঠারাঘাত হেনেছেন। তাঁর ক্রোধ ও আঘাত কোন মানুষের বিরুদ্ধে নয়, মানুষের সৃষ্ট অনিয়ম, অবিচার, শোষণ, জুলুম, অনাচারের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর সুতীব্র প্রতিবাদ।

কাব্য-জগতে নজরুলের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে জাগরণের দোলা লাগে, বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হয়, ইউরোপের প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। উপমহাদেশেও স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবলতর হয়। কিন্তু যুগের এ প্রবল চেতনা, অভীপ্সা ও আবেগ তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে তেমন আলোড়িত করতে পারেনি। বরং 'বলাকা' (১৯১৪), 'পলাতকা' (১৯১৭) ইত্যাদি কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন এ যুগের বাস্তবতাকে অনেকটা অস্বীকারই করতে চেয়েছেন। এ যুগে রবীন্দ্র-প্রভাবিত বিশিষ্ট কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান, যতীন্দ্র মোহন বাগ্‌চী, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখ কারো রচনায়ই যুগ-চেতনার প্রকাশ ঘটেনি। যুদ্ধ-ফেরত নজরুল 'নতুনের কেতন' উড়িয়ে অকস্মাৎ আবির্ভূত হলেন এ সময় বাংলা সাহিত্যের গগনে প্রদীপ্ত সূর্যের বিচ্ছুরিত আলোক-ছটা নিয়ে। 'মোছলেম ভারতে' প্রকাশিত হলো নজরুলের 'শাত-ইল-আরব' ও 'খেয়াপারের তরণী'। এরপর একের পর এক আরো অনেক কবিতা। নতুন স্বাদের, নতুন প্রাণ-চেতনার স্পর্শে সজীব, হৃদয়গ্রাহী। বিস্মিত-পুলকিত হলো বাংলা সাহিত্যের পাঠক। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখলেন ঃ

"বাঙ্গালার কবি মালঞ্চে আজকাল দারুণ গ্রীষ্ম আসিয়াছে, মলয় সমীরণের অভাবে ব্যজনী বিজন চলিয়াছে। এহেন সময়ে নতুন দিন হইতে হাওয়া বহিতে দেখিয়া গুমোট ক্লিষ্ট প্রাণে বড়ই আরাম পাইয়াছি।" (মোছলেম ভারত, ভাদ্র, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, আগস্ট, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ)।

নজরুলের প্রাণোচ্ছল জীবনাবেগের দুরন্ত প্রকাশ ঘটেছে মূলতঃ তাঁর প্রতিবাদী চেতনা থেকে। এ প্রতিবাদ ছিল সকল অন্যায়, অনাচার, অসঙ্গতির বিরুদ্ধে। তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ ইংরেজ রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার ছিল, তেমনি দেশীয় জোতদার-জমিদার-মহাজন-পুঁজিপতি-সমাজপতিদের বিরুদ্ধেও। সকল প্রকার শোষণ-

জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছেন, এমনকি ধর্মের নামে যেসব কুসংস্কার এবং তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের জুলুম-অবিচার চলে আসছে, তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে তারও প্রতিবাদ করেছেন। কবির সংবেদনশীল মন জালেমের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত এবং মজলুমের সপক্ষে দৃঢ়, আন্তরিক। জালেমের কৃপাণ কখনো রাজশক্তির প্রতিভূ হয়ে, কখনো সামাজিক প্রথা ও ধর্মীয় সংস্কারের নামে আবার কখনো ব্যক্তি-স্বার্থ ও হীন মানবিক প্রবণতার উদ্ধত হাতিয়ার হয়ে নিরীহ সাধারণ মানুষের উপর আপতিত হয়। কবি এ সকল প্রকার শোষণ-জুলুম-অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধের দুর্জয় প্রাকার গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে তাঁর ববিতায়।

কবির বলিষ্ঠ প্রতিবাদী উচ্চারণ আমাদের জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে দুর্জয় সাহস ও প্রেরণা সৃষ্টি করে। কেবল ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধেই নয়; সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালেও স্বৈরাচারী শাসন-শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি এবং অবশেষে গণ-অভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এক প্রাণবন্ত অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দেখা দেয়।

নজরুলের এই বিদ্রোহী-চেতনা ইসলামের সাম্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ ও মানবিক আদর্শ থেকেই যে প্রধানতঃ প্রেরণা লাভ করেছিল– সামগ্রিক বিবেচনায় তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাংলা সাহিত্যে এই বিদ্রোহী চেতনা সম্পূর্ণ অভিনব না হলেও নজরুলেই তার দীপ্ত, সর্বাধিক উজ্জ্বল ও অনন্য প্রকাশ ঘটেছে। তাছাড়া, গতানুগতিক ভাষা, বাগ্‌বিধি, ছন্দ অনুসরণ না করে ঐতিহ্যানুগ উপমা, রূপক, বাগ্‌বিধি নির্মাণের ক্ষেত্রে যে বিদ্রোহাত্মক ইতিবাচক, আত্মপ্রত্যয়ী, বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন, বাংলা কাব্যে তা কেবল অভূতপূর্বই নয়, অপরূপ বর্ণাঢ্যতায় উজ্জ্বল ও অসাধারণ। তাই 'বিদ্রোহী কবি' পদবাচ্য বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে এককভাবে নজরুল ইসলামেরই প্রাপ্য। এদিক দিয়ে বিশ্বের মুক্তিকামী সকল মানুষ, নির্যাতিত-অবহেলিত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের তিনি প্রিয় কবি। অন্যায়-অসত্য-অধর্ম-অমানবিকতার বিরুদ্ধে নজরুলের কবি-ভাষা সর্বদা শানিত কৃপানের ন্যায় উদ্ধত–উচ্চকিত।

ফররুখ আহমদ

পৃথিবীর সব বড় কবিই কোন না কোন এক ঐতিহ্যের অনুসারী। সম্ভ্রান্ত নাম করা পরিবারের যেমন একটি গৌরবময় ঐতিহ্য থাকে, বড় কবির বেলায়ও তাই। গাছ যেমন শিকড়ের সাহায্যে মাটির গভীর থেকে রস সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে, লতাপাতা, ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়, বড় কবিও তেমনি ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে কবিতা লেখেন, যা চিরকালীন মানুষের মনে আনন্দের সঞ্চার করে।

পৃথিবীর সব বড় কবিই তাই ঐতিহ্যবাদী। হোমার, গ্যেটে, মিল্টন, শেক্সপীয়ার, টি.এস. এলিয়ট, শেখ সাদী, রুমী, জামী, খৈয়াম, ফেরদৌসী, ইকবাল সবাই স্ব স্ব ঐতিহ্যের অনুসারী। বাংলা সাহিত্যের বড় কবি মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, শাহাদত হোসেন, গোলাম মোস্তফা, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, জসীমউদ্দীন, ফররুখ আহমদ এঁরা সবাই নিজ নিজ ঐতিহ্য অনুসরণ করে কবিতা লিখে বড় কবির মর্যাদা পেয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্যের রচয়িতা মধুসূদন হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী শিক্ষা-সভ্যতায় রপ্ত হয়ে তিনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা, ভাবধারা, দর্শন ও সাহিত্যাদর্শ অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা-সাহিত্য তখন আধুনিকতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হতো। সে হিসাবে মধুসূদন ছিলেন পুরাপুরি আধুনিক কবি। পাশ্চাত্য সাহিত্য বিশেষত ইংরেজী সাহিত্যের আঙ্গিক, প্রকরণ ও শিল্পরীতির অনুকরণে বাংলা ভাষায় আধুনিক সাহিত্য নির্মাণে পথিকৃতের ভূমিকা পালনে মধুসূদন সফলতা অর্জন করেন। এজন্য তাঁকে যথার্থই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনক রূপে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু ঐতিহ্যানুসরণের ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু পুরাণ অবলম্বন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বেদ-উপনিষদের চিন্তা, দর্শন ও শিক্ষা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সাহিত্য চর্চা করেছেন। তিনি যে 'গীতাঞ্জলী' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার

পেয়েছেন সেটার মূল দর্শনও উপনিষদ থেকে নেয়া। অবশ্য তিনি ইরানী সুফীবাদ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আদর্শের দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর ঐতিহ্যের মূল প্রোথিত ছিল হিন্দু পুরাণ ও বেদ-উপনিষদে। জীবনানন্দ দাশ ও প্রাচীন ভারতের হিন্দু দর্শন, ইতিহাস, স্থাপত্য ও ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা ও উপাদন সংগ্রহ করে তাঁর কাব্যের মায়াবী ভুবন রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে প্রেম, নিসর্গ ও নাস্তিবাদের প্রাধান্য থাকলেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের মুগ্ধ অনুসারী তিনি।

অন্যদিকে, মহাকবি কায়কোবাদ, শাহাদত হোসেন, গোলাম মোস্তফা, নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন এঁরা ছিলেন ইসলামী ও মুসলিম ঐতিহ্যের কবি। এঁদের মধ্যে নজরুল ইসলাম ছিলেন সর্বাধিক উজ্জ্বল। তাঁকে বলা হয় মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি। নজরুল তাঁর কাব্য-কবিতা-গানের মাধ্যমে ঘুমন্ত, অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলেন। তাই সঙ্গতভাবেই তিনি আমাদের জাতীয় কবির মহিমান্বিত মর্যাদা লাভ করেছেন। জসীমউদ্দীন গ্রাম বাংলার সাধারণ আটপৌঢ়ে জীবন, মুসলিম ঐতিহ্যমণ্ডিত পুঁথি সাহিত্যের কাহিনী, গাথা ও লোক ভাষার সমন্বয়ে আধুনিক অথচ ভিন্ন স্বাদের রসগ্রাহী সাহিত্য রচনা করেছেন।

ফররুখ আহমদও নজরুলের মত মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি। তাঁকে ইসলামী আদর্শের কবি বলেও সনাক্ত করা হয়। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন নিষ্ঠার সাথে ইসলামের অনুসরণ করেছেন, কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি পুরাপুরি ইসলামী ভাব, আদর্শ ও ঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। কথায় এবং কাজে, চিন্তা ও অনুশীলনে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অভিন্ন রূপ। তাঁর মত আদর্শ মানুষ ও আদর্শ প্রতিভাবান কবি অতিশয় বিরল। মণে-প্রাণে তিনি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের অনুসারী এক কালজয়ী কবি-প্রতিভা।

মাগুড়া জেলার শ্রীপুর থানাধীন মাঝআইল গ্রামে ১৯১৮ সনের ১০ জুন কবি ফররুখ আহমদের জন্ম। মাঝআইল গ্রামটি মধুমতি নদীর তীরে অবস্থিত। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হাতেম আলী, মায়ের নাম বেগম রওশন আখতার, দাদা সৈয়দ আব্বাস আলী। পিতা সৈয়দ হাতেম আলী ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর। রমজান মাসে জন্ম বলে ফররুখের দাদী তাঁকে 'রমজান', বলে ডাকতেন। ছয় বছর বয়সে কবি তাঁর মাকে হারান। তারপর দাদীই তাঁকে লালন-পালন করেন। ১৯৪৩ সনে ফররুখের দাদী এবং পিতা দু'জনেই ইন্তিকাল করেন।

নদী-তীরবর্তী মাঝআইল গ্রামের প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে ফররুখ আহমদের শৈশব জীবন অতিবাহিত হয়। ফররুখের লেখাপড়া শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায়। ঘরে তিনি আরবী-ফারসীও শেখেন। তাঁর দাদী ছিলেন জমিদার-কন্যা, তদুপরি শিক্ষিতা, জ্ঞানী ও দীর্ঘজীবী মহিলা। কবি শৈশবে ও কৈশোরে তাঁর দাদীর নিকট থেকে শুনতেন 'তাজকেরাতুল আওলিয়া', 'কাসাসুল আম্বিয়া' প্রভৃতি বিখ্যাত সব পুঁথির কাহিনী। এভাবে দাদীর মুখে পুঁথির নানারূপ কাহিনী শুনতে শুনতে ফররুখ পুঁথির অতিশয় ভক্ত

হয়ে ওঠেন। পুঁথি সাহিত্যে বিশেষভাবে মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রতিফলিত, নবী-রসূল ও মুসলিম বীর ও মুসলমানদের অতীত গৌরব-গাঁথায় তা পরিপূর্ণ। এ আবহের মধ্যেই ফররুখের মানস পরিপুষ্টি লাভ করে এবং পরবর্তীতে তাঁর সমগ্র কাব্যকৃতিতে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করে ফররুখ কলকাতার মডেল এম.ই.স্কুলে ভর্তি হন। কলকাতার তালতলা এলাকায় ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে স্কুলটি অবস্থিত ছিল। এরপর তিনি ভর্তি হন বালিগঞ্জ হাইস্কুলে। এ স্কুলে তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন খ্যাতনামা কবি ও সুবিখ্যাত 'বিশ্বনবী' গ্রন্থের রচয়িতা গোলাম মোস্তফা। এরপর তিনি খুলনা জেলা স্কুলে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১৯৩৭ সনে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। খুলনা জেলা স্কুলে তাঁর শিক্ষক ছিলেন কবি আবুল হাশেম। খুলনা জেলা স্কুলের ম্যাগাজিনেই ফররুখের প্রথম কবিতা ছাপা হয়। তার ফলেই তাঁর শিক্ষক আবুল হাশেম তাঁর মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষর লক্ষ্য করেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফজলও এ সময় তাঁর শিক্ষক ছিলেন। ১৯৩৯ সনে তিনি কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন। এরপর তিনি প্রথমে দর্শন ও পরে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে প্রথমে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ ও পরে সিটি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু নানা কারণে তিনি আর পড়াশোনা চালাতে পারেননি।

ফররুখ আহমদের কলেজ জীবনে শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও সাহিত্যিক প্রথমনাথ বিশী। মেধাবী ছাত্র ও প্রতিভাবান কবি হিসাবে তিনি এঁদের প্রিয় পাত্রে পরিণত হন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হিসাবে ফররুখ আহমদকে সে সময় অনেকেই 'দ্বিতীয় আশুতোষ' নামে আখ্যায়িক করতেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়, ফতেহ লোহানী, শিল্পী কামরুল হাসান, কবি সুভাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অধ্যাপক বিশী তাঁর কবি-প্রতিভায় চমৎকৃত হয়ে তাঁকে 'তরুণ সেক্সপীয়র' নামে অভিহিত করেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর বিখ্যাত 'কবিতা' পত্রিকায় ফররুখ আহমদের কয়েকটি কবিতা ছাপেন, তখন সবেমাত্র তিনি কলেজের ছাত্র। কবিতা পত্রিকায় কবিতা ছাপা হওয়া ছিল দুর্লভ সৌভাগ্যের ব্যাপার। কলেজে পড়াকালেই ফররুখ এ বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হন। এভাবে অতি অল্প বয়সে আমরা বাংলা সাহিত্যের এক কালজয়ী অমর প্রতিভার বর্ণাঢ্য আবির্ভাব লক্ষ্য করলাম।

পড়াশোনায় ক্ষান্ত দিয়ে ১৯৪২ সনের নভেম্বর মাসে কবি খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়বা খাতুন (লিলি) কে বিয়ে করে সংসারী হন। অতঃপর জীবিকান্বেষণে কবি বিভিন্ন চাকুরীতে নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সনে কলকাতার আই.জি প্রিজন অফিসে, ১৯৪৪ সনে সিভিল সাপ্লাইতে, ১৯৪৫ সনে মাসিক মোহাম্মদীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে এবং ১৯৪৬ সনে জলপাইগুড়িতে একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকুরী করেন। ১৯৪৮ সনের শেষ দিকে তিনি ঢাকায় এসে প্রথমে অনিয়মিত ও পরে নিয়মিত আর্টিস্ট হিসাবে ঢাকা বেতারে

চাকুরী নেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বেতারের এ চাকুরীতে বহাল থাকেন। বেতারে চাকুরীরত অবস্থায় বিভিন্ন আকর্ষণীয় চাকুরীর সুযোগ পেলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ঢাকা বেতারের স্টাফ আর্টিস্ট হিসাবে ফররুখ আহমদ দীর্ঘকাল ছোটদের আসর 'কিশোর মজলিশ' পরিচালনা করেন। বেতারের প্রয়োজনে তিনি অসংখ্য গান, কবিতা, নাটিকা, শিশুতোষ রচনা, গীতিনাট্য, গীতিবিচিত্রা ইত্যাদি লিখেছেন। বেতারে তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছেন, মাঝে মধ্যে পুঁথিপাঠেও অংশগ্রহণ করেছেন। ছোটবেলায় দাদীর কাছে পুঁথির কাহিনী শুনে পুঁথি সাহিত্যের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ফররুখের সাহিত্যে পুঁথি সাহিত্যের একটি ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় মুসলিম রচিত বিপুল-সাহিত্য সম্পদকে হিন্দু গবেষক ও সাহিত্যিকগণ তুচ্ছার্থে 'পুঁথি সাহিত্য' 'বটতলার সাহিত্য', 'মুসলমানী বাংলা সাহিত্য' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে অপাংতেয় করে রাখেন। পুঁথিসাহিত্যের ভাব, শব্দ-সম্পদ, কাহিনী, উপাদান সবকিছুই ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত। সুদীর্ঘ সাড়ে পাঁচ শো বছরে সুসমৃদ্ধ এ বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার মুসলমানদের এক মহা মূল্যবান সম্পদ। আমাদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক গৌরবময় পরিচয় ধারণ করে আছে এ বিশাল সাহিত্য। ফররুখ আহমদ মুসলমানদের এ হৃত গৌরব ও ভাষা-সাহিত্যের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

প্রথম যৌবনে ফররুখ আহমদ অল্প কিছুকাল কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। এ সময় তাঁর জীবন ছিল অনেকটা বোহেমিয়ান টাইপের। কিন্তু অল্প দিনেই তিনি কমিউনিজমের অসারতা উপলব্ধি করে ইসলামের শাশ্বত কল্যাণময় আদর্শের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন ইসলামই আল্লাহর দেয়া একমাত্র অভ্রান্ত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ। অন্য সকল আদর্শই মানুষের মনগড়া এবং ভ্রান্ত। এটা উপলব্ধি করার পর তিনি তাঁর সব লেখার মধ্যেই ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর পথ-প্রদর্শক ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী জ্ঞান–সাধক ও তাঁর ধর্মীয় মুরশিদ অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল খালেকের বিশেষ অবদান ছিল।

ফররুখের কবিতায় ইসলামের সৌন্দর্য, শক্তি ও অতীত গৌরবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, মুসলমানদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, মুসলমানদের অতীত গৌরবময় পথে চলে হারানো মর্যাদা ফিরে পাওয়ার জন্য। এজন্য তাঁকে বলা হয় ইসলামী রেনেসাঁর শক্তিমান কবি। তিনি মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শের আলোকে এ পুনর্জাগরণের চেতনা জাগ্রত করেন নিজস্ব কাব্য-ভাষা, উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের দ্বারা। এজন্য তিনি ইসলামী রেনেসাঁর কবি হিসাবে সমধিক পরিচিত। তবে তাঁর কাবে মানবতার দিকটিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফররুখ আহমদ ইসলাম ও মানবতাকে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখেছেন।

'খুলনা জেলা স্কুল ম্যাগাজিনে' ১৯৩৭ সনে ফররুখের প্রথম কবিতা ছাপা হবার পর উক্ত একই বছর 'বুলবুল' ও 'মোহাম্মদী'তেও তাঁর কবিতা ছাপা হয়। এরপর 'বুলবুল', 'মোহাম্মদী' ছাড়াও 'আজাদ', 'সওগাত', 'কবিতা', 'দিগন্ত', 'মৃত্তিকা', 'অরণি' 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকায় একের পর এক তাঁর বহু কবিতা ছাপা হয়। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর একটি তালিকা নীচে সন্নিবেশিত হলো ঃ

কবিতা ঃ ১. সাত সাগরের মাঝি (প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৪) ২. আজাদ কর পাকিস্তান (প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৬) ৩. সিরাজাম মুনীরা (প্রথম প্রকাশ, ১৯৫২) ৪. মুহূর্তের কবিতা (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৩) ৫. কাফেলা, (রচনাকাল ১৯৪৩-৫৮) ৬. হে বন্য স্বপ্নেরা (রচনাকাল, ১৯৩৬-৫০) ৭. দিলরুবা (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪) ৮. হাবেদা মরুর কাহিনী, ৯. নির্বাচিত কবিতা (প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২)।

মহাকাব্য ঃ হাতেম তা'য়ী (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬)

গীতিনাট্য ঃ নোফেল ও হাতেম (প্রথম প্রকাশ ১৯৬১)

ব্যঙ্গ কবিতা ঃ ১. অনুস্বার (রচনাকাল, ১৯৪৪-৪৬) ২. বিসর্গ (রচনাকাল, ১৯৪৬-৪৮) ৩. ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য (প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১) ৪. হাল্কা লেখা, ৫. তসবির নামা, ৬. রসরঙ্গ, ৭. ধোলাই কাব্য।

গান ঃ ১. রক্ত গোলাব, ২. মাহফিল (হামদ ও নাত), ৩. কাব্য-গীতি

নাটক ঃ রাজ-রাজড়া (গদ্য ব্যঙ্গ নাটিকা)

শিশু সাহিত্য ঃ ১. পাখির বাসা (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫) ২. হরফের ছড়া (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৮) ৩. নতুন লেখা (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯) ৪. ছড়ার আসর (১) (প্রথম প্রকাশ ১৯৭০), ৫. ছড়ার আসর (২), ৬. ছড়ার আসর (৩), ৭. চিড়িয়াখানা, ৮. ফুলের জলসা, ৯. কিস্‌সা-কাহিনী, ১০. সাঁঝ সকালের কিস্‌সা, ১১. আলোক লতা, ১২. খুশীর ছড়া, ১৩. মজার ছড়া, ১৪. পাখীর ছড়া, ১৫. রংমশাল, ১৬. জোড় হরফের খেলা, ১৭. পড়ার শুরু, ১৮. পোকামাকড়

গল্প ঃ ফররুখ আহমদের গল্প (প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০)

পাঠ্যবই ঃ ১ নয়া জামাত, প্রথম ভাগ, (প্রথম প্রকাশ, ১৯৫০) ২.নয়া জামাত, দ্বিতীয় ভাগ, (প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০), ৩. নয়া জামাত, তৃতীয় ভাগ, (প্রথম প্রকাশ, ১৯৫০) ৪. নয়া জামাত, চতুর্থ ভাগ, (প্রথম প্রকাশ, ১৯৫০)

অনুবাদ কাব্য ১. কুরআন মঞ্জুষা, ২. ইকবালের নির্বাচিত কবিতা

এছাড়া, ফররুখ আহমদের কিছু প্রবন্ধ রয়েছে যা আজো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর রচিত বই-এর উপরোক্ত তালিকাও সম্পূর্ণ নয়, এখনো তাঁর নতুন নতুন বইয়ের পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ফররুখ আহমদের রচিত একটি অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিও পাওয়া গেছে। তাঁর বই-এর উপরোক্ত তালিকা থেকে তাঁর

প্রতিভার বহুমাত্রিকতা ও বিরাটত্ব সম্পর্কে একটি ধারণা করা চলে। ফররুখ আহমদ তাঁর জীবনকালে যত উপেক্ষা ও অবহেলাই পেয়ে থাকুন না কেন, মৃত ফররুখ আহমদ তাঁর বিচিত্র ও বিশাল সৃষ্টি নিয়ে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট মৌলিক কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর প্রতিভার শক্তিমত্তা, সৃষ্টি-বৈচিত্র্য, শৈল্পিক নৈপুণ্য ও সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য তাঁকে চির মহিমোজ্জ্বল কান্তি দান করেছে।

ফররুখ আহমদ তাঁর জীবনকালে যেসব সাহিত্য পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ করেন তা নিম্নরূপ :

১. প্রেসিডেন্ট পুরস্কার : প্রাইড অব পারফরম্যান্স (১৯৬০)
২. বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬০)
৩. বাংলা একাডেমীর ফেলো নির্বাচিত (১৯৬০)
৪. 'হাতেম তা'য়ী' গ্রন্থের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৬)
৫. 'পাখীর বাসা' কাব্যের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৬)

১৯৬৬ সনে পাকিস্তান সরকার তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব প্রদান করেন কিন্তু কবি তা প্রত্যাখ্যান করেন। মরণোত্তর কালে তাঁকে তিনটি পুরস্কার দেয়া হয়। সেগুলো হলো ঃ

১. একুশে পদক (১৯৭৭)
২. স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮০)
৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৪)
৪. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি প্রদত্ত ভাষা সৈনিক পদক ও পুরস্কার (২০০০)

ব্যক্তিগত জীবনে ফররুখ আহমদ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, সাদাসিধা, বন্ধুবৎসল ও মেহমান-নেওয়াজ। তাঁর মধ্যে কোনরূপ অহংকার বা গর্ববোধ ছিল না। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সাধু-সজ্জন ও সর্বোপরি নিষ্ঠাবান আদর্শ মুসলিম। লোভ ও খ্যাতির প্রতি চিরকাল তিনি ছিলেন নির্মোহ। রেডিওর সামান্য চাকুরী করে তিনি কোন রকমে সংসার চালাতেন। টাকা, বিত্ত, গাড়ী-বাড়ী, পদ-মর্যাদা, ছোট চাকুরী ছেড়ে বড় চাকুরীর চেষ্টা ইত্যাদি কোন কিছুর দিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। টাকার অভাবে কখনো তাঁর ঘরে রান্না হয়নি, চিকিৎসার অভাবে তাঁর বড় মেয়ে মারা গেছে, বড় ছেলের মেডিকেল কলেজের পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, নিজেও ঔষধ–পথ্যের অভাবে রোগজর্জর অবস্থায় দিন দিন কংকালসার হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণেছেন, অবশেষে এভাবে একদিন নীরবে মৃত্যুর কোলে নিঃসার ঢলে পড়েছেন, কিন্তু তাঁর দুঃখ-কষ্টের কথা কারো নিকট প্রকাশ করেননি বা কারো নিকট কখনো সাহায্যের আবেদন করেননি। পাকিস্তান সরকার তাঁকে রাষ্ট্রীয় সফরের প্রস্তাব দিয়েছে, খেতাব দিয়েছে, তাঁর বই-পুস্তক ছাপার নামে তাঁকে মোটা অঙ্কের এনাম দিতে চেয়েছে, কিন্তু নীতিবোধের কারণে তিনি তা অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন নির্মোহ, দৃঢ় চিত্তের নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ পৃথিবীতে সত্যিই অতিশয় দুর্লভ।

ফররুখের ব্যক্তিত্ব ও মনোবল ছিল পাহাড়ের মতই উঁচু ও দৃঢ়। নীতি ও আদর্শের উপর তিনি ছিলেন সর্বদা অটল ও অনড়। তাঁর জীবনে যেমন দুঃখ এসেছে তেমনি অযাচিতভাবে অনেক সুযোগ ও প্রলোভনও এসেছে। সামান্য একটু নীতিবোধ বিসর্জন দিলে তিনি অনায়াসে অনেক কিছুর মালিক হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা কখনো করেননি। মাথা উঁচু করে তিনি দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট ও সীমাহীন দারিদ্র্য বরণ করে নিয়েছেন। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে তাঁর মাথা কখনো নত হয়নি। সকল বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্য ও ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও তিনি সিন্দাবাদের নাবিকের মত সর্বদা আলিফের মত মাথা খাড়া রেখেছেন। শুধু একজন মহৎ কবি-ব্যক্তিত্ব হিসাবেই নয়,এমন উদার, নীতিবান, দৃঢ়চেতা নিষ্কলুষ আদর্শ চরিত্রের মানুষ হিসাবেও তাঁর তুলনা অতিশয় বিরল।

এর পাশাপাশি বর্তমান যুগে আমাদের দেশের একশ্রেণীর কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীর কথা বিবেচনা করলে দেখা যায়, সামান্য এনাম, পারিতোষিক, পুরস্কার, খেতাব ও বিত্ত-বৈভবের আশায় তারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি, চরিত্র এমনকি, 'সমরখন্দ-বোখারা', পর্যন্ত নিঃসংকোচে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। ফররুখ আহমদ এদের সামনে এক দুর্লভ চরিত্রের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এ বড় মাপের মানুষটি কবি হিসাবে যেমন মানুষ হিসাবেও ছিলেন তেমনি উঁচু মানের। কবি হিসাবে তাঁর ছিল এক বড় কল্পনার রঙিন জগত। সে জগত ছিল তাঁর নিকট অতি প্রিয়। সে জগতে যেমন রয়েছে বাংলার শ্যামল প্রকৃতি, নদী-নালা, ফুল-পাখি, বিচিত্র কলরবপূর্ণ জনপদ, তেমনি সেখানে রয়েছে পাহাড়, সমুদ্র, ধূসর মরু অঞ্চল। সে জগতে যেমন রয়েছে হাসি-আনন্দ, প্রেম-ভালবাসা, দুঃখ-দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ-বঞ্চনা আবার তেমনি রয়েছে ইসলামের অতীত গৌরবের কথা নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের কথা। মুসলমানদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতীয় জাগরণের আশা-অভীপ্সাপূর্ণ স্বপ্ন-সম্ভাবনার কথা। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদেরকে স্বীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে তিনি সর্বদা প্রেরণা যুগিয়েছেন। আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে ইসলাম যেমন শুধু আরব বিশ্বে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে এক বিপ্লবী পরিবর্তন এনেছিল, সেই ইসলামী আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আধুনিক ঘুণেধরা, জ্বরাগ্রস্ত, অধঃপতিত বিশ্ব আজো মুক্তির নব দিগন্তে উপনীত হতে পারে। সেই ঈপ্সিত কল্যাণময় বিশ্ব গড়ার স্বপ্নই দেখে গেছেন কবি ফররুখ আহমদ এবং সেই স্বপ্নের আশ্লেষ তিনি তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের মনে। তাই ফররুখ আমাদের জাগর স্বপ্নের কবি, তিনি আমাদের আশা-অভীপ্সা ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কবি। তিনি আমাদের চির শাশ্বত আদর্শ ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তিমান কবি-প্রতিভা। তাঁর কবি-ভাষায় আমাদের জীবনের কথা, স্বপ্ন-কল্পনার কথা সমুচ্চারিত হয়েছে। তাই ফররুখ যেমন আমাদের একান্ত অনুভবের, তেমনি কাব্যের আবেদনও কালোত্তীর্ণ, অনিঃশেষ।

সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা

বাংলা সাহিত্যে শুদ্ধতম কবিদের অন্যতম সৈয়দ আলী আশরাফের জন্ম ৩০ জানুয়ারী ১৯২৪–মৃত্যু ৭ আগস্ট ১৯৯৮। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ, খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ও মহান আধ্যাত্মিক পুরুষ। তাঁর এসব পরিচিতির মধ্যে একটি সাধারণ পরিচিতি হলো তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম এবং এ পরিচিতিই তাঁকে তাঁর সকল কাজে প্রেরণা যুগিয়েছে। জ্ঞান-বুদ্ধি-শিক্ষা-অভিজ্ঞতায় তিনি একজন অতি আধুনিক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হয়েও বিশ্বাসের প্রগাঢ়তায় ছিলেন অতিশয় দার্ঢ্য। সাহিত্যসহ তাঁর সকল কৃতিতে এর পরিচয় প্রতিবিম্বিত। তবে তিনি তাঁর বিশ্বাস বা জীবনাদর্শকে শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য ধ্যান-ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, অন্ধ বিশ্বাসের মাপকাঠিতে তাঁর বিশ্বাস ও জীবনাদর্শের প্রচার না করে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের গভীর অনুভূতির দ্বারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে বিশ্বাস ও জীবনাদর্শের গভীর উপলব্ধি সঞ্জাত সারাৎসারকে তাঁর কবিতা ও সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। সকল মহৎ কবি-সাহিত্যিকই এ কাজ করেছেন। টি. এস. এলিয়ট, বার্নাডশ,ইবসেন, হাফিজ, রুমী, ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলেই সাহিত্যে কোন না কোন তত্ত্ব বা জীবনাদর্শ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তা তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতির মোড়কে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তাঁদের সাহিত্য কখনো তাঁদের মতাদর্শ প্রচারের বাহন বলে মনে হয়নি। ফলে তা হয়েছে নিরেট সাহিত্য। সৈয়দ আলী আশরাফও তাঁদের মতোই একজন অতিশয় সচেতন বোদ্ধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর কবিতা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্যযোগ্য।

সাহিত্য ক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আশরাফের আবির্ভাব চল্লিশের দশকে, যদিও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চৈত্র যখন' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সনে। চল্লিশের দশকে আমাদের সাহিত্যে তিরিশোত্তর যুগের কবিদেরই প্রতাপ চলছিল। এ দশকের অনেক কবিও তিরিশোত্তর যুগের কবিদের পরাক্রমের কাছে নিজেদের স্বকীয়তা বহুলাংশে বিসর্জন দিয়েছিলেন। এ দশকের সর্বাধিক

উল্লেখযোগ্য কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন এর প্রধানতম ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর আপন মহিমা, স্বকীয়তা ও উজ্জ্বলতায় তিরিশের কবিদের প্রভাবকে অনেকটা নিষ্প্রভ করে দিয়েছিলেন। ফররুখ তাঁর অপরিসীম নিষ্ঠা ও প্রতিভার বলে তাঁর স্বতন্ত্রধর্মী কাব্যে বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের এক নতুন বর্ণাঢ্য ভুবন তৈরিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিরিশোত্তর যুগে আমাদের সাহিত্যে, বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ধ্বস্ নেমেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখন তেমন প্রবল ছিল না। মূলত রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেই তিরিশের কবিরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তিরিশোত্তর যুগে আমাদের সাহিত্যে দুটি সুস্পষ্ট ধারা প্রবহমান। একটি হলো বিশ্বাসহীন, ধর্মহীন, আপন ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি আস্থাহীন নতুন মানবতা-সন্ধানী ধারা। এতে পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তাধারার যেমন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় আবার তেমনি কমিউনিজমের নাস্তিক্যবাদ, সামাজিক দ্বান্দ্বিকতা ও প্রগতিবাদের প্রভাবও সুস্পষ্ট। অন্যটি হলো, ধর্মের মূলগত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও সেই উপলব্ধিগত মানবতার মানদণ্ডকে নতুনভাবে বিকশিত করা ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের আলোকে নতুন পৃথিবী গড়ার আশ্বাসে পূর্ণ একটি ধারা।

প্রথমোক্ত ধারার কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাস, সুধীন দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা একদিকে পাশ্চাত্য চিন্তা-দর্শন ও প্রাচ্যের কমিউনিজম ও নাস্তিবাদের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পান তাঁদের লেখায়। দ্বিতীয় ধারার কবিদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন কাজী নজরুল ইসলাম, শাহাদৎ হোসেন, অমিয়চক্রবর্তী, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। নজরুলের তখন সাহিত্য-জীবনের শেষ অধ্যায়। প্রথম যৌবনের আবেগ-উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে তখন তিনি অনেকটা স্থিতধী হয়ে উঠেছেন। ১৯৪২ সনে বাক্‌রুদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কয়েক বছর তিনি একাধারে কবিতা, গান-গজল, গল্প, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, অভিভাষণ ইত্যাদি যা কিছু লিখেছেন তা ইসলামী ভাব, আদর্শ, ঐতিহ্য ও অধ্যাত্মবাদে পরিস্ফুট। এর আগেও, বলতে গেলে, প্রথমাবধি তাঁর কাব্য-কবিতা ইসলামী ভাব, আদর্শ, ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণা সমৃদ্ধ কিন্তু মধ্য-তিরিশ থেকে তা বিশেষভাবে স্থিতধী ও অধ্যাত্ম-চেতনায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে, তখন তিরিশের কবিদের নাস্তিবাদী-অবিশ্বাসী চিন্তা-চেতনা এক শ্রেণীর তরুণদেরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করছিল, নজরুলের এসব লেখা তখন অনেকের মধ্যেই বিপুল আস্থা ও নির্ভরতার সৃষ্টি করে। ঐ সময় নজরুল ছিলেন সর্বাধিক উচ্চকণ্ঠ, বিশ্বাসী কবিদের শ্রেষ্ঠতম নির্ভর– সাধারণ পাঠক ও জনগণের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও ছিল অসাধারণ। একমাত্র নজরুলের কারণেই অন্য ধারার কবিরা তখন তেমন একটা হালে পানি পাননি। তিরিশের কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী অত্যাধুনিক হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা প্রমুখও এ সময় ইসলামী ভাব, আদর্শ ও ঐতিহ্যসম্পন্ন কবিতা লিখেছেন। অন্যদিকে, কবি জসীম উদ্দীন ঐ সময় বাংলার লোকায়ত ঐতিহ্য, সাধারণ জীবনচিত্র, আদর্শ ও জীবনবোধসম্পন্ন কাব্য-কবিতা লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

চল্লিশের দশকে তিরিশোত্তর অবিশ্বাসী, প্রগতিবাদী কবিদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক উচ্চকণ্ঠ কবি ফররুখ আহমদ। ফররুখের গভীর ঐতিহ্যবোধ, প্রগাঢ় আদর্শ চেতনা ও

আধুনিক মানবতাবোধের কাছে নাস্তিক্যবাদী-প্রগতিবাদীরা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। ফররুখের কালজয়ী প্রতিভা তখন বিশ্বাসী কবিদের মনে এক নতুন আস্থা ও নির্ভরতা সৃষ্টি করে। এ বিশ্বাসের প্রশ্রয়ে যাদের সাহিত্য-প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশ ঘটে সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁদেরই একজন।

আলী আশরাফের প্রতিভা ও অবদানের তুলনায় তিনি কম আলোচিত। এটা তাঁর জন্য যতটা নয়, আমাদের জন্য ততোধিক দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর কবিতায় বিশুদ্ধ রুচি ও স্নিগ্ধ আবেগের প্রতিফলন ঘটেছে। সকালে সবুজ ঘাসের ডগায় স্বচ্ছ শিশিরবিন্দুর মত পরিচ্ছন্ন স্ফটিকসদৃশ তাঁর কবিতা। দুপুরের তীব্র দাহ নেই, প্রভাতের স্নিগ্ধ কোমলতা তাঁর কবিতার শরীরে নরম গোলাপের পাঁপড়ির মত ছড়ানো ছিটানো। অসাধারণ প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে সংহত আবেগের সংমিশ্রণে তাঁর কবিতার সৃষ্টি। অন্যদিকে, তাঁর গদ্য-রচনা গভীর মননশীলতা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচয় বহন করে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলো নিম্নরূপ ঃ

কবিতা ঃ ১. চৈত্র যখন (১৯৫৭) ২. বিসংগতি (১৯৭৪) ৩. হিজরত (১৯৮৪) ৪. সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা (১৯৯১) ৫. রুবাইয়াতে জহীনি (১৯৯১) ও ৬,. প্রশ্নোত্তর (১৯৯৬)।

অনুবাদ ঃ ইভানকে ক্লেয়ারগল (১৯৬০) – প্রেমের কবিতা, সৈয়দ আলী আহসানের সাথে যৌথভাবে কৃত।

গদ্য ঃ ১. কাব্য পরিচয় (১৯৫৭) ২. নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায় (দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫) ৩. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য ৪. সংসদ যুগ ঃ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ইতিকথা ৫. অন্বেষা (আধ্যাত্মিক জীবনের বর্ণনা)।

এছাড়া, ইংরেজী সাহিত্যের কৃতি ছাত্র ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আশরাফের প্রায় দু' ডজন ইংরেজী গ্রন্থ রয়েছে। এগুলো সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা। এসব গ্রন্থ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁকে একজন কৃতী সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ হিসাবে সুখ্যাতি দান করেছে। তাঁর চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভার সার্বিক পরিচয় জানার জন্য এগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন অপরিহার্য।

সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁর নিজের সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "কাব্য রচনা করেছি নিজেকে জানার জন্য, ভাষার মারপ্যাঁচ দেখাবার জন্য নয় বা কোন মতবাদ প্রচার করার জন্য নয়।... মানবিক প্রেম আর বিরোধের রাজ্যে নিজেকে পেয়েছি। সমাজের বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্গত-অসঙ্গত বিবিধ অবস্থার মধ্যে নিজেকে দেখেছি। কামনা, বাসনা, লোভ, হিংসার বিচিত্র দোলায় নিজেকে দোলায়িত অবস্থায় অনুভব করেছি। মানুষকে বিশ্বাস করে অকৃপণ বর্বরতার আঘাতে, রক্তাক্ত হয়েছি। তবু মানুষের পরম সত্যের উপর বিশ্বাস হারাইনি বরঞ্চ এমন সমস্ত মহৎ আত্মার স্পর্শে আমার সত্তা জাগ্রত, উদ্দীপ্ত এবং আলোকিত হয়েছে যে মানবতার মহত্ত্বের উপর বিশ্বাস গাঢ়তর হয়েছে, সমাজের অসঙ্গতির অন্তরালে, সঙ্গতির উৎসের সন্ধান পেয়েছি এবং মানবাত্মার কল্যাণ

কামনায় অসুন্দরের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছি।" (সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা ভূমিকাংশ, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৯১, পৃ. ৭)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে কবির কাব্য-চর্চার প্রেক্ষিত, উদ্দেশ্য, উপলব্ধি, মানবপ্রেম ও মানব চরিত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই প্রেম রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম, স্বজনের প্রতি প্রেম, সাধারণ মানুষের প্রতি প্রেম। এ মানবিক প্রেম জীবনকে মাধুর্যময় করে তোলে। কিন্তু এ মানবিক প্রেমই আল্লাহ-প্রেমের অতল সলিল ধারার সাথে সংমিশ্রিত হয়ে প্রেমের পূর্ণ ও সফল পরিণতি ঘটায়। কবির এ সাধারণ প্রেম বা মানবপ্রেম ক্রমান্বয়ে আল্লাহপ্রেম বা অধ্যাত্মপ্রেমের অন্তহীন সাগরে বিলীন হয়ে যায়। কবি বলেন ঃ

"মেজবানি শেষ হলো? এসো তবে, এখন দুজনে
মুখোমুখি বসি এইখানে। রজনীগন্ধার গন্ধে
আমোদিত মলয়-কূজন– এমন নিবিড়ভাবে
বহুদিন বসিনি দুজন, বসিনি নিকটে।" [জন্মদিন ঃ চৈত্র যখন]

প্রিয়তমা পত্নীর নিবিড় সান্নিধ্যে যে মানবিক প্রেমের স্ফুরণ ঘটে, কবির নিকট সে প্রেমের পরিণতি কীরূপ তা নীচের কয়েকটি লাইনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

"যে মুহূর্তে প্রেম পায় বিশ্বাসের
মধুর স্বাক্ষর তখনি শুধু এ
নিবেদন বিশ্ব মুক্ত হয় প্রাণ
হীন মরীচিকার হৃদয়হীন
প্রেতনৃত্য থেকে, তখনি সৃষ্টির
সত্য অনুভূত হয় শিরায় শিরায়।
আমার প্রণয় তাই ঈমানের
বলে বলীয়ান কর, হে রহিম,
হে রহমানুর রহিম।" [আস্‌ফালা সাফেলনী ঃ হিজরত]

কবি তাঁর এ মানবিক প্রেমের পরিণতি সম্পর্কে নিজেই বলেছেন ঃ

"আমার কবিতায় প্রথম দিকে মানবিক প্রেম এবং হতাশার সঙ্গে ঐশী প্রেমের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যেমন 'বসন্ত' কবিতায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আত্মিক সাধনার ফলে যে নিত্য নব অভিজ্ঞতার সন্ধান পেয়েছি তার পরিণতি 'হিজরত' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। ইসলাম আমাকে তত্ত্ব দিয়েছে আর রূহানী সাধনা আমাকে জীবনকে নতুনভাবে দেখতে সাহায্য করেছে। এই সাধনায় অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছিলাম বলেই বিলেত যেয়ে তাদের ভালোটা চয়ন করতে পেরেছি এবং ইসলামের মানদণ্ড যেহেতু আমার চিত্তে এবং চরিত্রের মধ্যে একাত্মতা লাভ করেছে, আমার দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সভ্যতায় যা কিছু মূল্যবান এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতির জন্য গ্রহণযোগ্য তাই স্বীকার করে নিয়েছি।" (সৈয়দ আলী আশরাফের সাক্ষাৎকার ঃ 'সকাল', সৈয়দ আলী আশরাফ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৭, সম্পাদনায় ঃ ঈশাররফ হোসেন)।

ইউরোপের শিল্পবিপ্লব পাশ্চাত্য জগতে যে হতাশা, যান্ত্রিকতা, মুল্যবোধের অবক্ষয় ও মানবিকবোধের বিপর্যয় ঘটিয়েছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সে হতাশা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়কে আরো দ্রুততর করে তোলে। এ অবস্থার অবসান ঘটানোর আশ্বাস নিয়ে আসে রাশিয়ার সমাজতন্ত্র। কিন্তু গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মানবতাবিরোধী সমাজতন্ত্রকে পাশ্চাত্য জগত প্রত্যাখ্যান করে। এদিকে যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ, পুঁজিবাদী শোষণ, সামাজিক অবক্ষয়, হতাশা ও বঞ্চনা যখন পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল, তখন আইরিশ কবি উইলিয়ম বাটলার ইয়েট্স্ (১৮৬৫–১৯৩৯) এবং ইংরেজ কবি (জন্মসূত্রে আমেরিকান পরে বৃটিশ নাগরিক) টমাস স্টিয়ার্নস্ এলিয়ট খৃস্টীয় মুল্যবোধের ভিত্তিতে হতাশা-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে মানুষের মনে আস্থা ও নির্ভরতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এলিয়টের The Waste Land এবং ইয়েট্স্-এর Sailing to Byzantium-এ খৃস্টীয় মূল্যবোধকে উচ্চকিত করে তোলে। তাঁদের অন্যান্য লেখার মধ্যেও এভাবের প্রতিফলন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও তাঁদের কবিতা ও লেখা দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সাড়া জাগায়।

সৈয়দ আলী আশরাফের মধ্যেও ইয়েট্স্ ও এলিয়টের একটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মানব-প্রকৃতি ও ইতিহাস আলোচনার মাধ্যমে তিনিও মূল্যবোধ ও জীবনের চরম সত্য উপলব্ধির মাধ্যমে মানব-মুক্তির পথ অন্বেষণ পেয়েছেন। বলাবাহুল্য, ইসলাম ও মহানবীর (স) জীবনাদর্শের মধ্যেই তিনি মানবতার এ মুক্তিপথের সন্ধান করেছেন। তাঁর 'হিজরত', 'বনি আদম', 'বিসংগতি', 'দজ্জাল' শিরী ফরহাদ', 'ইতিহাস' 'আসফালা সাফেলীন', 'লাব্বায়েক' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর এ অন্বেষার পরিচয় বিধৃত। এলিয়ট ও ইয়েট্স্ যেমন আধুনিক ভাবকল্পনা, রূপক, প্রতীক ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, সৈয়দ আলী আশরাফও তেমনি তাঁদের অনুসরণে রূপক, উপমা, প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহার করে আধুনিক কাব্য-ভাষা নির্মাণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সচেতনতা ও পারদর্শিতা সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ নেই। তাঁর প্রতীক ব্যবহারের কৌশল অনেকটা ইয়েট্স্ ও এলিয়টকে, চিত্রকল্প ব্যবহারের পদ্ধতি ডিলান টমাস ও অমিয় চক্রবর্তীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া, চিত্রকল্প ও রূপকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি 'আল কুরআন', 'মুসলিম পুঁথি সাহিত্য', রুমীর 'মসনবী' এবং নিজামীর 'ইউসুফ জোলায় খাঁ' এবং 'লায়লা মজনু'কেও অনুসরণ করেছেন। তবে সব ক্ষেত্রেই তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, স্টাইল ও স্বকীয়তার পরিচয় স্পষ্ট।

সৈয়দ আলী আশরাফের মতে, প্রতীক দুই ধরনের– ঐতিহ্য-সংশ্লিষ্ট ও বুদ্ধিজাত। এলিয়ট যেমন তাঁর 'ওয়েস্টল্যান্ড' কাব্যে খৃস্টীয় ভাবধারা, আর্থুরীয়ান রোম্যান্স এবং বিভিন্ন মধ্যযুগীয় ও গ্রীক উপকথা থেকে উপমা-প্রতীক আহরণ করে তাঁর নিজস্ব জীবনোপলব্ধির আলোকে নবরূপ দান করেছেন, ইয়েট্স্ যেমন আইরিশ উপকথা থেকে প্রতীক সংগ্রহ করেছেন আবার সম্পূর্ণ নিজস্ব বুদ্ধিজাত প্রতীক-উপমাও সৃষ্টি করেছেন, সৈয়দ আলী আশরাফও তেমনি তাঁর জীবনের প্রধানতম অনুপ্রেরণার উৎস ঐশীগ্রন্থ আল কুরআন, মুসলিম ঐতিহ্য, ইতিহাস, ফারসী সাহিত্য ও পুঁথিসাহিত্য থেকে অকাতরে

উপমা-প্রতীক সংগ্রহ করে তাঁর নিজস্ব মনন ও আধুনিক কাব্য-ভাবনার উপযোগী করে তা প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে নজরুল-ফররুখের সাথে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

নজরুল মুসলমানদের ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে ভাব, ভাষা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানদের ঘরোয়া জীবনের আচার-আচরণ থেকে বিভিন্ন চিত্র গ্রহণ করেও তিনি তাঁর কাব্য-কবিতায় স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া, আরবী-ফারসী আয়াত, সম্পূর্ণ বাক্য বা অসংখ্য উপযোগী শব্দ ব্যবহার করেও তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ও বলিষ্ঠ কাব্য-ভাষা নির্মাণ করেছেন। ফররুখ আহমদ নজরুল-প্রদর্শিত এ ভাষা-রীতিকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন এবং মুসলিম ঐতিহ্য থেকে বিভিন্ন শব্দ, রূপক, প্রতীক, উপমা ও রূপকল্পকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন। তিনি 'সিন্দাবাদ' ও 'হাতেম তাঈ' নামক মধ্যযুগীয় দুই প্রবাদপুরুষকে সমকালীন বাঙালী মুসলমানের স্বপ্ন-কল্পনা ও আশা-প্রত্যাশার প্রতীক হিসাবে অভিনব কাব্য-সৌন্দর্যে রূপায়িত করেছেন। চল্লিশের দশকে 'সিন্দাবাদে'র প্রতীকে ফররুখ 'সাত সাগরের মাঝি'তে তৎকালীন বাঙালী মুসলমানের স্বপ্ন– স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রমূর্ত করে তুলেছেন এবং 'হাতেম তাঈ'র প্রতীকে তৎকালীন পাকিস্তানে মুসলিম সমাজের অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন, দ্বন্দ্ব-কলহ ইত্যাদির অবসান ঘটিয়ে তাদেরকে সাচ্চা মুসলমান হওয়ার ও মহৎ মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সৈয়দ আলী আশরাফও অনেকটা ফররুখ আহমদের মতোই মানবতার মুক্তি কামনা করেছেন, ব্যক্তিগত জীবন থেকে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বন্দ্ব-কলহ, সত্য-মিথ্যার চিরন্তন সংঘর্ষ ইত্যাদির অবসান চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে সামাজিক বিভিন্ন পর্যায়ে যে দ্বন্দ্ব-কলহ-সংঘাত, মিথ্যা ও অন্যায়ের বিস্তার তার মূলে রয়েছে স্বার্থান্ধ নাফ্সের আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতার প্রভাব বিস্তারের চিরন্তন প্রয়াস। একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও রূহানী শক্তির চর্চা বা আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই এ চিরন্তন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ঘটতে পারে, অন্যায়-অশান্তি-মিথ্যার বিনাশ ঘটিয়ে সত্য, ন্যায় ও শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। তার প্রায় সব কাব্যেই, বিশেষত 'হিজরত', 'রুবাইয়াতে জহীনি', কাব্যে কবির এ প্রতীকী অনুভব অভিনব কাব্য-ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। এজন্য কবি আল মাহমুদ যথার্থই বলেছেন ঃ

"তাঁর কবিতায় রয়েছে এমন এক ধরনের রহস্যময় আধ্যাত্মিক গুণ যা তাঁর সমসাময়িক কবিগণ প্রায় উপেক্ষা করেই আধুনিকতার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সৈয়দ আলী আশরাফ ঐতিহ্য ও পরম আস্তিকতাকেই কবিতার উপজীব্য করে দূরে সরে যান। এই দূরে সরে যাওয়ার অন্য একটি কারণ সম্ভবত তাঁর দীর্ঘ প্রবাস যাপন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা সূত্রে ব্যাপকতর উদার মানসিক আদান-প্রদান।... বাংলা কবিতার অন্য একটা দিক যার নাম বিশ্বাসের নির্ভরতা তা সৈয়দ আলী আশরাফ আমাদের দোদুল্যমান চিত্তচাঞ্চল্যের উপশম হিসাবে উপস্থিত করেছেন। বাংলা কবিতাকে দিগ্বিজয়ী করতে হলে এই কবিতা আমাদের একান্ত দরকার।"

এ সম্পর্কে আবু রুশ্‌দের একটি মন্তব্য অতিশয় প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"তিনি জীবনের অসংশোধনীয় অযৌক্তিকতা ও ক্ষণভঙ্গুরতার মধ্য দিয়ে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ সন্ধানী এবং সর্বশেষ তিনি কিছুটা মরমী ধরনের অধ্যাত্মবাদের ও নিজের ধর্মের নিগূঢ় আশ্রয় সন্ধানী।... ব্যক্তিগত প্রেম অতিক্রম করে তিনি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, জীবনের হতাশা ও গ্লানি প্রবলভাবে মনের জোরের সঙ্গে অতিক্রম করে নিজের ধর্মের স্থায়ী আশ্রয় ও শীতল ছায়ায় এসে স্বস্তি পেয়েছেন। কিন্তু যেটা কবি হিসাবে তাঁর সবচেয়ে লক্ষ্যযোগ্য গুণ সেটা হলো তাঁর নিজস্ব কণ্ঠছাপ।... দেশজ প্রভাবের বাইরে কবি মাঝে মধ্যে আন্তর্জাতিকতাও অর্জন করেছেন। সৈয়দ আলী আশরাফের কয়েকটি ধর্মীয় কবিতায়... বিশ্বাসী অবস্থায় ও খোদার ইচ্ছের প্রতি প্রত্যয়দীপ্ত সমর্পণই বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এ ধরনের কবিতার মধ্যে 'কাবা শরীফ', 'হেরা', 'মদীনার উদ্দেশ্যে', 'মদীনা' উল্লেখযোগ্য। বস্তুত তাঁর উপরোক্ত চারটা ধর্মীয় কবিতায় বিশ্বাস, আবেগ ও নতুন কাব্যিক ভাষার সমন্বয় অনেকটা সফলতার সাথে ঘটেছে।"

আলী আশরাফের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চৈত্র যখন'-এ কবির ইংরেজী কাব্য পাঠের স্পষ্ট স্বাক্ষর বিদ্যমান। বিশিষ্ট কবি-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসানের মতে এ গ্রন্থের প্রথম দুটি কবিতা ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর মনোলোগের ধাঁচে রচিত। তিনি বলেন ঃ "ভাষায় এই ভঙ্গিতে কখনো কবিতা রচিত হয়নি। ভঙ্গিটি বাংলা ভাষায় গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাও পরীক্ষিত হয়নি। সৈয়দ আলী আশরাফই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই পরীক্ষার সূত্রপাত করেছিলেন। কিন্তু মাত্র দুটি কবিতায় এই পরীক্ষার নিবৃত্তি ঘটায় আমরা ভঙ্গীটির পরিণত রূপ দেখতে সক্ষম হলাম না। তবু একথা বলা যায়, এ ভঙ্গীটির সূত্রপাতের জন্য আলী আশরাফ প্রশংসা পাবার অধিকারী।" (সৈয়দ আলী আহসান ঃ সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা)।

মনোলোগ বা স্বগতোক্তি যা আমরা পূর্বে সাধারণত নাটকে প্রত্যক্ষ করেছি, কবিতায় তা সাধারণত দেখা যায় না। আলী আশরাফ কবিতার এ বিশেষ ভঙ্গীটি ইংরেজী কবিতা থেকেই বাংলায় নিয়ে এসেছেন। এটা তাঁর ইংরেজী কবিতা পাঠেরই ফল। এ সম্পর্কে আলী আশরাফ বলেন ঃ ইংরেজী সাহিত্যে ব্রাউনিং 'ড্রামাটিক মনোলোগে' রচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বিএ অনার্সের ছাত্র ছিলাম তখন ব্রাউনিং আমার বিশেষ প্রিয় কবি ছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই আঙ্গিকে কাব্য রচনা করি।... মনোলোগ মধুসূদন রচনা করে গেছেন–'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য। সার্থক মনোলোগ–'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী' একটি সার্থক ড্রামাটিক মনোলোগ।" (সৈয়দ আলী আশরাফের সাক্ষাৎকার, ঐ)।

এ কাব্যে তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি, বিশ্বাস, প্রেম, অধ্যাত্মবোধ, প্রকৃতি, স্বদেশপ্রেম ও সর্বোপরি সত্যবোধের অপরিসীম আগ্রহ ও তাতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার প্রবল বাসনা ফুটে উঠেছে। এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছিঃ

'খুঁজেছি অনেক তাকে
অন্ধকার মাঝরাতে বিদ্যুতের চকিত আভায়
অথবা ধানের ক্ষেতে ফসলের নম্র পূর্ণতায়
খুঁজেছি।' [পূর্ণিমা স্বদেশ ঃ চৈত্র যখন]

অন্বেষার মাধ্যমেই নিজেকে জানা যায়। অন্বেষার মাধ্যমেই সত্যোপলব্ধি ঘটে। অন্বেষার মাধ্যমেই বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা সৃষ্টি হয়, প্রেমের বিভিন্ন স্তরে পূর্ণতা আসে—ব্যক্তিগত প্রেম মানবিকপ্রেমে, স্বদেশপ্রেমে, অধ্যাত্মপ্রেমে তথা মহান স্রষ্টাপ্রেমের উচ্চাঙ্গ মার্গে উন্নীত হয়—মানুষ পরিণত হয় ইনসানে কামিলে। হাদীস শরীফে তাই বলা হয়েছে 'ফাকাদ আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু', 'অর্থাৎ নিজেকে জান, তাহলে তোমার রব বা প্রভুকেও জানতে পারবে। ইংরেজীতে বলা হয়, Know thyself, নিজেকে জান। প্রত্যেক জ্ঞানের উৎসই এ অন্বেষা। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি সকল তত্ত্বেরই মূল কথা অন্বেষা। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এ অন্বেষার মাধ্যমেই তাঁর রব বা পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। মহানবী (স) এ অন্বেষার বশবর্তী হয়েই দীর্ঘ পনেরো বছর হেরাগুহায় কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধও সত্যানুসন্ধানে বোধিবৃক্ষের ছায়ায় দীর্ঘকাল তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। আলী আশরাফের অন্বেষাও এভাবে তাঁকে এক জায়গায় এনে স্থিতধী করে। কবি বলেন ঃ

'অসীম সসীম তার মিলে গেছে সমুদ্র-উল্লাসে।
অতনু প্রবাহ তার
অন্তরের অন্তরীক্ষে বাজিয়েছে প্রত্যক্ষ কিঙ্কিনি।'

'চৈত্র যখন' কাব্যের প্রতিটি কবিতাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি কবিতায়ই জিজ্ঞাসা আছে, অন্বেষা আছে এবং শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনকে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট উপলব্ধির প্রান্তে নিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে, যা পাঠকের মনকে আশ্বস্ত করে, আনন্দের উদ্ভাসে তৃপ্ত করে। বিশ্বাসী কবির এ এক অপরিহার্য গুণ। এ কাব্যের 'বনি আদম' কবিতাটি সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কবিতায় কাব্যের কেন্দ্রীয় ভাব পরিব্যক্ত হয়েছে। ছয় পর্বে বিভক্ত এ কবিতায় কবি মানব-জীবনের আদি-অন্ত, এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরূপ দার্শনিক প্রজ্ঞা ও কাব্যময়তার সমন্বয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এক মহাকাব্যের অনুভব একটি মাত্র কবিতায় ছন্দময় ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত হয়েছে। কবিতার প্রথম কয়টি লাইন ঃ

'হে বনি আদম
আমরা ভাসন্ত চন্দ্র পৃথিবীর বুকে
ক্রমশঃ বর্ধন আর ক্রমশঃ বিক্ষয়
শূন্যময় আমাদের গোধুলি জীবন।" [বনি আদম ঃ চৈত্র যখন]

সৈয়দ আলী আশরাফের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিসংগতি'। এখানে অধ্যাত্ম সাধনার বিষয় কাব্যাকারে বর্ণিত হয়েছে। সাধনার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এর প্রথম স্তর হলো জিজ্ঞাসা ও অন্বেষার মাধ্যমে নিজেকে জানা। দ্বিতীয় স্তর হলো অধ্যাত্ম-গুরুর সাথে

একাত্ম হওয়া। তৃতীয় স্তরে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সাথে বিলীন হয়ে যাওয়া। সুফীরা যেটাকে বলেন 'ফানাফিল্লাহ'। সাধকের সর্বোচ্চ মার্গ বা উদ্দেশ্য এটাই। এখানে বিভিন্ন কবিতায় নিসর্গ, মানুষ, মানুষের বহিরঙ্গ ও অন্তর-রাজ্যের বিভিন্ন দোলাচল, পৃথিবীর নানা বাস্তবতার কবিত্বময় বর্ণনার মাধ্যমে কবি তাঁর অধ্যাত্মবোধকেই ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। নানা রূপক, উপমা, প্রতীকের মাধ্যমে কবি এই বোধকে আরো তাৎপর্যময় করে তুলেছেন। যেমন ঃ

> "লগ্নের লাঞ্ছনা শেষ। মুক্তপ্রাণ ছন্দবিদ্ধ হাওয়া;
> নরম বিছানা মাটি সদ্য ভেজা বর্ষণ সরস;
> ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের মাঠে ভরামন আউষের সোনা;
> ছলছল নদীবেগ অস্পষ্ট অধরা তবু নাচে।
> সামনে সবুজ শাড়ী পাটক্ষেত; ভাঙা মন জোড়া
> তীক্ষ্ণ চিল; বিরহ সমৃদ্ধি ঘন কুহু, কুহু, কুহু;
> ডাহুকও দরদী। তবুও অস্থিরচিত্ত। মনোলীন
> যদিও বা ধান্যগন্ধী দেহ, মৃত্যুলগ্নী মোহের মোক্ষনে
> চিনেছি তো তারে। [বিসংগতি ঃ বিসংগতি]

'বিসংগতি'র কয়েকটি কবিতা ইংরেজ কবি এজরা পাউন্ড, ক্যান্টো, ই.ই. কামিংস-এর অনুসরণে লেখা। এখানেও কবির ইংরেজী কাব্যপাঠের প্রভাব স্পষ্ট।

'বিসংগতি'র মধ্যে যে ভাব ও অনুভূতি কোরক মেলেছে কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হিজরত'-এ তা পূর্ণ প্রস্ফুটিত হযেছে। এখানে আত্মগত অনুভব পূর্ণ অধ্যাত্ম-চেতনার রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানে প্রতিটি কবিতায় আল্লাহ, রাসূল (স) ও ইসলামের সুমহান আদর্শের আবেগঘন বর্ণনা আছে। হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে কবি মক্কা, মদীনা, আরাফাত ও অন্যান্য স্থানে গমনকে হিজরতের সাথে তুলনা করেছেন। হিজরতের প্রকৃত উদ্দেশ্য তো আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ। হজ্জের উদ্দেশ্যও তাই। তবে কবির এ হিজরত বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক হিজরত। পথ-অতিক্রমের দৃশ্যমান অভিযাত্রার চেয়ে এখানে কবির আধ্যাত্মিক অভিযাত্রাই গুরুত্ব লাভ করেছে। সেদিক দিয়ে আলী আশরাফের এ কাব্য সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব ও অসাধারণ সংযোজন হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। এ সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"এ কাব্যগ্রন্থের 'হিজরত' এবং 'লাব্বায়েক' নামক কবিতা দুটি বাংলা কাব্য সাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন। ঠিক এ ধরনের কবিতা বাংলা কাব্যের ইতিহাসে আর কখনো লিখিত হয়নি। 'হিজরত' কবিতাটিতে কবির আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের রূপচিত্র পাই। বাস্তব জগতের প্রেম, লোভ, ক্ষয়ক্ষতি সব কিছু ত্যাগ করে কবি হিজরত করেছেন আল্লাহ এবং রাসূলের নিকটতম সান্নিধ্য লাভের জন্য। এ কবিতাটি টি.এস.এলিয়টের 'অ্যাশ ওয়েড্‌নেসডে' (Ash Wednesday) কবিতাটির সঙ্গে তুলনীয়। এখানেও কবি এলিয়টের মত কয়েকটি প্রতীক ব্যবহার করেছেন যে সমস্ত প্রতীক আধ্যাত্মিক অবস্থার অনুভূতি জাগ্রত করে।.... চতুর্থ কবিতাটিতে ('লাব্বায়েক') ইয়েট্‌সের 'সেইলিং টু

বাইজ্যান্টিয়াম' (Sailing to Byzantium) কবিতার প্রভাব লক্ষ্য করি। ইয়েট্সও সন্ধান করেছেন চিরন্তনকে, এ কবিও চাচ্ছেন আল্লাহ ও রাসূলের সান্নিধ্য লাভের পর এই ক্ষয়িষ্ণু দুনিয়াতে চিরন্তনকে। মদীনা মুনাওয়ারাকে সেই চিরন্তনের প্রতীক হিসাবে দেখেছেন এবং রাসূল (স)-এর মধ্যে সেই 'নিবেদন অমরত্বে'র সন্ধান পেলেন তাই কবি সম্পূর্ণ নতুন অর্থ যোজনা করে বাংলার পুরাতন রূপকল্পকে প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন– এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।" (পূর্বোক্ত)।

'হিজরত' কাব্যটি কবির রূহানী পীর "হজরত বাবা জহীন শাহ তাজী রহমাতুল্লাহ আলায়হের স্মরণে" উৎসর্গীকৃত। কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের নাম ঃ 'রুবাইয়াত এ জহিনী'। এখানেও কবির অধ্যাত্ম-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। কবির ভাষায় ঃ "মানবিক প্রেম ও ঐশীপ্রেম এ দুয়ের প্রকাশ আমার কাব্যে রয়েছে এবং মানবিক প্রেম থেকে ঐশীপ্রেমের পথে যে যাত্রা এবং যে নতুন রূপ তা 'রূপাইয়াত এ জহিনী'-তে ভালভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।" একটি উদাহরণ ঃ

"প্রিয়ারে আমার শুকরিয়া দিই; শান্ত ঘরের মন্ত্রণায়
আমারে কখনো বন্দী করেনি গল্পগুজব সান্ত্বনায়
আগুনে পুড়িয়ে কঠিন জ্বালায় আমারে করেছে দীপ্ত শিখা
সেই আলো দিয়ে তোমারে চিনব– মিলাবে মিটাবে অন্তরায়।"

[রুরাইয়াৎ-ই-জহীনী]

সৈয়দ আলী আশরাফের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'প্রশ্নোত্তর'-এর ভূমিকায় বলা হয়েছে ঃ

"প্রশ্নোত্তর" বইতে কবি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পরম সত্তার সঙ্গে নিজস্ব পরিচিতির আনন্দ যেমন পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি সেই সত্তার সঙ্গে অপরিচয়ের অন্ধত্ব এবং তার ফলগত ক্রুরতা ও স্বার্থপরতার বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রশ্ন করছেন কেন এই অপরিচয়? অন্তরাত্মায় বেদনাক্ত যে উত্তর উদিত হচ্ছে কবি তা-ই এ বইতে প্রকাশ করেছেন।"

সৈয়দ আলী আশরাফ মুসলিম ঐতিহ্য, ইসলামী জীবনবোধ ও গভীর অধ্যাত্ম চেতনাসম্পন্ন একজন আধুনিক কবি। বাংলা কাব্যে এটা কোন নতুন বিষয় নয়; মধ্যযুগে শাহ মোহম্মদ সগীর থেকে এর উৎপত্তি এবং বিভিন্ন যুগে অসংখ্য মুসলিম কবির কাব্য-কবিতায় এর রূপায়ণ ঘটেছে বিভিন্নভাবে। আধুনিক যুগে নজরুল-ফররুখ এ ধারার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি। সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁদেরই সার্থক উত্তরসূরী। তবে তাঁর আধ্যাত্মিক বোধ ও জীবন-অভিজ্ঞতা রূপায়ণ ও নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মিতির ক্ষেত্রে তাঁর সচেতন-সক্ষম প্রয়াস তাঁকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে– যেটা নিঃসন্দেহে একজন বড় কবির লক্ষণ।

কথাশিল্পী শাহেদ আলী

আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক শাহেদ আলী। কথাশিল্পী হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও শাহেদ আলী একজন উঁচু পর্যায়ের মননশীল লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, অধ্যাপক, বক্তা, সংগঠক, সমাজসেবক, রাজনীতিক ও সংস্কৃতিসেবী হিসাবে বিগত শতকে আমাদের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তাঁর জ্ঞান, শিক্ষা, চিন্তা ও বিশ্বাসের সাথে কর্মের সমন্বয় সাধনে তিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন।

শাহেদ আলীর পিতার নাম মৌলভী ইসমাইল, মায়ের নাম আয়েশা খাতুন। ১৯২৫ সনের ২৪ মে তিনি তৎকালীন সিলেট জেলার অন্তর্গত সুনামগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলা) তাহিরপুর উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ১৯৪২ সনে সুনামগঞ্জ সরকারী জুবিলী হাইস্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৪৫ সনে সিলেট এম.সি. কলেজ থেকে আই. এ ও ১৯৪৭ সনে ডিস্টিংশনসহ বিএ পাশ করেন। ১৯৫০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলায় এম. এ পাশ করেন।

ছাত্রাবস্থায়ই শাহেদ আলী ১৯৪৮-৫০ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের নির্ভীক মুখপত্র সাপ্তাহিক 'সৈনিক'-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১-৫৩ পর্যন্ত তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজ ও রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৪ সনে তিনি 'খিলাফতে রব্বানী পার্টি'র প্রার্থী হিসাবে পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ১৯৫৮ সন পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৫ সনে 'দৈনিক বুনিয়াদে'র সম্পাদক, ১৯৫৬ সনে 'দৈনিক মিল্লাতে'র সহকারী সম্পাদক, ১৯৬২ সন থেকে 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা' (বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা)-এর সম্পাদক ১৯৬৩ সন থেকে 'মাসিক সবুজপাতা'র সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘকাল

দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ সনে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের পরিচালক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া, বিভিন্ন সময়ে তিনি চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, মীরপুর বাংলা কলেজ, ঢাকার আবুজর গিফারী কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এর কাউন্সিলর ছিলেন। তাঁর সাহিত্য-কর্মের জন্য তিনি একাডেমীর 'ফেলো' নির্বাচিত হন। তিনি রাইটার্স গিল্ডের নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। দীর্ঘকাল ভাষা আন্দোলনের উদ্গাতা 'তমদ্দুন মজলিশে'র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৯৯ সনে মজলিশের আজীবন সভাপতি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ইন্তিকালের পর তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়ে আজীবন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। ৬ নভেম্বর, ২০০১ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আমাদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক জগতের প্রতিনিধি হিসাবে অধ্যাপক শাহেদ আলী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে ঃ থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরায়েন, সৌদী আরব, সুইডেন, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্কসহ দুনিয়ার বহু দেশ সফর করেন।

শাহেদ আলীর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

গবেষণা ও মননশীল গদ্য রচনা ঃ ১. পাকিস্তান রূপায়ণে তরুণ মুসলিমের ভূমিকা (১৯৪৬), ২. ফিলিস্তিনে রুশ ভূমিকা (১৯৪৮), ৩. একমাত্র পথ (১৯৪৮), ৪. সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়া (১৯৫২), ৫. তরুণের সমস্যা (১৯৬২), ৬. তৌহীদ (১৯৬৪), ৭. বাঙলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান (১৯৬৪), ৮. জীবন নিরবচ্ছিন্ন (১৯৬৮), ৯. মুক্তির পথ (১৯৬৯), ১০. সাম্প্রদায়িকতা (১৯৭০), ১১. বুদ্ধির ফসল, আত্মার আশীষ (১৯৭০), ১২. The Economc Order of Islam (১৯৮১), ১৩. Islam in Bangladesh Today.

গল্প ঃ ১. জিবরাইলের ডানা (১৯৫৩), ২. একই সমতলে (১৯৬৩), ৩. শা'নযর (১৯৮৬), ৪. অতীত রাতের কাহিনী (১৯৮৬), ৫. অমর কাহিনী (১৯৮৭), ৬. নতুন জমিদার (১৯৯২), ৭. স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৯৬), ৮. শাহেদ আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প।

উপন্যাস ঃ হৃদয় নদী (১৯৮৫)

নাটিকা ঃ বিচার (১৯৮৫)।

অনুবাদ ঃ ১. এ যুগের বিজ্ঞান ও মানুষ (১৯৬০), ২. ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি (১৯৬৬), ৩. মক্কার পথ (১৯৮৪), ৪. দি হিস্ট্রি অব পলিটিক্যাল সায়েন্স, ইসলাম ইন বাংলাদেশ, ইকনমিক অর্ডার অব ইসলাম ইত্যাদি।

শিশুতোষ ঃ ১. সোনারগাঁয়ের সোনার মানুষ (১৯৭১), ২. ছোটদের ইমাম আবু হানিফা (১৯৮০), ৩. রুহীর প্রথম পাঠ (১৯৮১) ইত্যাদি।

অগ্রন্থিত লেখা ঃ মাসিক সওগাতে ১৯৪০ সনে প্রকাশিত তাঁর প্রথম লেখা 'অশ্রু', 'রিসার্চ স্কলার' প্রভৃতি গল্প মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত 'এই আকাশের হাওয়া', 'ছিন্নপত্র'। নয়া জামানায় প্রকাশিত 'পরিচয়'। সৈনিকে প্রকাশিত 'হাসিকান্না'। দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত 'সোনার চেয়েও দামী'। দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত 'পিটিশন'। এলানে প্রকাশিত 'তুচ্ছ' প্রভৃতি গল্প এখনো পর্যন্ত কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি। এছাড়াও সৈনিক পত্রিকাসহ তিনি যেসব পত্রিকায় কাজ করেছেন, সেখানে প্রকাশিত তাঁর বহু লেখাই অগ্রন্থিত রয়ে গেছে।

শাহেদ আলী ইতিহাস-সচেতন, ঐতিহ্যপুষ্ট, বাস্তবধর্মী, সমাজমনস্ক লেখক। তাঁর লেখায় মাটি ও মানুষের কথা আছে। মাটি ও মানুষের ইতিহাস, মানুষের জীবন-সংগ্রামের বিচিত্র কাহিনী, ঐতিহ্যের সুদীপ্ত আশ্বাস, সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশার নিরন্তর দোলাচলে প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় অবিমিশ্র জীবনের দ্বন্দ্বমুখর চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। বিশ্বাসে ও আচরণে তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। তাঁর সাহিত্যেও এর প্রতিফলন লক্ষ্যযোগ্য। বিশ্বাসের সাথে বাস্তবতার সংমিশ্রণে যে জীবনধর্মী সাহিত্যের সৃষ্টি হতে পারে, তার এক অনন্য উদাহরণ শাহেদ আলীর সাহিত্য। মননশীল রচনা তো বটেই, তাঁর কথাসাহিত্যেও তাঁর বিশ্বাসের সাথে বাস্তবতার ও জীবনধর্মিতার এক আশ্চর্য শিল্পসুন্দর সুসমন্বয় সুসংঘটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁকে সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মুসলিম কথাশিল্পী মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলা যেতে পারে। শাহেদ আলীর কথাসাহিত্যে বাংলাদেশের নৈসর্গিক মনোরম দৃশ্যপট, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রণয়, স্বপ্ন-প্রত্যাশাপূর্ণ জীবনের চিত্র, বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য, সামাজিক মূল্যবোধের সাথে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ বৈচিত্র্যময় জীবনচিত্র মনোরম বৈভবে অভিনব হয়ে উঠেছে।

চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে শাহেদ আলীর সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত। তরুণ শাহেদ আলী নিজেও তখন স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরাধীনতার বন্ধন-মুক্তি, স্বাধীনতার স্বপ্ন-কল্পনা, স্বকীয় আদর্শ-ঐতিহ্যের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক মুহূর্তে শাহেদ আলীর মানস-বিকাশ কীভাবে ঘটেছিল তা সহজেই অনুমেয়। এই বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পর নতুন দেশ গড়ার আবেগচঞ্চল উদ্দীপনাপূর্ণ মুহূর্তে শাহেদ আলী জাতীয় আদর্শ-ঐতিহ্যের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ঐ সময় নবগঠিত স্বাধীন দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা কীরূপ নিতে পারে বা নেয়া উচিত সে ব্যাপারেও শাহেদ আলীর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল প্রবল। শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর এই ঔৎসুক্যের কারণে তিনি একদিকে ভাষা-আন্দোলনের পথিকৃৎ আদর্শবাদী সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিশে' সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, অন্যদিকে, মুসলিম জীবন-চিত্র নিয়ে সাহিত্য বিশেষত কথা সাহিত্য কীরূপ পরিগ্রহ করতে পারে বা করা উচিত শাহেদ আলী তার উৎকৃষ্ট নমুনা হিসাবে ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে তিনি যথার্থই পথিকৃত হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য।

শাহেদ আলীর প্রথম লেখা ছোটগল্পের নাম 'অশ্রু'। তিনি তখনো স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। আধুনিক সমাজ-পরিবেশ ও যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তাঁর এসব সাহিত্যের জন্য তাঁর এ গল্পটি তখন মাসিক 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। কিশোর বয়সে লেখা এ গল্পটির মধ্যে তাঁর প্রতিভা ও সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সুবিখ্যাত গল্প 'জিবরাইলের ডানা' শাহেদ আলীকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায় এবং ছোটগল্প লেখক হিসাবে তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। ক্লাসিক মর্যাদাসম্পন্ন এ গল্পটি ১৯৫০ সনে আই.এ. ও বি.এ. ক্লাসে পাঠ্য ছিল। ১৯৮৫ সনে এস.এস.সি ক্লাসের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। 'জিবরাইলের ডানা' গল্পটি প্রকাশের পর পরই দেশে-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 'Afro-Asian Book Club' সংকলিত 'Under the Green Canopy' গ্রন্থে 'জিবরাইলের ডানা'র ইংরেজী অনুবাদ ছাপা হয়। মস্কো থেকে প্রকাশিত 'জানোতোয়ে ওবোলো' (সোনালী মেঘ) নামক সংকলনে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে 'জিবরাইলের ডানা' গল্পটি ছাপা হয়। এছাড়া, গল্পটি বিদেশী আরো কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়। এর দ্বারা এর সার্থকতা ও জনপ্রিয়তা আন্দাজ করা চলে। গল্পটির অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য ভারতের বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়, মৃনাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, জ্যোতির্ময় রায়, নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়সহ অনেক চলচ্চিত্র-নির্মাতা এর চলচ্চিত্র রূপ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের এ আগ্রহের কথা জানিয়ে শাহেদ আলীকে তাঁরা যে চিঠি লেখেন নীচে তার সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিচ্ছি। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-নির্মাতা সত্যজিৎ রায় লেখেন ঃ

"অধ্যাপক শাহেদ আলী সমীপেষু
প্রীতিভাজনেষু,

... আমার 'জিবরাইলের ডানা' গল্পটি ভাল লাগার খবর একেবারে সত্যি। এর চিত্ররূপ দেয়ার খবরটি ষোলো আনা সত্যি না হলেও একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কিছুকাল আগে গল্পটির চিত্র সম্ভাবনা নিয়ে আমাদেরই মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, গল্প সংগ্রহটির স্থানীয় প্রকাশকের সঙ্গেও এ বিষয়ে প্রাথমিক আলাপ হয়েছিল।... 'তিন কন্যা'র মত আরেকটি ছোটগল্পের চিত্র সংকলন যদি ভবিষ্যতে করি তাহলে জিবরাইলের ডানার কথা প্রথমেই চিন্তা করব এ প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিতে পারি।

গল্পটির জন্য আরেকবার আপনাকে অভিনন্দন জানাই। এটি আমি বহু চেনা পরিচিতকে পড়িয়েছি এবং ভবিষ্যতেও অনুমোদন করব।

প্রীতি নমস্কারান্তে ইতি
সত্যজিৎ রায়।"

জ্যোতির্ময় রায় 'জিবরাইলের ডানা' নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি করার 'আগ্রহ প্রকাশ করে ১৯৭৯ সনের ৩১ জানুয়ারী শাহেদ আলীকে যে চিঠি লেখেন তা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপঃ

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার 'জিবরাইলের ডানা' গল্পটি যখন প্রথম পড়েছিলাম তখনই মুগ্ধ হয়েছিলাম। একটি সূক্ষ্ম মর্মস্পর্শী কাহিনীকে আপনি যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতে আমার মনে হয় এই অনুপম নিটোল গল্পটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা যেতে পারে। আপনার ভাষা সাহিত্যের ভাষা, এই চলচ্চিত্রের ভাষা হবে দৃশ্যগত ও শ্রুতিগত। তবে আমি ডকুমেন্টারী ফিল্ম করি এবং পুঁজির সামর্থ্যও খুবই সীমিত। আমি যে রকম ছবির কথা ভাবছি সে ছবি হবে খুবই স্বল্পদৈর্ঘ্যের এবং আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে একটি তীব্র হৃদয়াবেগপূর্ণ ছবি। আপনি দেখিয়েছেন যে, কত অল্পে কত উঁচুতে উঠা যায়, আর আমিও সেই একই লক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে চাই।...

শুভেচ্ছান্তে ইতি
জ্যোতির্ময় রায়"

তৃতীয় চিঠিটি লেখেন ভারতের 'স্বর্ণকমল' বিজয়ী শিশু চলচ্চিত্রকার নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি লেখেন ঃ

"জনাব শাহেদ আলী,

আমার পরিচয় দিয়েই শুরু করি। এ বছর খগেন মিত্রর 'ভোম্বল মন্দির' শ্রেষ্ঠ শিশু চিত্রের নির্মাণের জন্য আমাকে জাতীয় পুরস্কার 'স্বর্ণ কমল' দেয়া হয়। বর্তমানে আর একটি শিশু চিত্র নির্মাণে আগ্রহী। গল্পটি আপনার লেখা। নাম 'জিবরাইলের ডানা'। আশা করি আপনার কোন আপত্তি থাকবে না। ...

– নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়
৩৯ নং প্রতাপাদিত্য প্রেস।"

দুর্ভাগ্যবশত উপরোক্ত তিনটি উদ্যোগই অজ্ঞাত কারণে শেষ পর্যন্ত সফলকাম হয়নি। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের কূটকৌশলকে এ জন্য অনেকে দায়ী করে থাকেন। এভাবে ঋত্বিক ঘটক, মৃনাল সেন প্রমুখও 'জিবরাইলের ডানা'র চলচ্চিত্র রূপদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ একই অজ্ঞাত কারণে তাঁদের উদ্যোগও ফলবতী হতে পারেনি। তবে এর দ্বারা 'জিবরাইলের ডানা'র অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। মোটকথা, দেশে-বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত 'জিবরাইলের ডানা' শাহেদ আলীর রচিত একটি ছোটগল্প। এটাকে তাঁর মাস্টারপীচ বললে অত্যুক্তি হবে না। সমগ্র বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যেও এটাকে একটি অনবদ্য রচনা বলে আখ্যায়িত করা চলে। শাহেদ আলীর অনন্য ছোটগল্প ও উপন্যাসও কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর শক্তিমত্তা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে।

অবশ্য একথা সত্য যে, 'জিবরাইলের ডানা' বাংলাদেশী মুসলিম সমাজে এক সময় যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করে। গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণ, আল্লাহ জিবরাঈল ফিরিস্তা প্রসঙ্গ নিয়ে এক সময় বিক্ষোভ আন্দোলন সংঘটিত হয়। অনেকে এজন্য তাঁকে 'কাফির',

'মুর্তাদ' ইত্যাদি বলে গালাগাল পর্যন্ত করেন। এসম্পর্কে আমার লিখিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ঃ "গল্পটি ১৯৪৮ সালে আমি লিখি। তারপর গল্পটি ইউনিভার সিটিতে বি.এতে পাঠ্য ছিল। তখন এ গল্প নিয়ে কোন বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ১৯৮০-৮৫ এর আগ পর্যন্ত এ গল্প নিয়ে কোন বিতর্ক হয়নি। অনেকে মনে করতেন এ গল্পটি এপারের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প। কবি ফররুখ আহমদের কাছে এ গল্পটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যে কারণে তিনি জিবরাইলের ডানা বইখানা সাথে সাথে রাখতেন। পাকিস্তান হওয়ার পর বলা যায় এ বইখানাই এ পারের প্রথম গল্পগ্রন্থ। কবি ফররুখ আহমদ বলতেন, আমাদের গল্প শুরু হয়েছে জিবরাঈলের ডানা থেকে। আসলে পরে যারা বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন, আমি মনে করি তারা সাহিত্য-বিচারক নন, শুধুমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটি বিচার করেছেন। কিন্তু এটি কোন ধর্মীয় গল্প নয়, এটা একটি Symbolic story মাত্র।" (শাহেদ আলী প্রদত্ত সাক্ষাৎকার ঃ বাংলা সাহিত্য সম্মেলন–সংকলন, ১৯৯২ দুবাই, পৃঃ ৬৫)।

কথাশিল্পী হিসাবে শাহেদ আলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তিনি আমাদের গ্রামীণ জীবন, পরিবেশ ও সমাজের সাধারণ মানুষের চরিত্র চিত্রায়ন করেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গ, ভাব, চেতনা ও ঐতিহ্যের বর্ণালী ছন্দ তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। সমাজ সচেতনতা ছাড়া কেউ সত্যিকার জীবনধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন না। শাহেদ আলী যথার্থ জীবনধর্মী লেখক, তাঁর লেখায় জীবন ও সমাজের বাস্তব চিত্র বাঙ্ময় রূপ লাভ করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্যানুরাগ। এটাও জীবন-বাস্তবতারই এক অবিচ্ছেদ্য দিক। তাঁর নিজের উক্তি থেকেই সমাজ-সচেতনতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি বিদেশী পত্রিকায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শাহেদ আলী বলেন ঃ

"My message is social. It is an attempt to awaken the social conscience of my people. Yes, there is a great deal of symbolism but it is rooted in my experience and environment." (Quoted from the Gulf Weekly", Dubai, 19-25, March, 1992).

অর্থঃ "সামাজিক বিষয়ই আমার লেখায় স্থান লাভ করেছে। আমার সমাজের মানুষের মধ্যে সমাজ-সচেতনতা জাগ্রত করার লক্ষ্যেই এই প্রয়াস। হাঁ, সমাজ-সচেতনতা জাগ্রত করার জন্য অনেক প্রতীকী বিষয় অবলম্বন করা যায়, তবে এক্ষেত্রে আমি আমার অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছি।"

একজন যথার্থ শিল্পীর নিকট তাঁর অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর উর্ধ্বে উঠে বা এর প্রভাবকে অস্বীকার করে কেউ প্রকৃত জীবন-শিল্পী হতে পারে না। জীবনের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ সম্পর্কে উক্ত একই পত্রিকায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে শাহেদ আলী বলেন ঃ

"My writings are about my experience, about my environment. There is a great deal about my rural life but my themes are also urban. Often, I respond to my own feelings about the anomalies in urban life, about the erosion in social values in moral standards. The sum total of my message is to illustrate and convey the sufferings, the pain and the tragedies which people are forced to bear and struggle against. I don't believe that a writer can or should try to create amything outside the context of his own experience. To be authentic, you must be a product of your own enviroment. I contradict the theory that true poets and writers are bonded to humanity at large, not to a particular place or time. A writer is born in a particular country, at a particaular time and in a particular place."

অর্থঃ "আমার লেখা মূলত আমার অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ নিয়ে। আমার লেখার একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে গ্রামীণ জনপদের কথা, তবে নাগরিক জীবনের কথাও সেখানে আছে। নাগরিক জীবনের জটিলতা, সামাজিক জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে আমার অনুভূতির কথা আমার লেখায় ফুটে উঠেছে। সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণা, তাদের দুঃসহ জীবনের মর্মন্তুদ পরিণতি যা আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং যার বিরুদ্ধে মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম সেসব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে আমার লেখায়। স্বীয় জীবন-অভিজ্ঞতার বাইরে কোন লেখকের কিছু সৃষ্টি করা বা সৃষ্টির প্রয়াস থাকা উচিত বলে আমি মনে করি না। নিজের পরিবেশ থেকেই কেবল সাড়া জাগানো জীবনধর্মী সৃষ্টি সম্ভব। যারা বলেন, যথার্থ কবি বা লেখক স্থান-কালের উর্ধ্বে কেবল মানবতার সপক্ষে উচ্চকণ্ঠ, আমি তাদের মত সমর্থন করি না। একজন লেখক একটি নির্দিষ্ট দেশ, কাল ও স্থানের অধিবাসী (তিনি তারই প্রতিনিধিত্ব করেন)।" (প্রাগুক্ত)।

এখানে শাহেদ আলী সুস্পষ্টভাবে তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের ছাপ যে তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে, সে কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। অন্য আর একটি বিদেশী পত্রিকায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকারেও তিনি প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছেন। সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ নীচে উদ্ধৃত হলো ঃ

"I have devoted to the study of life in the lower rungs of society. I give utterance to their sufferings... A writer has to have commitment for his place, his community and his time. The greatest of writers have written about their own life." ('Khaleej Times', Dubai, 20 February, 1992).

অর্থঃ "আমি সমাজের অধঃপতিত শ্রেণীর লোকদের বিষয়ে জানার জন্য আত্মনিয়োগ করেছি। আমি আমার লেখায় তাদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছি। একজন লেখক অবশ্যই তার স্থান, সমাজ ও কালের নিকট দায়বদ্ধ। একজন বড় লেখকের লেখায় তার নিজের জীবনের কথাই প্রতিবিম্বিত হয়।" ('খালিজ টাইম্‌স', দুবাই, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২)।

শাহেদ আলী তাঁর নিজ সমাজ ও পরিবেশের নিকট দায়বদ্ধ। এ সমাজের দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা দেখে তিনি ব্যথিত হন এবং তার সকরুণ চিত্র তাঁর লেখায় তুলে ধরেন। সমাজের নিকট দায়বদ্ধতার কারণেই সমাজের আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধকে অকৃত্রিম আবেগে লালন করেন ও তার স্খলনে বেদনাবোধ করেন, এটা তাঁর জীবন-বাস্তবতার এক সংবেদনশীল দিক। এ সামাজিক স্খলন-পতন-অবক্ষয় তাঁকে মর্মাহত করে, এর বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে তিনি প্রাণিত হন। তাঁর মননশীল গদ্য রচনায় তো বটেই, তাঁর জীবনধর্মী কথাসাহিত্যেও এর পরিচয় সুস্পষ্ট।

শাহেদ আলী একজন প্রতিবাদী লেখক। তরুণ বয়সেই তাঁর মধ্যে এ প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। স্কুলে অধ্যয়নকালেই তিনি 'প্রভাতী' নামে এক বিপ্লবী প্রতিবাদী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শাহেদ আলীর নিজের ভাষায়ঃ

"I was editor of a revolutionary paper called 'Probhat', way back in the early 40s. I was still a student and we were all involved passionately with the Pakistan movement. No, this was more than a political stance. I like to think of myself as a writer who expresses the aspirations of his people". (Gulf Wekkly, Dubai, 19-25 March, 1992).

অর্থঃ "আমি সেই চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকেই 'প্রভাতী' নামে এক বিপ্লবী পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। আমি তখনো ছাত্র এবং আমরা সকলেই তখন গভীর আবেগের সাথে পাকিস্তান আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলাম। এটা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক বিষয় ছিল না। আমি একজন লেখক হিসাবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের বাণীরূপ দান করাই আমার ব্রত বলে মনে করি।"

এ ব্রত শাহেদ আলী যথাযথভাবেই পালন করেছেন। তবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন শাহেদ আলীর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। তিনি নিজেও জনগণের সাথে একাত্ম ছিলেন, এ স্বপ্ন তাঁর নিজের জীবনেরও লালিত স্বপ্ন। তাই এর রূপায়ণে ও বাণী-রূপ দানে স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর মন-প্রাণ-আবেগ ঢেলে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্য হয়েছে বাস্তবধর্মী ও আবেদনশীল। এরূপ সত্যিকার মানবিক আবেদনই কোন সাহিত্যকে স্থান-কালের উর্ধ্বে চিরকালীন মহৎ সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করে। স্থান-কাল-অঞ্চলকে অস্বীকার করে নয়, বরং তা ধারণ করেই সাহিত্য এ অমরত্ব অর্জন করে। শাহেদ আলী এ কথাই বলতে চেয়েছেন এবং নিঃসন্দেহে এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সাহিত্য চিরকালীন মহৎ সাহিত্য হিসাবে গণ্য হতে পারে।

এ প্রতিবাদী চেতনার কারণেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই যে বাংলা ভাষা আন্দোলন গড়ে ওঠে, তিনি তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সনের সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে যে ভাষা আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে ওঠে শাহেদ আলী তার সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। ভাষা আন্দোলনের বিপ্লবী মুখপত্র 'সৈনিক' পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। পাকিস্তান-পূর্ব ও পাকিস্তান-পরবর্তী যুগের বিভিন্ন আন্দোলন, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাত, ভাঙ্গা-গড়া, উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হলেন শাহেদ আলী। পাকিস্তানের তেইশ বছরের বৈষম্য-বঞ্চনাপূর্ণ ইতিহাস, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তার পরবর্তীকালের নানা ঘটনা ও ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হলেন শাহেদ আলী। তাঁর সৃজনশীল সংবেদনশীল মন তা যেমন প্রত্যক্ষ করেছে, আপন সংরাগে পূর্ণ করে তেমনি তার রূপায়ণ ঘটিয়েছে তাঁর সাহিত্যে। শাহেদ আলীর সাহিত্যে তাই গণ-মানুষের জীবন, চিন্তা-চেতনা, দুঃখ-বেদনা, হাসি-আনন্দ, স্বপ্ন-কামনার প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষত এ দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধ্যান-ধারণা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ তাঁর সাহিত্যে বাঙ্ময় রূপ লাভ করেছে। সেদিক দিয়ে তাঁর সাহিত্য আমাদের জাতীয় সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত এবং তিনি এক্ষেত্রে এক আধুনিক আলোকিত ধারার উজ্জ্বল পথিকৃত।

শাহেদ আলীর প্রতিভার তুলনায় তাঁর লেখা যথেষ্ট নয়। তিনি কেন আরো লেখেননি, এ সম্পর্কে আমার লিখিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ঃ "এটি সত্য যে, আমার লেখার সংখ্যা খুব বেশী নয়, কমই বলা যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক কবি আব্দুল মান্নান সৈয়দের একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি প্রায়ই আমার সম্পর্কে বলেন যে, আমি একজন স্বল্পপ্রসূ লেখক। আমি তাঁর জবাবে বলি, এমন মানুষ আছে যার অনেক সন্তান, কিন্তু তার কোন সন্তানই মানুষ হল না। আর কেউ কেউ আছে, যার দু'একটি সন্তান, সন্তানগুলো মানুষ হলো। পিতা হিসাবে কে বেশী সার্থক, আমি মনে করি দ্বিতীয় জনই পিতা হিসাবে সার্থক। আমার আরো বেশী লেখা সম্ভব হতো। অনেক কারণ ঘটেছে জীবনে। যার জন্য সব সময় সে সুযোগ ঘটে উঠেনি।" (শাহেদ আলী প্রদত্ত সাক্ষাৎকার ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫)

এখানে গূঢ়ার্থে সমাজের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন অভিযোগ ফুটে উঠেছে। তাঁর সংগ্রামশীল জীবনে তিনি হয়ত সব সময় লেখার উপযুক্ত সময়-সুযোগ পাননি। কিন্তু একথাও সত্য যে, লেখার জন্য লেখা এটাতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। গভীর মনোযোগের সাথে শিল্প-সুন্দর, কালোত্তীর্ণ লেখার চেষ্টাই তাঁর মধ্যে দেখা গেছে। তাই দেখা যায়, তাঁর প্রায় সব লেখাই শিল্পোত্তীর্ণ, প্রসাদগুণসম্পন্ন। বাংলা কথা সাহিত্যে তিনি এক অবিস্মরণীয় নাম, বিশেষত ইতোপূর্ব কথা সাহিত্যে মুসলিম সমাজচিত্র যেখানে প্রায় উপেক্ষিত বা অনুপস্থিত ছিল, তিনি সেখানে বলিষ্ঠভাবে মুসলিম চরিত্র,

জীবনচিত্র, বিশ্বাস, সামাজিক মূল্যবোধ ও জীবন-জিজ্ঞাসার প্রাণবন্ত রূপ অংকন করেছেন। এক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুর পুনর্জাগরণের প্রদোষকালে হিন্দু সমাজে বঙ্কিমচন্দ্র যা ছিলেন, বাঙালী মুসলমানের স্বাধীনতা আন্দোলন ও নতুন দেশগড়ার আবেগাপ্লুত মুহূর্তে শাহেদ আলীও হয়ত অনেকটা তাই ছিলেন। তবে পার্থক্য এই যে, হিন্দুর নবজাগরণের প্রাণনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম-বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবাপন্ন, সেক্ষেত্রে শাহেদ আলী পুরাপুরি সাম্প্রদায়িকতামুক্ত উদার মানবিক চেতনায় ঋদ্ধ একজন আধুনিক মানুষ। তাই তাঁর লেখা মুসলমানদেরকে যেমন অনুপ্রেরণা যোগায়, অমুসলমানদেরকেও তেমনি আকৃষ্ট করে।

দীর্ঘ ষাট বছরের সাহিত্য–জীবনে শাহেদ আলী দেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুই দুটি স্বাধীনতার সূর্যোদয়, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ভাষা আন্দোলন, অসংখ্য রাজনৈতিক উত্থান-পতন-আন্দোলন, সমাজতন্ত্রের প্রতাপ ও পতন, জড়বাদী সভ্যতার নানা বিকৃত রূপ, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উত্থান প্রতিরোধে ইসলাম-বিরোধী নানা দেশী-বিদেশী চক্রের ঘৃণ্য কার্যক্রম, দমন-নিষ্পেষণ, নতুন জীবন ও নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সমাগত একবিংশ শতাব্দীর আগমন। তিনি একজন স্পর্শকাতর সচেতন মানুষ হিসাবে এসবই অবলোকন করেছেন এবং তাঁর সাহিত্য-কর্মে তিনি এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন শিল্পসম্মতভাবে। আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে শাহেদ আলী কখনো শিল্পবোধ থেকে বিচ্যুত হননি। তবে শাহেদ আলী একটি বিশ্বাসে স্থিতধী ছিলেন, যে বিশ্বাস একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিশুদ্ধ করে সত্যিকার কল্যাণকামী, শান্তিপূর্ণ-সংস্থায় পরিণত করে, এমনকি হতাশা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ বিশ্বকে প্রকৃত মানবতাবাদী শান্তিপূর্ণ বিশ্বে পরিণত করার নিশ্চয়তা দেয়। সে বিশ্বাস বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহর দেয়া ইসলাম ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই শান্তির জন্য, পরিশুদ্ধ জীবনের জন্য কল্যাণের জন্য ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্যই ছিল তাঁর জীবনের সকল কর্মায়োজন।

শাহেদ আলী তাঁর সাহিত্য-কর্ম, ভাষা আন্দোলন ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য যেসব পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ করেন তা নিম্নরূপ ঃ

বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৪), তমঘায়ে ইমতিয়াজ (১৯৭০), রাষ্ট্রপতির ভাষা-আন্দোলন পদক (১৯৮১), নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮৫), সিলেট লায়ন ক্লাব পদক (১৯৮৫), ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৬), জালালাবাদ লায়ন্স ক্লাব পদক (১৯৮৮) একুশে পদক (১৯৮৯), সিলেট যুব ফোরাম পদক (১৯৯০), বাংলাদেশ ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এ্যাওয়ার্ড, ইংল্যান্ড (১৯৯১), বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯২, ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পদক–২০০০ প্রভৃতি।

সাংবাদিক-সাহিত্যিক সানাউল্লাহ নূরী

"See how far a candle throws its beams
So shines a good deed in a naughty world"
— William Shakespeare

'প্রদীপের আলো যেমন ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে, সৎকর্মও তেমনি অসৎ পৃথিবীতে জ্বল জ্বল করে'- প্রখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়রের উপরোক্ত অমর বাণীর সারবত্তা আমরা সর্বদাই অনুভব করে থাকি। এ অন্যায়-অবিচার ও দুষ্কর্মপূর্ণ পৃথিবীতে মহৎ ও কল্যাণব্রতী মানুষের সংখ্যা বেশী নয়, কিন্তু সে ধরনের মানুষ মানব জাতির মুকুটস্বরূপ। বিশিষ্ট সাংবাদিক-সাহিত্যিক সানাউল্লাহ নূরী ছিলেন তেমনি একজন মহৎপ্রাণ,কল্যাণব্রতী মানুষ। সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁর অসামান্য অবদান চিরদিন তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। সাংবাদিক হিসাবে তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করলেও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ও মানবকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি একাধারে সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সমসাময়িক সময়ের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত।

সানাউল্লাহ নূরীর জন্ম ১৯২৮ সালের ২৮শে মে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার রামগতি থানার চর ফলকনে। তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ সালামত উল্লাহ। তিনি অবিভক্ত ভারতের উত্তর প্রদেশের ইসলামী আইন ও আরবী ভাষা-সাহিত্যের উচ্চ বিদ্যাপীঠ রামপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'দাওরা' ডিগ্রী লাভ করেন। মওলানা সালামত উল্লাহ ১৯২০-২১ সালে খিলাফত আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি ময়মনসিংয়ের গারো অঞ্চল ও আসামে দীর্ঘকাল ইসলাম প্রচারে ব্যাপৃত থাকেন। বাংলা, আরবী, ফারসী, উর্দু,হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। সুশিক্ষিত, বহু ভাষাবিদ ও ধর্মপ্রাণ পিতার আদর্শে গড়ে উঠেছিলেন সানাউল্লাহ নূরী। দাদা আমিন উদ্দীন ছিলেন উকিল এবং নানা মুনশী আব্দুর রহমান ছিলেন সুফী ও সাধক।

পাঁচ বছর বয়সে মা ও বাবার তত্ত্বাবধানে বিদ্যাশিক্ষায় তাঁর বিসমিল্লাহখানি। মা ছিলেন শিক্ষয়িত্রী, নিজ বাড়িতেই মক্তব পরিচালনা করতেন। তাঁর মক্তবে গ্রামের অনেক মেয়ে,শিশু ও বয়স্ক মহিলা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বাংলা ও আরবী ভাষা শিক্ষাদান ছাড়াও তাঁর মা মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু, মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের জনপ্রিয় উপন্যাস ' আনোয়ারা', 'গরীবের মেয়ে' প্রভৃতি এবং বিভিন্ন পুঁথিসাহিত্য পাঠ করতেন। মা-বাবার তত্ত্বাবধানে বাংলা, আরবী ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষালাভের পর সানাউল্লাহ নূরী গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। সেখান থেকে প্রথম শ্রেণীতে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবার পর ডবল প্রমোশন নিয়ে গঞ্জের অ্যাংলো-অ্যারাবিক মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর নিউ স্কীম মাদ্রাসায় সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকা গারো পাহাড়ের সানুদেশে নেত্রকোনা শহরের আঞ্জুমান হাইস্কুলে তাঁকে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। এখানে মাতুলালয়ে থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকাতে এসে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ভাষা আন্দোলন ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'তমদ্দুন মজলিশের' কাজে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ায় তিনি লেখাপড়া শেষ করতে পারেননি। পরে নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজ থেকে তিনি আই-এ ও বি.এ পাশ করেন। ১৯৪৭ সালে জগন্নাথ কলেজে অধ্যয়নকালেই সানাউল্লাহ নূরী সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি কখনো একস্থানে স্থির হয়ে থাকেননি। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কেটেছে তাঁর কর্মজীবন। তাঁর কর্মজীবনের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

- ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে সহ-সম্পাদক হিসাবে ঢাকাস্থ অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ইনসান' পত্রিকায় যোগদান। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ডা. আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী।
- ১৯৪৮ সালে 'ইনসান' বন্ধ হলে কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত 'দৈনিক আজাদে'র বার্তা বিভাগে যোগদান করেন। একই সাথে তিনি ভাষা আন্দোলনের নির্ভীক মুখপত্র 'সৈনিকে'ও কাজ করেন।
- ১৯৪৭ সালে মওলানা আব্দুল হামিদ খাঁ ভাসানী প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাকে' যোগ দেন। এরপর তিনি কিছুদিন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ঢাকা থেকে নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'দৈনিক মিল্লাতে' যোগ দেন।
- ১৯৫১ সালে খায়রুল কবীরের সম্পাদনায় 'দৈনিক সংবাদ' প্রকাশিত হলে তিনি সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন।
- ১৯৫৩-৫৪তে মাসিক 'মাহে নও'-এ কাজ করেন।
- ১৯৫৪-৬০ পর্যন্ত'মাসিক সওগাতে' কাজ করেন।
- ১৯৫৫ সালে silver Bird নামক মার্কিন প্রকাশনা সংস্থার ঢাকা শাখার পাঠ্যপুস্তক বিভাগের খণ্ডকালীন সম্পাদক পদে যোগ দেন ।

- ১৯৫৭-১৯৬৯ পর্যন্ত মার্কিন প্রকাশনা সংস্থা Franklin Publication (পরবর্তীতে Franklin Book Programs) এর ঢাকা শাখায় খণ্ডকালীন সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন।
- ১৯৫৮ সালে কিছু দিন দৈনিক নাজাতে' কাজ করেন।
- ১৯৬৪-১৯৭৯ পর্যন্ত দৈনিক পাকিস্তান' (পরবর্তীতে দৈনিক বাংলা) এ সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন।
- ১৯৭৯-৮৬ পর্যন্ত 'দৈনিক দেশে'র সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।
- ১৯৮৭ সালে স্বল্প সময়ের জন্য 'সাপ্তাহিক মেঘনা'য় কাজ করেন।
- ১৯৮৭-৯৪ পর্যন্ত 'দৈনিক জনতা'র সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন।
- ১৯৯৪-৯৭ পর্যন্ত 'দৈনিক দিনকালে' সম্পাদক ছিলেন।

সাংবাদিক হিসাবে সানাউল্লাহ নূরী বহু পত্রিকায় সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধশত বছর পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে কাজ করে সাংবাদিকতার উচ্চমান সৃষ্টির প্রয়াস পান। তিনি ছিলেন, নিরলস, যোগ্য ও নির্ভীক কলম সৈনিক। ১৯৮৮ সালে তিনি পত্রিকা-সম্পাদক ও সংবাদাদাতা সংস্থাসমূহের প্রধানদের নিয়ে 'বাংলাদেশ কাউন্সিল অব এডিটরস' নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন। ১৯৯১ সালে তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

সানাউল্লাহ নূরী ছিলেন একজন মানব-দরদী অক্লান্ত সমাজকর্মী। তিনি যেসব সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন, তার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

- জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিষ্ঠান 'ফুলকুঁড়ি আসরের' কেন্দ্রীয় সভাপতি (ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত)
- জাতীয় প্রেসক্লাব ও শিশু একাডেমীর জীবন সদস্য।
- বাংলাদেশ নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান।

সাংবাদিক-সমাজকর্মী সানাউল্লাহ নূরী পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াকালেই কবিতা লেখা শুরু করেন। অষ্টম শ্রেণীতে পড়াকালে তিনি দুইজন বিখ্যাত ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ-এর 'লুসি গ্রে' ও কীট্স-এর 'ফায়ারিং সং' কবিতার অনুবাদ করেন। স্কুলে অধ্যয়নকালেই তিনি ছোটগল্প,নাটক ও উপন্যাস রচনায় হাত দেন। দশম শ্রেণীতে পড়াকালে তাঁর রচিত উপন্যাস 'আনধার মানিকের রাজকন্যা' পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র 'দ্যুতি'তে ছাপা হয়। পরে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে এর প্রথম খণ্ড সাপ্তাহিক 'রোববারে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় এবং 'দিনকাল' পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় একত্রে প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ সানাউল্লাহ নূরীর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

উপন্যাস ঃ ১. আনধার মানিকের রাজকন্যা, ২. নিঝুম দ্বীপের উপাখ্যান, ৩. রোহিঙ্গা কন্যা, ৪. আফ্রিকানা আমার বালবাসা, ৫. সোনার হরিণ চাই।

কাব্যগ্রন্থ ঃ ১. আন্দোলিত জলপাই, ২. নিবেদিত পঙতিমালা, ৩. শান্তির পদাবলী।

শিশুতোষ রচনা ঃ ১. বুদ্ধি শেখার গল্প, ২. মানুষ যাকে ভোলেনি, ৩. চীনা পুতুলের দেশে, ৪. বঙ্গোপসাগরের রূপকথা, ৫. রূপকথা দেশে দেশে, ৬. বোশেখ আসে পাগলা ঘোড়ায়, ৭. মেঘের নৌকায় চাঁদের দেশে।

অনুবাদ ঃ ১. আদিগন্ত, ২. মোহক নদীর বাঁকে, ৩. স্বর্গের এ প্রান্তে, ৪. কর্নেল গাদ্দাফী-এর গ্রীন বুকের বঙ্গানুবাদ, ৫. ভাষার বিবর্তনে সংবাদপত্রের ভূমিকা, ৬. বিশ্বের প্রথম রিপোর্টার।

বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ ঃ ১. বাংলাদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা, ২. হি উংচাং যখন এলেন, ৩. নোয়াখালী ভুলয়ার ইতিহাস ও সভ্যতা, ৪. স্বাধীনতা বিপ্লবের মহানায়ক, ৫. উপমহাদেশের শতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৬. ইউরোপের পুনর্জাগরণে ইসলামের অবদান, ৭. মহানবীর বিশ্বচিন্তা, ৮. মহানবীর রাষ্ট্রদর্শন ও পররাষ্ট্রনীতি।

ভ্রমণ ঃ ১. পৃথিবীর দেশে দেশে ভ্রমণ, ২. মহা প্রাচীরের কথা, ৩. লোহিত সাগরের দেশে, ৪. আমু দরিয়ার দেশে, ৫. হাজার এক রাতের দেশে, ৬. দারুচিনি দ্বীপের দেশে।

অপ্রকাশিত রচনাবলী ঃ ১. বিশ্ব সাহিত্য জানালা, ২. বাংলার কৃষক বিপ্লব, ৩. ফকির মজনু থেকে তিতুমীর, ৪. স্বাধীনতা সংগ্রাম যুগে যুগে, ৫. শাহজাদী জাহান আরা (উপন্যাস), ৬. সুজা বাদশার সড়ক (উপন্যাস), ৭. প্রত্নপ্রস্তর যুগের বাংলা (ইতিহাস), ৮. বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন, ৯. বালাদেশের সমাজ সংস্কৃতি ও ভাষার বিবর্তন, ১০. আর যুদ্ধ নয় (কাবা), ১১. সাংবাদিকতায় ও কাব্যে নজরুলের বিদ্রোহ, ১২. সাহিত্যের অগ্রচারণেরা ১৩. ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি, ১৪. বিশ্বের সেরা শিশু।

উপরোক্ত গ্রন্থতালিকা সম্পূর্ণ নয়। তাঁর রচিত বিভিন্ন পান্ডুলিপি এখনো সুবিন্যস্তভাবে তালিকাভুক্ত ও প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এ ছাড়া, তিনি যেসব পত্রিকায় চাকরি করেছেন সেসব পত্রিকায় অসংখ্য সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় লিখেছেন যার অধিকাংশই সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ। এগুলোও সংগ্রহ করে গ্রন্থবদ্ধ করতে পারলে কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ হতে পারে। সানাউল্লাহ নূরী কোন গতানুগতিক সাংবাদিক ছিলেন না। তাঁর প্রতিটি সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রতিবেদন, এমনকি, সাধারণ রিপোর্ট পর্যন্ত সাহিত্য-গুণসম্পন্ন ও মানবিক আবেদনে সিক্ত। তাঁর, ভাষা, বাক্যগঠন,শব্দচয়ন ও রচনাশৈলীর মধ্যে এমন একটা শিল্পমাধুর্য ও আকর্ষণ বিদ্যমান যে তা সকল পাঠককেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে। তিনি ছিলেন এক উন্নতমানের ভাষা-শিল্পী।

ঔপন্যাসিক হিসাবে সানাউল্লাহ নূরী একজন বাস্তববাদী বলিষ্ঠ জীবনধর্মী লেখক। তাঁর 'আনধার মানিকের রাজকন্যা', 'নিঝুম দ্বীপের উপাখ্যান', 'রোহিঙ্গা কন্যা' ইত্যাদি সবগুলো উপন্যাসেই এই বাস্তববাদিতা ও জীবনধর্মিতার পরিচয় সুস্পষ্ট। মাটি ও মানুষের বাস্তব জীবন-চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। উদাহরণত 'রোহিঙ্গা কন্যার' কথা ধরা যাক। এ গ্রন্থের কাহিনী সম্পর্কে লেখক ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন ঃ

"বঙ্গোপসাগরের প্রাচীন জনপদ রোহাং তথা রোসাঙ্গভূমির চারপাশের প্রতিবেশে বিচরণ এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার এবং সংলগ্ন সব কটি চরিত্রের। এরা এই ভূখণ্ডের আদিম, মধ্যযুগীয় এবং সাম্প্রতিক ইতিহাসের ভাঙাগড়ার অন্তরালবর্তী যন্ত্রণা, ক্ষোভ এবং বঞ্চনা, অশ্রু এবং রক্তক্ষরণের সুদীর্ঘ ধারাপ্রবাহের সর্বশেষ মুখচ্ছবি। ইতিহাস কখনো অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সভ্যতার তুঙ্গে তুলেছে এদের পূর্বগামীদের। আবার কখনো রূঢ় নির্মমতায় ভূলুণ্ঠিত, রুধিরাক্ত এবং নীড়ভ্রষ্ট করেছে এদের গোটা বিড়ম্বিত সমাজটাকে। এই সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহ্নিশিখা উপাখ্যানের মুখ্য চরিত্র রোহিংগা কন্যা রাশেদা। সহিংস উৎপীড়নের শিকার এই উচ্চ শিক্ষিতা ইতিহাস-প্রবণ যুবতী ইওমা পর্বতের আদিম সেগুন-কানিয়ারির অরণ্যে পালিয়ে এসে প্রাচীন শিলার বুকে দেখতে পেয়েছে তার পূর্বপুরুষ অস্ট্রিক গুহাচারীদের পায়ের ছাপ। খাদের পরবর্তী ভূমিকেন্দ্রিক কৃষি-সংস্কৃতি এবং নাব্য জীবনধারার বিশ্বগামী প্রবাহ থেকে উৎসারিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরীয় সভ্যতা। বাংলা ভাষা এবং রোসাংগ-বাংলার পল্লবায়ন ঘটেছে যাদের বুলি, কথকথা আর বাক্‌ভঙ্গির নির্যাস চেখে নিয়ে। এই উপাখ্যানের মুখ্য উপজীব্য কর্ণফুলি, নাফ আর লেমরু নদী তীরের সাঁতরানো নরনারীর ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনযুদ্ধ। সেখানকার মইষাল আর বাথানিয়াদের সুখ-দুঃখের চালচিত্র এবং এদের পুঁথিপ্রবণ মনের রসবোধ। পুঁথিয়াল হাশমত আলী পন্ডিতের গল্পে ওরা খুঁজে পায় ওদের রসদ। পুরাতত্ত্ববিদ আহমদ আলী ওদের অতীত এবং বর্তমানের এক উচ্চনাদী কণ্ঠস্বর। যুবক মামুন উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতার মুখ্য যোগসূত্র। ইতিহাস-গবেষক রফিকের অবস্থান গোটা কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে। এই যুবকের সংগ্রামী চৈতন্য এবং তার ভালবাসার একান্ত অনুভূতি রাশেদার নীড়ভ্রষ্ট জীবনযন্ত্রণাকে সুরভিত করেছে অপার এক বিশ্বাসে।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে উপন্যাসের মূল কাহিনী অতি সংক্ষেপে কাব্যময় ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়,নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্যের সাথে মানুষের জীবনের আশা-অভীপ্সা ও সংগ্রামের চিত্রকে লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। এ বইটি পড়তে পড়তে আমেরিকার বিশ্বখ্যাত ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের অমর উপন্যাস Old Man and the Sea এর কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। জীবন-সংগ্রামের এমন বিচিত্রতর বাস্তব জীবনোপাখ্যান বাংলা সাহিত্যে অতিশয় বিরল। তাঁর অন্যান্য উপনাসেও এ জীবনধর্মিতার ছাপ সুস্পষ্ট। নূরীর ভাষা লালিত্যময়, ঝংকারময়, কাব্যিক সুষমামন্ডিত। তাঁর বর্ণনা মনোমুগ্ধকর, কাহিনী নির্মাণ ও চরিত্র চিত্রায়ণে তাঁর পারদর্শিতা প্রশংসনীয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে একজন উল্লেখযোগ্য শক্তিমান লেখক।

প্রবন্ধকার হিসাবে সানাউল্লাহ নূরী সম্ভবত সর্বাধিক সার্থক। তাঁর প্রবন্ধের ভাষাও অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও ঝর ঝরে। বর্ণনা ও যুক্তির উপস্থাপনার গুণে তাঁর প্রবন্ধও হয়ে উঠেছে চিত্তাকর্ষক। আবেগ ও মননশীলতার এক আশ্চার্য সমন্বয় ঘটেছে তাঁর প্রবন্ধে। গভীর নিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানগর্ভ গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রবন্ধে। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তুও বৈচিত্রময়। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা, নৃতত্ত্ব, জীবনের নানা বিচিত্র সমস্যা ও প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি লিখেছেন।

সাংবাদিক হিসাবে তিনি পৃথিবীর ষাটটির অধিক দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীমূলক বিভিন্ন গ্রন্থে সেইসব দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ভাষা ও মানুষের কথা বাস্তবসম্মত ও মনোরমভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে সাংবাদিক,সাহিত্যিক ও জীবনশিল্পী হিসাবে তাঁর এক অনবদ্য পরিচয় ফুঠে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের এই শাখায়ও নূরীর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অজানাকে জানার অদম্য আগ্রহ তাঁকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিচিত্র মানুষ, জনপদ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে নিয়ে গেছে। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সেসব বিচিত্র মানুষ, জনপদ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরেছেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনীমূলক রচনায়।

শিশুতোষ রচনায় সানাউল্লাহ নূরীর অবদান কম নয়। শিশুদের উপযোগী অসংখ্য ছড়া, কবিতা, কাহিনী, গল্প ইত্যাদি রচনা করেছেন তিনি। এগুলোর ভাষা যেমন সহজ, সরল ও শিশু-কিশোরদের উপযোগী, বিষয়বস্তুও তেমনি বৈচিত্রময়। তাঁর শিশুতোষ রচনার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। তাঁর শিশুতোষমূলক রচনার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হলো, তিনি তাঁর কথার বুনন এভাবে সাজিয়েছেন যেন কচি-কিশোর পাঠকদের সাথে তিনি আলাপচারিতায় মগ্ন হয়েছেন। শিশু মনস্তত্ত্ব অনুধাবন, শিশু-মনের নানা কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানে নূরী অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। শিশু-কিশোর মনোরঞ্জনে তাই সানাউল্লাহ নূরীর কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।

কবি হিসাবে সানাউল্লাহ নূরীর তেমন পরিচিতি নেই। যদিও তিনি শিশু-কিশোর ও বড়দের উপযোগী বেশ কিছুসংখ্যক কাব্য রচনা করেছেন। সাংবাদিক-সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর সমধিক খ্যাতির কারণে কবি হিসাবে তাঁর পরিচিতি হয়ত অতটা ব্যাপকতা লাভ করেনি। তাছাড়া, তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'আন্দোলিত জলপাই' প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে। মানব-শ্রেষ্ঠ হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামকে নিয়ে লেখা তাঁর 'আন্দোলিত জলপাই' এক অনুপম কাব্যগ্রন্থ। তাঁর হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের অনাবিল প্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যে। তাঁর ইতিহাস-চেতনা ও অধ্যাত্মবোধের এক অসাধারণ প্রকাশও পরিলক্ষিত হয় এ কাব্যে। এখানে 'আন্দোলিত জলপাই' থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি। এখানে রাসূল (সঃ) এর মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা কবি তাঁর অনুপম ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

"উদ্বেলিত শিহরিত আজ তাঁর
অতলান্ত বিশাল হৃদয়
সদয় চক্ষুতে তাঁর আন্দোলিত
এক-আকাশ স্নিগ্ধশ্যাম
জলপাই শাখা।
কণ্ঠে তাঁর উচ্চারিত সৌভ্রাত্রের
উদ্ভাসিত পঙতিমালা
ওষ্ঠপুটে তাঁর জাগমান
লোহিত সাগর তটের
নিদ্রামগ্ন পুষ্পদল কলি।

শুনে তাঁর পদধ্বনি
কণ্ঠে তাঁর সাম্যগান শুনি
উড়ে এল যেন মুহূর্তেই
এক ঝাঁক শুভ্র ডানা কবুতর
সুউচ্চ সিনাইয়ের চবুতর হতে।

... .

বললেন তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে;
শোনো বন্ধুরা নগরের
শোনো আমন্ত্রণ নিকট বন্দরের–
আজ ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা–
দায়মুক্ত আজ তারা
ছিল যারা বাঁধা একদিন
সন্ত্রাস আর বিভ্রান্তির জটাজালে।

আজ বিজয় নয়
ঘৃণা নয়, প্রতিশোধ নয় কোনো
আজ নির্বাধ স্বাধীনতা সব মানুষের
স্বাধীনতা সব নারী-পুরুষের
দাস এবং ক্রীতদাসদের।
বাহু প্রসারিত আজ বন্ধুত্বের
মিত্রতার এবং সুমধুর মিলনের।
ঘরে ঘরে তোমাদের উচ্চারিত
হোক আজ
কেবল শান্তির অনির্বাণ বাণী।

'আন্দোলিত জলপাই' সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি-সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দ বলেন ঃ

"সানাউল্লাহ নূরী ছিলেন মূলত গদ্যলেখক। সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের জোড় কলম নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি– কিন্তু জীবনের উপান্তে এসে তিনি যে এ রকম কবিতা লিখে ফেলবেন– এতো অভাবিত। এমন কিছু আত্মিক উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, যার জন্য ইসলামের মহানবী (স) সম্পর্কে এ রকম একটি অভূতপূর্ব বই তিনি লিখে ফেললেন। আবার এক হিসাবে আশ্চর্যেরও নয়। আমার পরিষ্কার মনে আছে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক হাসান হাফিজুর রহমান একবার মৌখিক আলাপে সানাউল্লাহ নূরীর গদ্যের ভাষাকে বলেছিলেন, পুষ্পিত ভাষা। এই পুষ্পিত ভাষার অধিকারী যিনি তাঁর পক্ষে 'আন্দোলিত জলপাই'-এর মত কবিতা গ্রন্থ রচনা সম্ভবপর খুবই সম্ভবপর। শুধুমাত্র এই গ্রন্থের সাক্ষ্যেই বলা যায়; সানাউল্লাহ নূরী অনেক যশস্বী তথাকথিত কবির চেয়ে বেশি কবি। জীবনের অন্তবেলায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি সম্পর্কে তিনি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলী পেশ করে গেলেন।" (আব্দুল মান্নান সৈয়দ ঃ ঐতিহ্যসচেতন আধুনিক, দৈনিক ইনকিলাব, ২২ জুন, ২০০১)।

সানাউল্লাহ নূরীর গ্রন্থ–তালিকা থেকে সুস্পষ্ট যে,তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সাংবাদিকতা ছাড়াও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান রয়েছে। উপন্যাস, গল্প, কাব্য, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, শিশুতোষ রচনা, রূপকথা ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান বাংলা সাহিত্যে তাঁকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিশু-সাহিত্যিক, গবেষক, সমাজকর্মী, সংগঠক ইত্যাদি নানামুখী গুণাবলীর অধিকারী অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী সানাউল্লাহ নূরী চূড়ান্ত বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য-কর্মের জন্যই চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে আমার ধারণা।

আমাদের সাংবাদিকতা ও সাহিত্য-জগতের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সানাউল্লাহ নূরী বাহাত্তর বছর বয়সে ১৫ জুন ২০০১ সনে ইন্তিকাল করেন।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী লেখক হিসাবে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। কবি হিসাবে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটলেও পরবর্তীতে আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণামূলক লেখায় নিজেকে তিনি এত নিমগ্ন রাখেন যে, এক সময় তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতি তাঁর কবি-খ্যাতিকে ছাড়িয়ে যায়। তবে কাব্য-চর্চায় তিনি কখনো বিরতি দেননি। বরং উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে সর্বদা ব্যাপৃত রেখে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। কখনো পেশাগত কারণে, কখনো সামাজিক দায়িত্ববোধের তাগিদে আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণার দিকটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকলেও কাব্য-চর্চাকে তিনি কখনো উপেক্ষা করেননি।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর সমগ্র সাহিত্য-কর্ম বিবেচনায় রেখে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তিনি মূলত ও প্রধানত কবি। একথার দ্বারা সাহিত্যিক মাহফুজউল্লাহকে কোনক্রমেই খাটো করা হয় না। বরং একথা বলার তাৎপর্য এই যে, একজন বড় মাপের সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ মূলত কবি এবং তাঁর সমকালের একজন উল্লেখযোগ্য কবি-প্রতিভা।

কবিরা যখন গদ্যের আশ্রয় নেন, তখন গদ্য হয়ে ওঠে প্রসাদ-গুণসম্পন্ন, লালিত্যময়, নিপুণ শব্দ-বিন্যাসে ও কাব্য-সৌন্দর্যে মহিমময়। মাহফুজউল্লাহর ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। তাঁর কবিতা যেমন আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা ও নিটোল ভাবৈশ্বর্যে সমৃদ্ধ, তাঁর গদ্যও তেমনি সহজ-সাবলীল, লালিত্যময় প্রকাশভঙ্গী ও চিন্তা-চেতনা-মননশীলতায় সুস্মিত। কবিতার আবেদন মনে, মননশীল রচনার আবেদন মস্তিষ্কে। আবেগের সাথে মননের যখন সমন্বয় ঘটে তখন তা মন ও মস্তিষ্ক উভয় ক্ষেত্রেই সাড়া জাগায় এবং তার গ্রহণযোগ্যতাও হয় সমধিক। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর কবিতায় আবেগের সাথে যেমন মননশীলতার সংযোগ ঘটেছে, তাঁর গদ্য রচনায় তেমনি মননশীলতার সাথে

আবেগের খানিকটা আশ্লেষ জড়িত হয়ে তাঁর গদ্যের ভাষাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে এবং তাঁর রচনার বিষয়কে করেছে উপভোগ্য ও রসোত্তীর্ণ।

১৯৩১ সনের ১লা জানুয়ারী [সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাঁর জন্ম ১৯৩৬ সন বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তাঁর প্রকৃত জন্ম সন ১৯৩১ (বাংলা ১৩৩৮) বলে তিনি আমাকে জানিয়েছেন।] বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত নাওঘাট গ্রামে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর জন্ম। পিতা আব্দুল আওয়াল এবং মাতা লুসিয়া খাতুন। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ১৯৫৫ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ক্লাসে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি পাঠ সমাপ্ত করেননি।

১৯৫৬ সালে তিনি তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা মুখপত্র সাহিত্য-সাময়িকী 'মাহে নও'-এর সহ-সম্পাদক হিসাবে চাকুরী নেন এবং ১৯৬১ পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি মাসিক "পুবালী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর যোগ্য সম্পাদনায় ঐ সময় 'পূবালী" একটি উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। ১৯৬৪ সালে তিনি 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর (পরবর্তীতে 'দৈনিক বাংলা') ফিচার-এডিটর হিসাবে যোগদান করেন এবং অধুনালুপ্ত 'দৈনিক বাংলা'র সিনিয়র সহকারী সম্পাদক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি 'নজরুল ইন্সটিটিউট'-এর প্রতিষ্ঠাকালীন নির্বাহী পরিচালক হিসাবে ১৯৮৫-১৯৯৫ পর্যন্ত নয় বছর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। 'নজরুল একাডেমী'র প্রতিষ্ঠার সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর সাহিত্য-কর্মের একটি তালিকা নীচে প্রদত্ত হলো :

কাব্য : ১. জুলেখার মন (১৯৫৯), ২. অন্ধকারে একা (১৯৬৬), ৩. রক্তিম হৃদয় (১৯৭০), ৪. আপন ভুবনে (১৯৭৫), ৫. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর কাব্য-সম্ভার (১৯৮২), ৬. বৈরিতার হাতে বন্দী (১৯৯০), ৭. কবিতা সংগ্রহ– মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (২০০১)। এছাড়া, তাঁর অগ্রন্থিত কবিতার সংখ্যা প্রায় পাঁচশো।

প্রবন্ধ গ্রন্থ : ১. সমকালীন সাহিত্যের ধারা, ২. নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা, ৩. নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ, ৪. বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ৫. সাহিত্য সংস্কৃতি জাতীয়তা, ৬. বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা প্রীতি, ৭. বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন, ৮. সাহিত্যের রূপকার, ৯. সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ১০. মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ, ১১. মুসলিম ট্রাডিশন ইন বেঙ্গলী লিটারেচার, ১২. বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি নজরুল, ১৩. কবিতা ও প্রসঙ্গ কথা, ১৪. ফররুখ প্রতিভা : তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য, ১৫. মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ১৬. ভাষা আন্দোলনে আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবত মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ অবিরত লিখে চলেছেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই উভয় বাংলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর কবিতা ছাপা হয়। পঞ্চাশের দশকেই কবি হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন ও

প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর কাব্য-চর্চা ও সাহিত্যিক জীবনের স্ফুরণ কীভাবে ঘটে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাহফুজউল্লাহ বলেন ঃ

"ছবি আঁকতে আঁকতে কৈশোরেই কবিতা লেখায় হাতে-খড়ি হয়েছিল। তারও আগে মন বাঁধা পড়ে গিয়েছিল সুর, ধ্বনি, ছন্দ, যতি ও মিলের সম্মোহনে। পুঁথিপাঠ, কবিতা আবৃত্তি ও গান শুনে মন উদাস আর তন্ময় হয়ে যেতো, চোখের সামনে ভেসে উঠতো যত রূপকথা ও রূপ-কাহিনী। সেই অচেনা ও বিস্ময়কর জগতের ছবিই ধরা পড়তো কাগজের ক্যানভাসে, কৈশোরে আঁকা কাল্পনিক চিত্রকর্মে। তারই পাশাপাশি রূপ নিতো পরিবেশ ও প্রকৃতি, চেনা-জানা জগতের মানুষ, তাদের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনা।

একদা এই ছবির জগৎ দখল করে নিলো কবিতা, তুলির বদলে হাতে এলো কলম। শুধু ছন্দোবদ্ধ রচনায়ই মন বাঁধা পড়ে রইলো না, স্কুল-জীবনেই আগ্রহ জাগলো কবিতা, গল্প-উপন্যাস- বিশেষত ডিটেকটিভ উপন্যাস রচনায়। কিন্তু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কবিতাই ছিল প্রধান আরাধ্য বিষয়, এবং শেষ পর্যন্ত কবিতারই হলো জিৎ, এই ছন্দোবদ্ধ রচনাই মন অধিকার করে রেখেছে গত পঞ্চাশ বছর। অবশ্য গত চার দশক ধরে অব্যাহতভাবে গদ্য-চর্চা ও প্রবন্ধ রচনার ফলে কবিতা কখনো-কখনো হয়েছে কিছুটা উপেক্ষিত, কিন্তু তার প্রতি গভীর ও আন্তরিক ভালবাসায় কখনো কার্পণ্য ঘটেনি।" (মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ঃ নিবেদন/কবিতা সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ, মে, ২০০১)।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর প্রথম কাব্গ্রন্থ 'জুলেখার মন' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালের জুন মাসে। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৫৩-১৯৫৯। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেছেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক কবি ফররুখ আহমদকে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরই তিনি বিদগ্ধ পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। তাঁর এ কাব্যে প্রেম, ঐতিহ্য ও নিসর্গ একত্রে ছায়া ফেলেছে। সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"একটি মেয়ের চোখে দেখি আমি সমুদ্রের নীল,
প্রতিদিন, প্রতি-সন্ধ্যা তার দুটি চোখ যেন জ্বলে-
যেমন আকাশে জাগে রূপালি রেখার ঝিল্‌মিল্‌;
না-বলা অনেক কথা সেই মেয়ে দু'টি চোখে বলে।

তা'র গায়ে কে মেখেছে লাবণ্যের গোলাবী-পরাগ!
সে যেন ফুলের মতো হেসে ওঠে সবুজ সকালে
তার মুখ-অবয়বে লাগেনি তো কলঙ্কের দাগ,
ফুটন্ত পদ্মের মতো ফুটে আছে চিকন-মৃণালে।

লাবণ্যময়ীর দেহে উচ্ছ্বসিত প্রথম যৌবন-
তাকে পেলে ফিরে পাই স্নিগ্ধ এই পৃথিবীর মন।"
(একটি মেয়ের চোখে ঃ জুলেখার মন)

এখানে প্রেমের কথা আছে, একজন লাবণ্যবতী সুন্দরী, রমণীর বর্ণনা আছে। কিন্তু সেটা কত স্বচ্ছ, সুন্দর, আবেগময়, রুচিশীল বর্ণনা। মাহফুজউল্লাহর প্রেমের কবিতায় শরীরী কামনা-বাসনা, যৌনতা, অশ্লীলতার লেশ মাত্র নেই। তাঁর প্রেম হলো তাঁর হৃদয়ের গভীর অনুভূতিসঞ্জাত এক নির্মল আত্মিক উপলব্ধি। প্রেম ও প্রেয়সীর সৌন্দর্যকে তিনি সর্বদা প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাথে সমান্তরালভাবে দাঁড় করিয়েছেন। তাই নারীপ্রেমের মধ্যেও তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিপ্রেমের অনুধ্যান করেছেন। ফলে মাহফুজউল্লাহর প্রেমিক সত্তা বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যময় হয়ে উঠেছে। সমকালীন অনেক কবি থেকেই এক্ষেত্রে মাহফুজউল্লাহর স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঐতিহ্য-প্রীতি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর একটি সহজাত বিষয় বলে মনে হয়। চল্লিশের দশকে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানগণ যখন ইংরেজদের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে মুসলমানদের জন্য এক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে লিপ্ত, তখন আমাদের স্বকীয় আদর্শ, ইতিহাস, ঐতিহ্যের গৌরবময় পরিচিতি উদ্ধারে আমাদের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সৃজনশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ এক প্রত্যয় ও আবেগানুভূতির সৃষ্টি হয়। শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্দীন, ফররুখ আহমদ, বেনজীর আহমদ, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান, আহসান হাবীব প্রমুখ সেই বিশেষ যুগ-পরিবেশে জাতির স্বপ্ন-কল্পনাকে রূপায়িত করার প্রয়াস পান। এই বিশেষ যুগ-পরিবেশেরই উত্তরাধিকারিত্ব পেয়েছেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। তাই ঐতিহ্য-প্রীতি মাহফুজউল্লাহর অনেকটা সহজাত। 'জুলেখার মন'-এ এর প্রকাশ স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্যযোগ্য।

ফররুখ আহমদের অনুরাগী মাহফুজউল্লাহ এক্ষেত্রে স্বভাবতই তাঁর পূর্বসূরীর দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। তাঁর কবি-কল্পনা, শব্দ-চয়ন, রূপকল্প নির্মাণে এ প্রভাব অনেকটা লক্ষ্যযোগ্য। কিন্তু মাহফুজউল্লাহ অনুকরণ-প্রয়াসী নন। তিনি সর্বক্ষেত্রে তাঁর নিজস্বতা ও স্বকীয় প্রতিভার উন্মোচনে সতত আগ্রহী। ফররুখ আহমদের পথ ধরে তিনি চলতে চেয়েছেন, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান মাহফুজউল্লাহ্ চলার পথে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত পথ করে নিয়েছেন। তাই পুঁথি সাহিত্যের আখ্যান ও চরিত্র নিয়ে তিনি সম্পূর্ণ আধুনিক ভাব, ভাষা, রুচি ও আঙ্গিকে সম্পূর্ণ আধুনিক কবিতা নির্মাণ করেন। এটা তাঁর শক্তিমত্তার এবং সে অর্থে মৌলিকতারও পরিচয় বহন করে।

নিসর্গ-প্রীতি মাহফুজউল্লাহর কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শেলী, কীটস্, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত মাহফুজউল্লাহ প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যে একান্ত মুগ্ধ। বাংলার মনোরম শ্যামল প্রকৃতি চিরদিন কবি-শিল্পীদেরকে আকর্ষণ করেছে। কালিদাস, বিদ্যাপতি, আলাওল, রবীন্দ্রনাথ, জসীমউদ্দীন, জীবনানন্দ এঁরা সকলেই প্রকৃতির কবি। তাঁদের কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনা আছে, বিশেষভাবে প্রকৃতির সাথে একাত্মতা অনুভব করেছেন তাঁরা। নজরুল-ফররুখ বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি হিসাবে খ্যাত না হলেও তাঁদের কবিতায়ও প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের অপরূপ বর্ণনা আছে। মূলতঃ সব কবি-শিল্পীই

প্রকৃতি-প্রেমে মুগ্ধ এবং কম-বেশী সকলের কাব্য-কবিতায়ই প্রকৃতির বর্ণনা আছে। মাহফুজউল্লাহও সে রকম একজন নিসর্গপ্রেমী। তাঁর কবি-কল্পনা, হৃদয়ের একান্ত অনুভূতির বিস্তার ঘটেছে প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। প্রকৃতির বর্ণনায় কবি সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এখানে দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

"অফুরন্ত বৃষ্টি চাই আজ।
গ্রীষ্মের দুপুরে ক্ষীণ-কণ্ঠে বাজে কান্নার আওয়াজ
অফুরন্ত বৃষ্টি চাই আজ॥

আষাঢ়ে যেমন ছিল নতুন মেঘের অভিসার
এখন এখানে যদি স্নিগ্ধ ছায়া তা'র
পাওয়া যেতো
অথবা, চঞ্চলা সেই শ্রাবণ-রাতের কোনো নদী
বয়ে যেতো যদি–
তা'হলে হৃদয় হতো আঙুরের রসে টুপ্‌টুপ
হঠাৎ আকাশ-প্রান্তে যদি বৃষ্টি নামে ঝুপ ঝুপ!"
(বৃষ্টির জন্য ঃ জুলেখার মন)

"ঘুম নেই দু'চোখে আমার।

এখন রাতের ছোঁয়া সময়ের পাখীর পালকে;
মাঝে মাঝে ছায়া-অন্ধকারে
আকাশে ছিটানো তারা-অবারিত তারার জৌলুস।"
(তারার প্রেম ঃ জুলেখার মন)

মাহফুজউল্লাহ প্রকৃতিকে প্রেয়সীর সমান্তরাল করে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর আরাধ্য নারীকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যেই কবি তাঁর প্রেয়সীর অনুধ্যান করেন। কবির মনের আনন্দানুভূতি প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণ-সুষমায় নানাভাবে পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। 'জুলেখার মন'-এর নাম কবিতায় কবি বলেনঃ

"দক্ষিণের বাতায়নে আসে স্নিগ্ধ মালতীর ঘ্রাণ,
সুন্দরী জুলেখা জাগে রাত্রি-নৈশব্দের বুকে
ঘুমের ঝরোকা তার খুলে দিয়ে চাঁদের আলোকে
সারা রাত কান পেতে শোনে দূর অরণ্যের গান;
যেখানে তারার ফুল গুচ্ছবদ্ধ রয়েছে অম্লান,
দুধের মতন চাঁদ একাকীই জানালায় জ্বলে–
আকাশ-সমুদ্র থেকে সে-ও যেন মৃদু কথা বলে
জুলেখা শুনেছে আজ সেই দূর-চাঁদের আহ্বান।

জোৎস্নায় ভরেছে বন, তারি ঢেউ লাগে বাতায়নে,
মনের অরণ্যে তার প্রেমের সোনালী ফুল ফোটে
কে যেন একাকী এসে বলে তাকে একান্ত অস্ফুটে–
অরণ্যের গন্ধ মেখে প্রেমিকের স্বপ্ন নিয়ে মনে ঃ
'প্রেমের অজস্র ফুল তুলে নেবো আমরা দু'জন'
মালতীর সুরভিতে জেগে ওঠে জুলেখার মন!"
(জুলেখার মন ঃ জুলেখার মন)

'জুলেখার মন' মাহফুজউল্লাহ্‌র প্রথম কাব্যগ্রন্থ। আমার ধারণা, এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবি-কর্মও বটে। এখানে তাঁর আবেগের প্রকাশ ও অনুভূতির প্রগাঢ়তা অন্যান্য কাব্য থেকে অধিক বাঙময়। ফলে 'জুলেখার মন' পাঠক-মনকে নিবিড়ভাবে আবিষ্ট করে। এটি প্রকাশের পর বিদগ্ধ সমালোচকেরা এ সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেন তা থেকে সংক্ষেপে দু'একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বিশুদ্ধ গীতি-কবিতার শিল্পী। কবিতা ব্যক্তিগত অনুভব ও চিন্তার শিল্পসম্মত প্রকাশ, এই তো গীতি-কবিতার লক্ষণ। বিশুদ্ধ গীতি-কবিতা আপনাতেই সম্পূর্ণ; শিল্প-সুন্দর রূপ-সৃষ্টি তার লক্ষ্য, কোনো পার্থিব বা পরমার্থিক প্রয়োজন সাধন তার কাজ নয়। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর কবিতায় প্রেমের চেয়ে প্রকৃতিরই প্রাধান্য।.... তাঁর ভাষা ও ছন্দের পালিশ আছে। বাংলা কবিতার তিনটি প্রধান ছন্দেই তিনি কবিতা লিখেছেন, তবে অক্ষরবৃত্তই তার প্রিয়তম ছন্দ। ....." (আব্দুল হক, সমকাল, আশ্বিন, ১৩৬৬)।

"কবিতাকে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ অনুভূতির জগতেই আবিষ্কার করেছেন। বাস্তব সেখানে যদিবা উপস্থিত হয়েছে, তা-ও রোমান্সের রসে সিক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়ে। 'জুলেখার মন' আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়– আধুনিকতার চোরাগলিতে হারিয়ে গেলেও মানুষের মন এখনো ঐশ্বর্যরিক্ত হয়নি। তাতে স্নেহ, প্রেম, সৌন্দর্যবোধ, আদর্শনিষ্ঠা, ঐতিহ্য-প্রীতি আজও অনেক পরিমাণে ক্রিয়াশীল।... লেখক মূলত রোমান্টিক, আর তাঁর রোমান্টিক মন ইসলামী ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শের দ্বারা কতকটা প্রভাবিত। পুঁথি-সাহিত্যের নব রূপায়ণের প্রচেষ্টায়, কাব্যের নামকরণে, তাঁর এ-বিশিষ্ট মানসিকতার পরিচয় মিলে। তবুও মাহফুজউল্লাহ মূলত রোমান্টিক কবি; বিশুদ্ধ রোমান্টিক কবিতা রচনায়ই তাঁর কৃতিত্ব সমধিক। আর তাঁর রোমান্টিক-মনের অবলম্বন প্রকৃতি, প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ।... মাহফুজউল্লাহর কাব্যে প্রকৃতিরই প্রাধান্য। এ প্রকৃতি তাঁর রোমান্টিক-মনের স্পর্শে অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। চিত্রকল্প সৃষ্টিতে, উপমার প্রয়োগে ও সুষ্ঠু শব্দচয়নে এসব ক্ষেত্রে মাহফুজউল্লাহর কৃতিত্ব কম নয়।... মাহফুজউল্লাহর কাব্যে ভাষা ও ছন্দের ব্যবহারে মুন্সিয়ানার পরিচয় রয়েছে প্রায় সর্বত্র।" (সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পূবালী, মাঘ, ১৩৬৭)।

"পুঁথি-সাহিত্যের ধারার সঙ্গে তার কাহিনী, শব্দ-বিন্যাসরীতি এবং শব্দের বয়ন-কুশলতা তথা ফ্রিজোলজির সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেগুলোর স্বীকরণ সাধন করে শালীন কাব্য-সাহিত্যে তার ব্যবহার করতে পারলে আমাদের একালের সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে নিঃসন্দেহে। সম্প্রতি প্রকাশিত মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর 'জুলেখার মন' (১৯৫৯) কাব্যটির কয়েকটি কবিতায় ফররুখ আহমদ-প্রদর্শিত পথে পুঁথি-সাহিত্যের বাক-বিন্যাসরীতি ও তাঁর স্বপ্ন-কল্পনার অনুবর্তন আমাদের সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে..." (অধ্যক্ষ মুহম্মদ আব্দুল হাই ঃ 'ভাষা ও সাহিত্য')।

"তাঁর (মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ) কবিতায় পুঁথি-সাহিত্য-ধারার অনুরণন লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের ঐতিহ্য, শ্রেষ্ঠত্ব কাব্যের মাধ্যমে লালন করা তাঁর কবি-স্বভাবের অন্তর্গত।" (সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত কবিতা সংকলন)।

মাহফুজউল্লাহর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অন্ধকারে একা'র রচনাকাল ১৯৫৭-৬৬। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালের অক্টোবরে। ৫০টি সনেট বিশিষ্ট এ কাব্যটি মাহফুজউল্লাহর কবি-প্রতিভার একটি বিশেষ দিক উন্মোচন করেছে। বাংলা কাব্যে সনেটের প্রথম প্রবর্তক ও সার্থকতম রচয়িতা হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইংরেজী ও গ্রীক কাব্যকলার অনুসরণে তিনি বাংলা ভাষায় চৌদ্দ লাইনবিশিষ্ট এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ঠাস-বুননের কাব্য-কলার প্রবর্তন করেন। ফররুখ আহমদের এটি একটি প্রিয় কাব্য-ফর্ম। সনেট রচনায় তিনি যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করেছেন। এক্ষেত্রে মধুসূদনের পরে তাঁকেই সার্থকতম সনেট-রচয়িতা বলে বিবেচনা করা হয়। বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক সংখ্যক সনেট রচনার কৃতিত্বও ফররুখ আহমদের। শিল্প-সচেতন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর কৃতিত্বও এক্ষেত্রে কম নয়। ফররুখ আহমদের পরেই সর্বাধিক সংখ্যক সনেট-রচয়িতা মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। তাঁর সনেটে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় মেলে। গভীর শিল্প-সচেতনতা ও নিপুণ কলাবিদ হিসাবে তাঁর সনেটও হয়েছে শিল্প-সফল। তাই বাংলা কাব্যে সনেট রচয়িতা হিসাবে মধুসূদন-ফররুখের পরেই মাহফুজউল্লাহর কৃতিত্ব স্মরণযোগ্য।

মাহফুজউল্লাহর এ সনেট গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন সুধীজন এর প্রশংসা করে যেসব মন্তব্য করেন সংক্ষেপে তার দু'একটি নীচে উদ্ধৃত হলো। বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল ফজল বলেন ঃ

"পঞ্চাশটি সনেটের এ সংকলনে আপনার মনের পঞ্চাশটি মুহূর্ত যেন ধরা পড়েছে– ধরা পড়েছে ছন্দের সংহত বন্ধনে। সনেট এক দুরূহ শিল্পকর্ম—ভাষা, ছন্দ আর বক্তব্যে এতটুকু শৈথিল্যের সুযোগ নেই এখানে। তাই খুব কম কবিই সনেট রচনায় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।... আপনার প্রতিটি সনেট আমার ভাল লেগেছে।... এ সনেটগুলিতে আপনার মন কোন সংকীর্ণ গণ্ডিতে বাধা পড়েনি– আশ্চর্যভাবে প্রসারিত আপনার মনের দিগন্ত।... সনেট রচনায় আপনার দক্ষতা আর সাফল্যের নিঃসন্দেহ স্বাক্ষর রয়েছে 'অন্ধকারে একা'য়।" (৩০.১.৬৭ তারিখে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহকে লেখা পত্রের অংশ বিশেষ)।

"প্রথম বই থেকে দ্বিতীয় বই পর্যন্ত মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ অনেক পথ অতিক্রম করেছেন। এই অতিক্রম তাঁর কবি-চিত্তে সমৃদ্ধি এনেছে, তাঁর হৃদয়কে অভিজ্ঞ করেছে, চেতনাকে সংহত করেছে। প্রথম বই 'জুলেখার মন'-এ প্রায় বর্ণনামূলক উল্লেখ থেকে তিনি এসে পৌঁছেছেন বক্তব্যের ব্যাপ্তিতে, যে বক্তব্য তিনি চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে সংহত করেছেন, অভিজ্ঞতার পর্যায়ভেদ সম্বন্ধে সতর্ক হয়েছেন। বর্ণনামূলক অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্লেষণমূলক অভিজ্ঞতায় পৌঁছাতে গেলে যে পথ অতিক্রম করে যেতে হয় তার ছাপ পড়েছে এখানে। প্রকৃতি ও প্রেম তাঁর হৃদয়ে আগে যে বর্ণনামূলক উচ্চারণ ও উচ্ছ্বাস জাগাতো, তার বদলে এসেছে বক্তব্যের বহুমুখী বিস্তার, যে-কোন ঘটনাকে বক্তব্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করার সংকল্প উচ্ছ্বাসের বদলে আবেগের অন্তর্লীন শৃঙ্খলাবোধ প্রসঙ্গে আগ্রহ।... তাঁর কবিচিত্তে যে পরিবর্তনের ঋতু দেখা দিয়েছে, এ তারই ইঙ্গিতবহ।... তাঁর আগের কবিতার চেয়ে এখনকার কবিতা ভিন্নধর্মী। তাঁর সমসাময়িকেরা যে-দ্বন্দ্বে পীড়িত তিনি তা থেকে মুক্ত নন। তাঁর কাব্যবিষয়ক ধারণা স্পষ্ট, ঋজু কবিতার মূল বিশ্লেষণে স্বদেশের গভীরে, মর্মে.. কবিতা পড়ে মুগ্ধ হতে হয়, অনেক ভাবনা জাগে মনে, নানা ইঙ্গিত, বিকীর্ণ, কিন্তু সংহত কারুকর্মের জন্য কবিকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। " (বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, পূবালী, ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা)।

"অন্ধকারে একা' মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সাহেবের সদ্য প্রকাশিত সনেট কাব্য। ৫০টি সনেটই এ-কাব্যের অঙ্গালঙ্কার।.... 'অন্ধকারে একা' কাব্যে প্রত্যেকটি সনেটের প্রত্যেকটি পংক্তিই অষ্টাদশ অক্ষরবিশিষ্ট। পংক্তির অক্ষর ১৪ স্থলে ১৮ বলে আলোচ্য কাব্যের সনেটের ছন্দে সঙ্গীত-গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কবিতায় তা সুপরিস্ফুট হয়েছে।... তাঁর সনেট অনায়াসে পাঠকের মনে আনন্দরস সিঞ্চনের ক্ষমতা রাখে।... সমকালীন যুগ-চিত্র এবং স্বদেশপ্রেম তাঁর সনেটে সবচেয়ে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। এগুলো সরস ও উপভোগ্য। কবি বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার রঙ মিশিয়ে অতি সন্তর্পণে অতি সংযতভাবে তাঁর কাব্যদেহ নির্মাণ করেছেন। বস্তুত মৃন্ময়ধর্মী (Subjective) কাব্যকলায় কবির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গী প্রশংসনীয়। আলোচ্য-কাব্যের শেষের দিকের সনেটগুলি অধিকতর মর্মস্পর্শী।" (অধ্যাপক আব্দুল গফুর, সওগাত, মাঘ, ১৩৭৩)।

মাহফুজউল্লাহর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রক্তিম হৃদয়' প্রকাশিত হয় ১৩৭৭ সনের (১৯৭০) ১১ই জ্যৈষ্ঠ। গ্রন্থভুক্ত কবিতাসমূহের রচনাকাল ১৯৬৬-৭০। 'রক্তিম হৃদয়'-এর অধিকাংশ কবিতাই সনেট জাতীয়। তাঁর এসব কবিতায় গভীর হৃদয়াবেগের প্রকাশ ঘটেছে। কঠিন এবং অনেক সময় নির্দয় বাস্তবতার কষাঘাতে কবির হৃদয় রুধিরাক্ত হয়েছে, যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে। প্রতিদিনের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা-ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই জীবনের নিরন্তর যাত্রা। কবি এ গ্লানিময়, ব্যথা-জর্জর জীবন ও জগতের চিত্রই তুলে ধরেছেন তাঁর 'রক্তিম হৃদয়ে'র বিভিন্ন কবিতায়। কবি বলেন ঃ

"এ রক্তিম হৃদয়ের সব দুঃখ ফোটাবো কেমনে?
অধুনা দেয় না ধরা পরিচিত চেনা উপমায়
বহু ব্যবহারে ম্লান কবিদের পোশাকী ভাষায়
অব্যক্ত যন্ত্রণা-জ্বালা হৃদয়ের বিষণ্ন লগনে;
লতিয়ে ওঠে না মনে আবেগে অধীর সঞ্চারণে
আশা কিম্বা হতাশার অবুঝ সবুজ অভিপ্রায়
অপ্রকাশ বেদনার ভারে দীর্ণ, প্রাণের সভায়
প্রতারক স্মৃতি শুধু সুখ-স্বপ্নে মুখর ভাষণে।

বদলে যায় ক্রমাগত নিষ্করুণ সময়ের হাতে
সুখ-দুঃখ অনুভূতি চিরচেনা রক্তের স্পন্দন
যেন স্থির ক্লান্ত-নদী, স্রোতাবর্তে তীক্ষ্ণ অভিঘাতে
ভাসিয়ে নেয় না আর দুই পাড় যখন তখন।

দেখি অবসিত সেই প্রাণ-বন্যা উদ্দাম অধীর
সমস্ত আকাঙ্ক্ষা স্তব্ধ-পুরানো, প্রাচীন পৃথিবীর।"
(এ রক্তিম হৃদয়ের ঃ রক্তিম হৃদয়)

'রক্তিম হৃদয়" সম্পর্কে সমালোচকদের দু' একটি মন্তব্য নীচে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হলোঃ

"মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ আধুনিক কবি নন, তিনি সমকালীন কবি– সর্বোপরি তাঁর কবি-মানস ও কবি-দৃষ্টি রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যে সজীব। সে দৃষ্টি-মানসের প্রেক্ষিতেই তিনি সমকালীন সমস্যা ও যুগ-যন্ত্রণাকে অধ্যয়ন করেছেন। আর তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতাকেই কাব্যে প্রকটিত করেছেন। এর ফলে 'রক্তিম হৃদয়ের' কবিতাগুলি যেমন সুস্পষ্ট হয়েছে, তেমনি সমকালীন যুগ-মানসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছে।... কবিতাগুলির প্রত্যেকটি আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হলেও, একটি সূক্ষ্ম যন্ত্রণার সুর নিয়ে গাঁথা। যেন নানা রঙের ফুল দিয়ে গাঁথা একটি অখণ্ড মালা, যার মধ্যে রঙের স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু গ্রন্থনের সূত্রটি অবিচ্ছিন্ন।... তাঁর কাব্যে বুদ্ধিনির্ভর দীপ্তি ভাস্বর। সেই দীপ্তিতে তাঁর কবিতার অন্তর-লোকটি পর্যন্ত অতি সহজে দেখতে পাওয়া যায়। এটি তাঁর কবি-কৃতির অমল মহিমা এবং তাঁর স্বতন্ত্র কবিসত্তার দ্যোতক। আত্মপ্রকাশে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবিহারী কিন্তু ভাব-ব্যঞ্জনায় গভীরতা সৃষ্টির প্রয়াসী; সব মিলিয়ে যেন স্বচ্ছতোয়া নদী– তার তল পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা গেলেও সে নদীর গভীরতা কম নয়।" (কবি হাবীবুর রহমান, চিত্রাকাশ, ১২ নভেম্বর, ১৯৭০)।

"... এই কাব্যগ্রন্থটিতে কবির 'মানুষ প্রীতি'র রূপটি স্বচ্ছভাবে ফুটে উঠেছে। কবির ছন্দ ও যতির মিল কবিতার গতিকে আধুনিক জটিল কবিতা থেকে পৃথক করেছে।... এর প্রতিটি কবিতা মানুষের বিচিত্র জীবনের ছোট ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষার রসগ্রাহী বর্ণনা।... হৃদয়ে যা বাজে তাই কবিতা। মাহফুজউল্লাহর কবিতা বোঝাও যায় এবং হৃদয়েও বাজে।...

মাহফুজউল্লাহ মানুষের সুখ-দুঃখে-বাস্তব-আশা-নিরাশার ছবি তাঁর কবি হৃদয় দিয়ে দেখেছেন। ..... মাহফুজউল্লাহর 'রক্তিম হৃদয়ের' প্রতিটি কবিতা অতিশয় রসসিক্ত ও হৃদয়গ্রাহী। প্রতিটি কবিতায় 'মানুষ, দেশ ও মাটির' গন্ধ পাওয়া যায়। 'জুলেখার মন'-এর রোমান্টিকতা 'রক্তিম হৃদয়ে' নেই। 'রক্তিম হৃদয়ে' কবি দেশ, মানুষ আর মাটির গন্ধে বিমুগ্ধ। সমস্ত কবিতা-গ্রন্থে কবিচিত্ত হিউমেনিটেরিয়ান এ্যাগোনিতে আপ্লুত।" (আমিনুল ইসলাম বেদু, বই, নভেম্বর, ১৯৭০)।

"চুয়ান্নটি কবিতায় সমৃদ্ধ 'রক্তিম হৃদয়' মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ রচিত একটি অনবদ্য কাব্য-সংকলন। কবিতার আঙ্গিক, দেহ-সৌষ্ঠব আর ভাব-বিন্যাসের আন্তরিকতায় 'শব্দের খাঁচায়' পুরে আমাদের ভাবনাগুলোকে কল্পরাজ্যের আঙ্গিনায় এনে সাজিয়েছেন– 'দাও আমাদের সেই প্রিয় দিনগুলির স্বপ্নে মুখর হয়ে।' কবিতার ভাববস্তু কবির আত্মগত চিন্তার ফসল কেবল নয়, বাস্তবতার আক্ষরিক রূপায়ণ এবং সর্বোপরি প্রতিটি কবিতার ছত্রে-ছত্রে কবি-মানসের আন্তরিক স্পর্শে কাব্য ধারার রূপকল্প হয়েই যেন নয়, পাঠ-সুখের অনাবিল আনন্দে ভরপুর বলেই এ-কাব্য বাংলা সাহিত্যের এক নতুন সংযোজন বলে ধরে নিলে ভুল হবে না। ... আধুনিকতার পূর্ণ স্বাক্ষর বহন করছে প্রতিটি কবিতার অঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে জীবন-দর্শনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ... জীবন-রসের প্রাচুর্যে কবিতাগুলো ভরপুর। বাস্তবধর্মী কবিতার অন্তরালে কবি সত্তার জীবন্ত মূর্তি ধরা পড়েছে। – তা সত্যি অনবদ্য। ছোট-ছোট কবিতাগুলো বাস্তব জগতের ছোট ছোট একটি সংগ্রামময় জীবন।" (কাজী সিরাজ, পাকিস্তানী খবর, ১১-০৯-৭০)।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'আপন ভুবনে' প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৭০-৭৫। এ কাব্যে আশাহত কবির মনোজগতে নতুন আশার উদ্‌গম লক্ষ্য করা যায়। ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনে একদিকে যেমন হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা অন্যদিকে, তেমনি আবেগাকুল চিত্তের নিবিড় প্রত্যাশা কবিকে নতুন প্রাণবন্ত স্বপ্নে বিভোর করে তোলে। এটা জীবন-বাস্তবতারই একটি দিক। কবি এখানে আবেগের সাথে জীবন-বাস্তবতা ও অন্তর্লীন অনুভূতির সাথে মননশীলতার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন কবি। বলেন ঃ

"খরায় বিনষ্ট হয় শস্যক্ষেত সবুজ বিপ্লব
তবুও আমার স্বপ্ন জন্ম দিতে থাকে
মানুষের মতো সব অন্তর্গত সুনীল বিষাদে
গভীর গভীর কোনো মনোময় মনোবেদনায়
মাটির নিহিত প্রেম সোঁদাগন্ধ ক্রমে ক্ষয়ে আসে
তৃণহীন হয়ে যায় সবুজ শস্যের মাঠ, মলিন বসুধা
তবুও আমার স্বপ্ন জন্ম নিতে থাকে।
(তবুও আমার স্বপ্ন ঃ আপন ভুবনে)

'আপন ভুবন' সম্পর্কে দু'একজন সমালোচকের মন্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে নীচে উদ্ধৃত হলো ঃ

"মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর কবিতা শান্ত, সহজ, উপাদেয়। তিনি প্রচলিত অর্থে আধুনিক নন বলেই তাঁর কবিতা আস্বাদ্য। আমাদের কবিতার নজরুল-যুগের প্রথাগত, প্রণালীবদ্ধ ধারাটিকে যতদূর সম্ভব আধুনিক রূপায়ণে তিনি উপস্থিত করেছেন। তাঁর ও নজরুলের মাঝখানের সেতু ফররুখ আহমদ। দেশ ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসাকে তিনি সহজ ও অনাবিলভাবে উপস্থিত করেন। আমাদের একালের প্রকৃত আধুনিক কবিদের থেকে তাঁর প্রভেদ হচ্ছে তিনি আমাদের কাব্যের 'স্বপ্নময় জীবনময় উজ্জ্বল আশাবাদকে' আজকের প্রখর বিভ্রান্ত কাল পর্যন্ত টেনে এনেছেন।

মিলবিন্যাস, অলংকরণ, ছন্দ-প্রকরণ এইসব আঙ্গিকগত দিকের প্রতিই তিনি বেশী যত্নবান। দেশ ও দেশের মানুষকে, আমাদের পারিপার্শ্বের আনন্দ ও যন্ত্রণার ছবিকে তিনি বিশ্বস্তভাবে তাঁর কবিতায় তুলে আনেন। মনে হয়, পূর্ব-গ্রন্থগুলির তুলনায় বর্তমান গ্রন্থে তাঁর কবিতা আরও উত্তীর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর এই স্পষ্ট অগ্রসরতার বিষয়টি খুব উল্লেখযোগ্য। উপমা ও তার চেয়ে বেশী চিত্ররচনার স্বভাব তাঁর এ গ্রন্থেও সমান রয়েছে। প্রফুল্ল-উৎফুল্ল তাঁর কবিতা। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ যে বিশিষ্ট, পৃথক ও সহজলক্ষ্য কবি, এই কথাটি সহজে বলা যায়। আমাদের আদর্শহীন বিখ্যাত সব সাম্প্রতিক কবিদের ধূসর ভিড়ে তাঁর উজ্জ্বল ও জনপ্রিয় বর্ণের উদ্ভাস হারিয়ে যাওয়ার নয়।" (বশীর আল হেলাল ঃ পটভূমি, দ্বিতীয় সংকলন, ১৯৭৭)।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'বৈরিতার হাতে বন্দী' প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৮০-৯০। এ কাব্যের কবিতাসমূহে কবির প্রজ্ঞা, জীবনের অভিজ্ঞতা, অপূর্ণতা ও আশাভঙ্গের বেদনা পরিমিত কাব্য-ভাষায় রূপ লাভ করেছে। কবির ভাষা এখানে অতিশয় সহজ, স্বচ্ছন্দ কিন্তু ছন্দ-সুষমা, চিত্রকল্প, রূপক-উপমায় অসাধারণ কাব্যময়। তাঁর কবিতার এই সহজ, সাবলীল, রূপময় ভঙ্গীর কারণে তিনি তাঁর সমকালের অন্যদের থেকে যেমন স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল তেমনি সাধারণ পাঠকের নিকট তিনি সহজগ্রাহ্য ও জনপ্রিয়। তিনি আধুনিক কবি হয়েও আধুনিক কবিদের দুর্জ্ঞেয়তা, অনৈতিকতা, অশ্লীল প্রবণতাকে সযত্নে পরিহার করেছেন। এ কাব্যের প্রথম কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তাঁর কাব্যের সহজতা, কাব্যময়তা, সংযত বাক্-বিন্যাস, মার্জিত রুচিবোধ ও উদার মানবিকতা পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে। এক্ষেত্রে অন্যদের থেকে তাঁর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রথম কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইন এ রকম ঃ

"কবিতা বাঁচাবে এই বিপন্ন পৃথিবী?

কিন্তু সেই কবিতার চেহারা কেমন
এবং কেমন তার অন্তর্গত স্বভাব–প্রকৃতি?

সে কি শুধু ক্লেদজ-কুসুম কিছু

কিছু প্রেম–ভালবাসা
শব্দের মোহন কারুকাজ।
নারী ও প্রকৃতি নিয়ে কিছু স্তব-গান,
ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বেদনা বিষাদ
আত্মরতি ছাড়া যার অন্য কোনো
অঙ্গীকার নেই!
লোকালয়ে বাস করে একা তবু
থাকে নির্বাসনে
স্বেচ্ছাবন্দী চিরকাল,
জানে না 'বিদ্রোহী' হতে
অন্তহীন বঞ্চনা ও
বৈরিতার মুখে,
সুন্দরের প্রতি আছে
আজীবন আগ্রহ প্রবল।"
(কবিতার কথা ঃ বৈরিতার হাতে বন্দী)

'বৈরিতার হাতে বন্দী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর অনেক সমালোচক এর প্রশংসা করেছেন। এখানে তার দু'একটি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হলো :

"মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ তাঁর এই সাম্প্রতিক প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটির ভিতর দিয়ে আমাদের চিন্তা ও চেতনায়, কর্মে ও জিজ্ঞাসায় এবং সৃষ্টি ও বেদনায় যে তীব্র তীক্ষ্ম দৃশ্যটি ফুটিয়ে দিতে পেরেছেন– সেজন্য তিনি আমাদের অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর মননজিজ্ঞাসা আমাদের চিন্তা, প্রতিভা ও চেতনাকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে।... একদিন সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্নেই কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ তাঁর কবিতায় যুদ্ধ, ক্ষুধা, নারী, মৃত্যু প্রভৃতির চিত্র এঁকেছেন। সুন্দর ও কল্যাণের দিকেই তাঁর ইঙ্গিত। ... কোনো কবির শক্তি ও লাবণ্য ফুটে ওঠে তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প, রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি ইত্যাদি নির্মাণে। কাব্যালংকার ও শব্দালংকারও কবিতার সংহত রূপকে প্রকট করে। ফলে কবিতা হয়ে ওঠে শিল্পের আধার। কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর ক্ষেত্রে কবিতার এ রূপ ও ঐশ্বর্য সতত সঞ্চারমান।" (তিতাশ চৌধুরী, দৈনিক বাংলা, সাহিত্য সাময়িকী)।

"Md Mahfuzullah is both an idealist and a realist. Many of these sonnets ... breathe the lofty idealism of the poet. Mahfuzullah is also perfectly aware of the hard realities of our life and paints them in sharp strokes. The poet has control over his emotion, and uses his language with economy and tell:ng effect, which of course is a mark of good sonnets. discerning reader will also note irony and pathos in some of the poems. There are many memorable lines in the book.

Mahfuzullah writes in the tradition of the modern poet. But it is a pleasure to note that he has never fallen into the trap of unnecessary obscurity of some of the so-called moderns." (S.N.Q . Zulfizar Ali : Observer Sunday Magazine).

"Mohammed Mahuzullah who first presented 'Julekhar Mon' in the literary horizon writes essentially on the varied aspects of love and the beauties of nature. His is essentially a romantic self and his expressions are constructed in keeping with his personal nature. His other works 'Raktim Hridayey' and ' Andkakary Eka' have re-established his fame.' (Poet Abdus Sattar, Counterpoint, June 8, 1975).

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মাহফুজউল্লাহর প্রকাশিত পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও তাঁর আরো প্রায় পাঁচ শো কবিতা রয়েছে যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও এখানো পর্যন্ত গ্রন্থভুক্ত হয়নি। এগুলো দিয়ে আরো প্রায় আট/দশটি গ্রন্থ প্রকাশ করা যায়। একাজটি কোনোভাবে সম্ভব হলে সমকালের একজন প্রধান ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী কবিকে জানার এবং তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করা সহজসাধ্য হতে পারে। এর দ্বারা বাংলা কাব্যের পরিসর ও ভান্ডারও অধিকতর সমৃদ্ধ হতে পারে।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ মূলত রোমান্টিক কবি। রোমান্টিক কবিরা মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে সুর ও ছন্দের শব্দিত কারুকাজের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করেন। মাহফুজউল্লাহ্ অত্যন্ত অনুভূতি-প্রবণ কবি-মনের অধিকারী। জীবনের দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা, ব্যর্থতা-বঞ্চনা, দারিদ্র্য ইত্যাদি তাঁর কবি-মনে যে অভিঘাত সৃষ্টি করে, তিনি সুর, ছন্দ, রঙ, রেখা, শব্দের ব্যঞ্জনায় তা হৃদয়গ্রাহীভাবে প্রকাশ করেছেন। কবির এ প্রকাশভঙ্গী সর্বত্র এক রকম নয়, বহু বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বে অপরূপ। শুধু প্রকাশভঙ্গীই নয়, বিষয়-বৈচিত্র্যেও তা হৃদয়গ্রাহী। এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মাহফুজউল্লাহর প্রত্যেকটি কাব্যের বিষয়, ভাব ও উপস্থাপনা একটি থেকে আরেকটি স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। তার ফলে তাঁর প্রতিটি কাব্যের আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাহফুজউল্লাহ্ সম্পর্কে অনেকে বলেন, তিনি তাঁর পূর্বসূরী বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও ফররুখকে অনুসরণ করেছেন। উত্তরসূরীর উপর পূর্বসূরীর প্রভাব অস্বাভাবিক নয়। রবীন্দ্রনাথও তার পূর্বসূরী বিদ্যাপতি, বিহারীলাল চক্রবর্তীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ঢং বিশেষত বলাকার সুর, ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গীর অনুরণন, 'জুলেখার মনে'র কিছু কিছু কবিতায় লক্ষণীয়। ঐতিহ্যানুসরণ ও পুঁথির ভাষার শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাহফুজউল্লাহ নজরুল-ফররুখ-এর অনুসরণ করেছেন। মাহফুজউউল্লাহ অত্যন্ত শিল্প-সচেতন কবি। কাব্যের কলা-কৌশল, রীতি-

নীতি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত ওয়াকিফহাল ব্যক্তি। তাঁর কাব্যে পূর্বসূরীদের প্রভাব অস্বীকার না করেও বলা যায়, তিনি কাব্যের ভাব, বিষয়, ছন্দ, শব্দ-চয়ন, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বদা স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী ও নিজস্বতা সৃষ্টিতে তৎপর। মাহফুজউল্লাহ তাঁর নিজস্ব বর্ণ-সুষমা ও মৌলিকত্বে উজ্জ্বল এক উল্লেখযোগ্য কবি-প্রতিভা।

এখানে মাহফুজউল্লাহর কবিকৃতি সম্পর্কে দু'টি প্রণিধানযোগ্য উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ

১. "এই সন্তপ্ত জগৎ সংসারের কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্। যেখানে জীবন, যেখানে স্পন্দন, যেখানে হাসির কলধ্বনি, বেদনার নীল ছায়া, যেখানে নদী, নারী, মৃত্তিকা, সেখানেই প্রোথিত তাঁর মূল, সেখানেই বিস্তারিত তাঁর শিকড়। স্নিগ্ধ মমতায়, আর্দ্র ভালবাসায় আর অপরিমিত প্রীতিতে তিনি আঁকড়ে ধরেছেন মনোহর এই জীবনকে, মোহন এই পৃথিবীকে। অমিল থেকে মিলের দিকে তাঁর অনন্ত অভিসার, ঘৃণা থেকে ভালবাসার দিকে তাঁর দীর্ঘ পদযাত্রা। চেতনায় তাঁর কারুকাজ অনুপম, ছন্দিত শব্দ নিয়ে খেলা তাঁর অফুরান। আমাদের হতাশা, হাহাকার আর হৃদস্পন্দন ধ্বনিত এই শব্দাবলীর মধ্যে আমাদের অস্তিত্বের ঝংকার। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্'র কাব্যসম্ভার বাংলা সাহিত্যের সম্পন্ন সম্পদ।" (আহমেদ হুমায়ুন ঃ ২১.২.১৯৮২)।

২. "নানা ভাব ও বিষয়কে সচেতন আঙ্গিক বৈচিত্র্য নিয়ে আমরা মাহফুজউল্লাহ্র কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি। ... তিনি পুঁথির ভাষার সঙ্গে আধুনিক আঙ্গিককে যুক্ত করে কাব্যরচনার নিরীক্ষামূলক প্রয়াস পেয়েছেন। আমরা একদিকে তাঁর কবিতায় সৌন্দর্য-সচেতন বিস্ময়মাখা রোমান্টিক সুর সহজেই লক্ষ্য করি, অন্যদিকে অনেক কবিতায় তিনি আবার ব্যঙ্গাত্মক, কঠোর বাস্তববাদী, ঋজু ও দৃঢ়, জীবনে হতাশা, নৈরাশ্য, শঙ্কা, বঞ্চনা এবং অশুভের উপস্থিতি সম্পর্কে নির্ভুলভাবে সচেতন। তাঁর রোমান্টিক কবিতাবলীতে নিসর্গ, পাখি, বৃষ্টি, আরণ্য সন্ধ্যা, রূপালি জলের নদী, প্রেম ও স্বদেশপ্রীতির অনুভূতি বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। .... অসুস্থতা, অশুভ এবং ভয়ের উপস্থিতির কথা উচ্চারিত হতে দেখি মাহফুজউল্লাহ্র কবিতার অনেক চরণে। কিন্তু কবির মন হতাশায় নিমজ্জিত নয়, তিনি সন্ধানী আশার আলোকের। ... প্রথমে বেদনা, নৈরাশ্যের সুর এবং তারপর প্রত্যয় লালিত বলিষ্ঠ আশাবাদী উচ্চারণ। .... কখনো কখনো হয়তো কবির আশাবাদী উচ্চারণকে মনে হতে পারে ততটা জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তব অভিজ্ঞতা নয় যতটা তাঁর বিশেষ মনোভঙ্গী লালিত রোমান্টিক প্রত্যয়ে অনুপ্রাণিত। এ সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করা শক্ত। তবে মাহফুজউল্লাহ্র কিছু লঘু সুরে ব্যঙ্গাত্মক, তীর্যক বিদ্রূপ সমৃদ্ধ কবিতা তাঁর অনুভূতি ও চেতনার প্রসারিত মাত্রিকতা আমাদের সামনে উন্মোচিত করে। ... কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমকালীন যুগ-যন্ত্রণার শিকার হয়েও তিনি নৈরাশ্যে বা নৈরাজ্যে নিমজ্জিত নন। তাঁর কাজে তিনি শুভ ও কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, নিজের অন্তরসত্তার আবেগ ও অনুভূতিকে আকর্ষণীয় উপমা

ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিশেষভাবে তাঁর অনেকগুলি সনেটের ঋজু সংহত রূপ, মিল-বিন্যাস, ছন্দ প্রকরণ এবং ভাবের অভিব্যক্তি তাঁকে একজন যত্নবান কৃতি কারুশিল্পীরূপে তুলে ধরেছে।" (কবীর চৌধুরী ঃ [সচিত্র সন্ধানী, ২৭শ সংখ্যা, ৭ নভেম্বর, ১৯৮২]।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, মাহফুজউল্লাহ মূলত এবং প্রধানত কবি। কিন্তু এক সময় গবেষণা ও মননশীল গদ্য রচয়িতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি, তাঁর কবি-খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এতেই বোঝা যায়, এক্ষেত্রে তাঁর অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ফররুখসহ বহু কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তত্ত্ব-তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিভিন্ন, বিচিত্র বিষয়ে তিনি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-সমালোচনামূলক অসংখ্য রচনার দ্বারা আমাদের চিন্তা ও মননশীলতার দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন। তাঁর গদ্য রচনার ভাষা, বিষয় ও আবেদন যেমন মনোজ্ঞ তেমনি আকর্ষণীয়। আমাদের প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর অবদান অসামান্য ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমাদের কাব্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব।

আল মাহমুদ ও তাঁর নিজস্ব কাব্য-ভুবন

আল মাহমুদ আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি। আধুনিক বাংলা কাব্যের জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন তাঁর এক নিজস্ব কাব্য-ভুবন নির্মাণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর স্বতন্ত্র বিশাল কাব্যের জগত তৈরি করেছেন, নজরুল ইসলাম যেমন তাঁর এক স্বতন্ত্র বর্ণাঢ্য কাব্য-জগৎ সৃষ্টি করেছেন, জসীম উদ্দীন যেমন তাঁর স্বতন্ত্র ঢং-এ কাব্যের সুষমামণ্ডিত সবুজ কানন তৈরি করেছেন, ফররুখ আহমদ যেমন তাঁর কবিতার এক দূরাগত স্বপ্নময় উজ্জ্বল ভুবন সৃষ্টি করেছেন, আল মাহমুদও তেমনি তাঁর এক নিজস্ব কাব্যের জগৎ নির্মাণে সতত যত্নবান। মূলত প্রত্যেক মৌলিক কবিরই একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সব সময় এক রকম হয় না। কিন্তু যার যে রকম বৈশিষ্ট্যই হোক না কেন, প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে আমরা সহজে তাঁদেরকে চিনতে পারি। গোলাপ, বেলী, বকুল— প্রত্যেকেই তার নিজস্ব রং, গঠন ও গন্ধেই সুপরিচিত। প্রত্যেক কবিও তেমনি তাঁর নিজস্ব ভাব, ভাষা, শিল্পনৈপুণ্য ও কাব্যিক আবেদনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল।

হাজার বছরের বাংলা কাব্যের ইতিহাসে অসংখ্য কবির আগমন ঘটেছে, কিন্তু তাঁদের ক'জন অক্ষয়-অমর হয়ে আছেন কালের ইতিহাসে? কেবল মৌলিক প্রতিভার অধিকারীরাই টিকে থাকেন কালের উদ্দাম গতি ও ঝড়ো হাওয়া উপেক্ষা করে আর তাঁদের প্রত্যেকেরই থাকে এক একটা স্বতন্ত্র পরিচয়, যা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় তাঁদের কব্যে।

বাংলা কাব্যে আল মাহমুদের আবির্ভাব উনিশ শতকের মধ্য–পঞ্চাশে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌড়াইলের মোল্লাবাড়িতে ১৯৩৬ সনের ১১ই জুলাই তাঁর জন্ম। পিতার নাম মীর আব্দুর রব, মাতা রওশন আরা মীর। পিতাসহ মীর আব্দুল ওয়াহাব আরবী, ফারসী, সংস্কৃত ভাষা রপ্ত করেছিলেন। মাতামহী বেগম হাসিনা বানু মীরের নিকট বিসমিল্লাহ খানির পর তিনি গ্রামের মসজিদের ইমামের নিকট ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। পাশাপাশি তিনি ব্রাহ্মণ

বাড়িয়ার এম.ই. স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের পর জর্জ হিক্সথ হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। অতঃপর সীতাকুণ্ড হাইস্কুল ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন। শেষোক্ত হাইস্কুলে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সনে তিনি ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে পড়াশোনা সাঙ্গ করে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভাষা আন্দোলন কমিটির পক্ষ থেকে ঐসময় একটি প্রচারণাপত্র প্রকাশিত হয়। তাতে তরুণ আল মাহমুদের চার লাইনের একটি কবিতা ছাপা হয়। আর তাতেই তিনি পুলিশের রোষানলে পড়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। আত্মগোপন অবস্থায় তিনি কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গে গিয়েও আশ্রয় নেন।

১৯৫৪ সনে আল মাহমুদ ঢাকায় এসে 'দৈনিক মিল্লাত' পত্রিকায় প্রুফরীডার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৫ সনে মিল্লাত ছেড়ে তিনি 'কাফেলা'য় যোগ দেন সহ-সম্পাদক হিসাবে। সেখান থেকে দৈনিক 'ইত্তেফাকে' প্রুফ রীডার হিসেবে যোগ দেন ১৯৬৩ সনে। পরে সেখানে তিনি মফঃস্বল সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৮ সনে সাময়িকভাবে 'ইত্তেফাক' বন্ধ হলে তিনি চট্টগ্রামে 'বই ঘর' এর প্রকাশনা কর্মকর্তা হিসাবে যোগ দেন। এ সময়ই অর্থাৎ ১৯৬৮ সনের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁর বিখ্যাত 'সোনালী কাবিনে'র সনেটগুলো রচিত হয়। অতঃপর দৈনিক ইত্তেফাক পুনরায় চালু হলে তিনি তাতে সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতে গিয়ে তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের ৮নং থিয়েটার রোডে প্রতিরক্ষা বিভাগের স্টাফ অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সনে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি গ্রুপ ঢাকাস্থ র‍্যাকিন স্ট্রীটস্থ 'দৈনিক সংগ্রাম' অফিস দখল করে 'দৈনিক গণকণ্ঠ' প্রকাশ করলে আল মাহমুদ তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সরকার-বিরোধী র‍্যাডিক্যাল পত্রিকা হিসাবে গণকণ্ঠ সরকারের রোষানলে পতিত হয় এবং আল মাহমুদ কারারুদ্ধ হন। এর তিন দিন পর গণকণ্ঠও বন্ধ হয়ে যায়। দশ মাস জেলে থাকার পর তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সনে নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁকে শিল্পকলা একাডেমীতে সহকারী পরিচালক নিযুক্ত করেন। ১৮ বছর চাকরী করার পর তিনি ১৯৯৩ সনের ১০ জুলাই শিল্পকলা একাডমীর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি 'দৈনিক সংগ্রামে' সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগদান করে অদ্যাবধি সেখানে কর্মরত আছেন। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম থেকে 'দৈনিক কর্ণফুলি' প্রকাশিত হলে সম্পাদক হিসাবে সেখানেও তাঁর নাম মুদ্রিত হতে থাকে। তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে এক অতি সক্রিয় ব্যক্তিত্ব। সমকালীন বাংলা কাব্যে তিনি সম্ভবত সর্বাধিক শক্তিমান কবি হিসাবে পরিগণিত। তবে কবি হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্যেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আল মাহমুদ এক অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

মধুসূদন আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম এবং অন্যতম প্রধান কবি হলেও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। রবীন্দ্র-যুগে রবীন্দ্র প্রভাব এত ব্যাপক ও সর্বব্যাপী ছিল যে, সেটা অনেকটা একঘেঁয়েমীর মতো মনে হয়। নজরুল এ একঘেঁয়েমীর হাত থেকে মুক্তি দিয়ে বাংলা কাব্যে নতুন প্রাণ-প্রবাহ সৃষ্টি করেন। এরপর তিরিশের কবিরা বাংলা কাব্যে আরেকটি নতুন মাত্রা যোগ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিরোধী শান্তি-প্রত্যাশী চেতনার বিস্তার ঘটে। তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশসহ তিরিশের অনেক কবিই তখন যুদ্ধ-বিরোধী, শান্তি-প্রত্যাশী, মানবতাবাদী কবিতা চর্চায় ব্যস্ত হন। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেশ তখন পরাধীন, দ্বিতীয় যুদ্ধের পর পঞ্চাশের (বাংলা ১৩৫০, ইংরেজি ১৯৪৩ সন) মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, স্বাধীনতা আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ইংরেজ ও হিন্দুদের দ্বিমুখী শোষণ-নির্যাতনে অতিষ্ঠ মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন— এর প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ-বিরোধী, শান্তিবাদী মনোভাবের কোন স্থান ছিল না। এরই প্রেক্ষাপটে ফররুখ আহমদের আবির্ভাব। নিরন্ন-বুভুক্ষ, মুক্তিকামী, আযাদী-পাগল মানুষের সাহসী উচ্চারণ তাঁর কণ্ঠে সমুচ্চারিত হয়। নতুন স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তৎকালীন পরাধীন ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যে স্বপ্নময় আবেগ সৃষ্টি করে ফররুখ আহমদের কাব্যে সে আবেগ রোমান্টিক কাব্য-ভাষা খুঁজে পায়।

১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর নেতাদের ডিগবাজি, প্রতারণা ও মুনাফিকীর কারণে ফররুখ আহমদসহ অনেকেরই সে লালিত স্বপ্নের প্রাসাদ গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম হয়। নেতারা যে আদর্শের কথা বলে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পর তাঁরা বেমালুম সেটা ভুলে যান। ফলে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এ হতাশা ক্রমান্বয়ে আরো বৃদ্ধি পায় বাংলা ভাষা আন্দোলন ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি নানা রূপ বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে। এ ধরনের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কবি আল মাহমুদের কাব্য-ক্ষেত্রে আবির্ভাব। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে লেখালেখি শুরু করলেও তাঁর প্রথম কাব্য 'লোক লোকান্তর' প্রকাশিত হয় ১৩৭০ (১৯৬৩) সনে। তাঁর এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

কাব্যগ্রন্থ ঃ লোক লোকান্তর (১৯৬৩), কালের কলস (১৯৬৬), আল মাহমুদের কবিতা (অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭১), সোনালি কাবিন (১৯৭৩), মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো (১৯৭৬), অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না (১৯৮০), পাখির কাছে ফুলের কাছে (১৯৮০), আল মাহমুদের কবিতা (আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০), Selected Poems, Al Mahmud (Translated by Kabir Chowdhury, 1981), প্রেমের কবিতা (আনন্দ প্রকাশনী, ১৯৮১), আল মাহমুদের কবিতা (হরফ-কোলকাতা, ১৯৮০) বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৫), আরব্য রজনীর রাজহাঁস (১৯৮৭), প্রহরান্তের পাশফেরা (১৯৮৮), একচক্ষু হরিণ (১৯৮৯), মিথ্যাবাদী রাখাল (১৯৯৩), আমি, দূরগামী

(১৯৯৪), হৃদয়পুর (কোলকাতা, ১৯৯৫), দোয়েল ও দয়িতা (১৯৯৭), কবিতাসমগ্র (অনন্যা, ১৯৯৭), দ্বিতীয় ভাঙন (২০০০), একটি পাখি লেজঝোলা (২০০০), Poetic Imagination of Al Mahmud : Beyond the Blue Beneath the Bliss, Translated by Mahbubul Alam Akhond (2000), নদীর ভিতরে নদী (২০০১)

গল্পগ্রন্থ ঃ পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮৩), গন্ধবণিক (১৯৮৮), আল মাহমুদের গল্প (শিল্পতরু, ১৯৯১), প্রেমের গল্প (১৯৯১), ময়ূরীর মুখ (১৯৯৪), গল্পসমগ্র (অনন্যা, ১৯৯৭)

উপন্যাস ঃ ডাহুকী (১৯৯২), কাবিলের বোন (১৯৯৩), উপমহাদেশ (১৯৯৩), কবি ও কোলাহল (১৯৯৩), পুরুষ সুন্দর (১৯৯৪), নিশিন্দা নারী (১৯৯৫), মরু মূষিকের উপত্যকা (থ্রিলার, ১৯৯৫), আগুনের মেয়ে (১৯৯৫), যে পারো ভুলিয়ে দাও (১৯৯৬), পুত্র (২০০০), চেহারার চতুরঙ্গ (২০০১), উপন্যাসমগ্র-১ ও ২ (সময়, ২০০১)।

প্রবন্ধ ঃ দিনযাপন, (১৯৯০), কবির আত্মবিশ্বাস (১৯৯১), কবিতার জন্য বহুদূর (১৯৯৭), নারী নিগ্রহ (১৯৯৭), কবিতার জন্য সাত সমুদ্র (১৯৯৯), সমকালীন কাব্য-আন্দোলনের ধারা, সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা।

আত্মজীবনী ঃ যেভাবে বেড়ে উঠি (১৯৮৬)

অন্যান্য গ্রন্থ ঃ । সঙ্গীত সিরিজ-১ (গুল মোহাম্মদ খান, কানাইলাল শীল, ফুলঝুরি খানা), সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী (১৩৮৪), সমকালীন কাব্য আন্দোলনের ধারা (স্মৃতিকথা), মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) (জীবনীগ্রন্থ), বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (১৯৮৯)।

সম্পাদনা ঃ কাফেলা (১৯৫৫), গণকণ্ঠ (৭২-৭৫), আহত কোকিল- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী (১৯৭৭), আব্বাসউদ্দীন (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯), শিল্পকলা (১৯৮০), Shilpakala (১৯৮০), আফগানিস্তান আমার ভালোবাসা (যৌথ, ১৯৮৬), দৈনিক কর্ণফুলী (১৯৯৫-)।

আল মাহমুদের বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর একটি তালিকা নিম্নরূপ ঃ

Poems from Bangladesh : Ed : Pritish Nandy, Lyebrid Press, London Voice of Modern Asia : Ed. Dorothy Blair Shimer, a Mentor Book, New York, 1973; Bharatiya Janpith, Delhi-1973; CBET BOZROJ, an anthology of poems from Bangladesh, Moscow 1973, Sherthaye Aj Bangladesh : an anthology of poems from Bangladesh- Tehran, 1973, Poems of

Bangladesh : Ed : Pritendra Mukhariee, Paris 1974; GANGESDELTA : Ed. Lother Lutza and Aloker Anjan Dasgupta, Horst Erdman Verlaye-1994; LA POESIE CONTEMPO RAINE DU BANGLADESH : ALLIANCE FRANCAISE, DACCA 1992; THIS SAME SKY : A collection of poems from around the world, MAXWELL MAC MILLAN INTERNATIONAL, New York, 1992 ইত্যাদি।

প্রত্যেক মানুষেরই একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। সৃষ্টিশীল প্রতিভার ক্ষেত্রে এটা আরো স্পষ্ট। তাঁরা তাঁদের স্ব-স্ব জীবনদৃষ্টির দ্বারা আমাদের নিকট পরিচিত। অনেক সময় ভাল লাগা, মন্দ লাগার মাপকাঠিও তৈরি হয় এর ভিত্তিতে। নিজস্ব বর্ণ-সুষমা, সুরভি-সৌকর্যে যেমন ফুলের পরিচয়, কবির পরিচয়ও তেমনি তাঁর কাব্যে। আর এ পরিচয়ের ভিত্তি হলো তাঁর রচিত কাব্যে প্রতিফলিত বিশ্বাস, বিষয়-বৈভব, ভাবৈশ্বর্য, বাক-বিন্যাস, কলা-নৈপুণ্য, ছন্দ, প্রতীক, উপমা, রূপক ইত্যাদির ব্যবহারে। বিশ্ববিখ্যাত অমর কবি হোমার, মিল্টন, হাফিজ, রুমী, জামী, ফেরদৌসী, শেখ সাদী, ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ফররুখ এঁরা সকলেই তাঁদের স্বকীয় জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁদের কাব্যে। এ বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত বলিষ্ঠ উজ্জ্বল কাব্য-কবিতা রচনা করা অসম্ভব। বিশ্বাসের দীপ্তি প্রত্যেক কবির কাব্য-ভুবনে চন্দ্রালোকের উজ্জ্বল কিরণ-প্রভা বিকিরণ করে। আল মাহমুদও বিশ্বাসের বৃত্তে আবর্তমান। তবে তাঁর বিশ্বাস কোন একটি নির্দিষ্ট বৃন্তে স্থিত থাকেনি, নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে এক স্থায়ী, উজ্জ্বল রূপ লাভ করেছে। প্রথম জীবনে আল মাহমুদ ছিলেন অনেকটা সংশয়বাদী, বামপন্থী, মার্কসীয় চিন্তা-চেতনার ধারক। ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাসের বলয়ে পরিবর্তন ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়লাভকারী, মুক্তিযোদ্ধা কবি দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশে ফিরে তৎকালীন সরকারের রোষানলে নিপতিত হন, উগ্র বামপন্থী, আধিপত্যবাদ-বিরোধী মতাদর্শের কারণে কারারুদ্ধ হন। এ কারাবাসকালেই তাঁর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি সংঘটিত হয়। তাঁর ভাষায় ঃ

"আমি নিসর্গরাজি অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা সংগুপ্ত প্রেমের মঙ্গলময় ষড়যন্ত্র দেখতে পাই যা আমাকে জগত-রহস্যের কার্যকারণের কথা ভাবায়।... এভাবেই আমি ধর্মে এবং ধর্মের সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ বীজমন্ত্র পবিত্র কোরানে এসে উপনীত হয়েছি।" (আল মাহমুদ/কবিতার জন্য বহুদূর, পৃ. ৩২-৩৩)।

এরপর কবি আরো স্পষ্ট ভাষায় তাঁর বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের কথা উচ্চারণ করেন ঃ

"... আমি ইসলামকেই আমার ধর্ম, ইহলোক ও পারলৌকিক শান্তি বলে গ্রহণ করেছি। আমি মনে করি একটি পারমাণবিক বিশ্ববিনাশ যদি ঘটেই যায়, আর দৈবক্রমে মানবজাতির যদি কিছু অবশেষ ও চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে ইসলামই হবে তাদের একমাত্র আচরণীয় ধর্ম। এই ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই আমার কবিস্বভাবকে আমি উৎসর্গ করেছি।... আল্লাহ-প্রদত্ত কোন নিয়মনীতিই কেবল মানবজাতিকে শান্তি ও সাম্যের

মধ্যে পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ দিতে পারে। আমার ধারণা পবিত্র কোরানেই সেই নীতিমালা সুরক্ষিত হয়েছে। এই হলো আমার বিশ্বাস। আমি এ ধারারই একজন অতি নগণ্য কবি।" (পূর্বোক্ত, পৃ.-৩৩)

কবি অন্যত্র বলেন ঃ "আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি জীবনের একটি অলৌকিক কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে। মার্কসবাদ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে।" (আল মাহমুদ/ কবির আত্মবিশ্বাস, পৃ.-১১)

আল মাহমুদ দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে আরো বলেন ঃ "নাস্তিকতার ওপর মানবতা দাঁড়াতে পারে না, পারবে না।" (ঐ, পৃ.-১৮)।

আল মাহমুদ কোন গতানুগতিক মুসলমান নন। আধুনিক বিভিন্ন মতবাদ, প্রচলিত প্রধান ধর্মসমূহ ইত্যাদি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে ঐশী গ্রন্থ আল কুরআনের সাথে তা মিলিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাই প্রচলিত ধারণা বা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নয়, গভীর প্রত্যয়ের সাথে মুক্ত মন ও উদার যুক্তিপূর্ণ মানসিকতা থেকেই তিনি ইসলামকে একমাত্র সত্য ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই কবি অবিচল বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারেন ঃ

"উদিত নক্ষত্র আমি। শূন্যতার বিরুদ্ধগামী, পূর্ণ করে তুলেছি বিস্তার।
আমি আলো, দীপ্ত করে তুলেছি পৃথিবী।
আমি তাল মাত্রা বাদ্যযন্ত্র ছাপিয়ে ওঠা আত্মার ক্বেরাত।
আরম্ভ ও অন্তিমের মাঝখানে স্বপ্ন দেখি সূর্যের সিজদারত নিঃশেষিত
আগুনের বিনীত গোলক।

নবী ইব্রাহিমের মত অস্তগামীদের থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি।
আমিও জেনে গেছি কে তুমি কখনো অস্ত যাও না। কে তুমি চির বিরাজমান!
তোমাকে সালাম। তোমার প্রতি মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছি। এই আমার রুকু,
এই আমার সিজ্‌দা।" [হে আমার আরম্ভ ও শেষ ঃ দোয়েল ও দয়িতা]

এখানে কবির বিশ্বাস ও প্রত্যয়দীপ্ত আত্মসমর্পিত চিত্তের গভীর আকুতি নিঃসংশয় প্রার্থনার মত অভিব্যক্ত হয়েছে। কবির এ বিশ্বাস ও প্রত্যয় তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে, অন্তরের একান্ত গভীর উপলব্ধি থেকে সঞ্জাত। অতএব, ধরে নেয়া যায় তা নিখাদ ও অকৃত্রিম। কবির বিশ্বাসের সাথে বিষয়, বিষয়ের সাথে ঐতিহ্য-চেতনা, ঐতিহ্যের সাথে শব্দ যোজনা, প্রতীকী দ্যোতনা, রূপকল্প এক অপরূপ ব্যঞ্জনায় অনবদ্য হয়ে উঠেছে। আল মাহমুদ এখানে তাঁর স্বাতন্ত্র্য মহিমায় উজ্জ্বল। ঐতিহ্য-চেতনা ও বিষয়-বৈভবের দিক থেকে তাঁর পূর্বসূরী নজরুল-ফররুখের সাথে ঘনিষ্ঠ অন্বয় থাকলেও কবি-কল্পনা ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ভিন্ন স্বাদ ও মেজাজের। এ বৈশিষ্ট্যের গুণেই আল মাহমুদকে সহজে চেনা যায়। ঐতিহ্য ধারণ করে ঐতিহ্যের ছড়ে নতুন ঝংকার সৃষ্টি করার মধ্যেই মৌলিকতার প্রকাশ। আল মাহমুদের মধ্যে সে মৌলিকতা সুস্পষ্ট।

আল মাহমুদ রোমান্টিক কবি। রোমান্টিক কবি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হলো ঐন্দ্রজালিক কবি-কল্পনায় অবস্তুগত সৌন্দর্য, রূপ, সুষমা ও আনন্দের অনুধ্যান করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, কোন রোমান্টিক কবিই ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্ধে উঠে সম্পূর্ণ পরাবাস্তবতার উপর তাদের কল্পনার বিস্তার ঘটাতে পারেন না। তারা একটা অবলম্বন খোঁজেন। কখনো এ অবলম্বন হয় নারী, কখনো নদী, কখনো ফুল, পাখি, গাছ-বৃক্ষ-লতা, অনন্ত নিঃসীম প্রকৃতি অথবা একত্রে সব কিছুই। তবে তাদের কল্পনা বস্তুগত অবলম্বনের মধ্যে কখনো সীমাবদ্ধ থাকে না। বিন্দু থেকে সিন্ধু, বস্তু থেকে অবস্তুগত ইন্দ্রিয়লোকে ধাবিত হয়, সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের মধ্যে তার বিস্তার ঘটে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি শেলী, কীট্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলের মধ্যেই রোমান্টিকতার এ প্রাণধর্ম বিদ্যমান। প্রথমোক্ত তিন ইংরেজ কবি প্রধানত প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যেই তাঁদের কবি-কল্পনা প্রায়শ স্ফূর্তি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির কবি। তবে প্রথম জীবনে নারী, বিশেষতঃ নারীর দেহগত রূপ-সৌন্দর্যের স্থূল বর্ণনায় তিনি অধিকতর আগ্রহ দেখিয়েছেন। পরে ধীরে ধীরে সে দেহগত সৌন্দর্য দেহাতীত সৌন্দর্যের রূপ লাভ করেছে। আল মাহমুদও তাই। তাঁর প্রথম দিকের কবিতার প্রধান উপজীব্য হলো নারী ও প্রকৃতি। নারীর দেহগত রূপ-সৌন্দর্যের উপলব্ধি কবি-কল্পনাকে এমন বিহ্বল করেছে যে, তিনি প্রায়ই শ্লীলতা ও সুরুচির সীমা অতিক্রম করে গেছেন। দেহজ কামনা-বাসনার অভিব্যক্তি কবি-কল্পনাকে বহুলাংশে ম্লান করে দিয়েছে। যেমন ঃ

১. শঙ্খমাজা স্তন দু'টি মনে হবে শ্বেতপদ্ম কলি, (সিম্ফনি ঃ লোক লোকান্তর)

২. স্তন দুটি দুধের ভারে ফলের আবেগে ঝুলে আছে।
(অন্তরভেদী অবলোকন ঃ সোনালী কাবিন)

৩. চাষীর বিষয় নারী
উঠোনে ধানের কাছে নুয়ে থাকা
পূর্ণস্তনী ঘর্মাক্ত যুবতী। (কবির বিষয় ঃ অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না)

৪. সামান্য চৌকাঠ শুধু তুচ্ছ করে এসো এই ঘরে
বাসনার স্থিরমুদ্রা স্পর্শ যদি করে নাভিমূল;
কী হবে শরীর ঢেকে, জানালার পাট বন্ধ করে?
(বধির টঙ্গার ঃ কালের কলস)

৫. তারপর তুলতে চাও কামের প্রসঙ্গ যদি নারী
ক্ষেতের আড়ালে এসে নগ্ন কর যৌবন জরদ,
(সনেট–১০ ঃ সোনালী কাবিন)

৬. গাছের আড়াল থেকে ইশারায় ডাকছে। আর ফলটার
হলুদ কষ গড়িয়ে পড়ছে তার নগ্ন উরু বেয়ে। (চিঠি ঃ একচক্ষু হরিণ)

৭. রাতের নদীতে ভাসা পানিউড়ী পাখির ছতরে,
শিষ্ট ঢেউয়ের পাল যে কিসিমে ভাঙে ছলছল

আমার চুম্বন রাশি ক্রমাগত তোমার গতরে
ঢেলে দেবো চিরদিন মুক্ত করে লজ্জার আগল

(সনেট– ১৪ ঃ সোনালী কাবিন)

আল মাহমুদের প্রথম দিককার কাব্য-কবিতায় এরূপ দেহজ কামনা-বাসনা ও নারীর নগ্ন দেহের উত্তেজক বর্ণনা বহু রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লেখক শিব নারায়ণ রায়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেন ঃ

"তিনি বোদলেয়ারের অনুরাগী। কিন্তু মাটি তার কাছে সেই নারী যে জলসিক্ত সুখদ লজ্জায় নিজেকে উদাম করে। তিনি শুনতে পান মেঘনার জলের কামড়ে ফসলের আদিগন্ত সবুজ চিৎকার। অভাবের অজগর তার টোটেম। যে কিসিমে শিষ্ট ঢেউয়ের পাল রাতের নদীতে ভাসা পানিউড়ী পাখির ছতরে ছলছল ভাঙে সেই কিসিমেই তিনি তার বানুর গতরে চুমো ঢালেন।" (একজন খাঁটি কবি ঃ উপমা, পৃ. ২৫)

তবে পরিণত বয়সে আল মাহমুদ অনেকটা মার্জিত হয়ে এসেছেন। নারী, নদী, প্রকৃতির প্রসঙ্গ এখনো আছে, কিন্তু তার উপস্থাপনা ও রূপকল্প সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। বিশেষ করে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আল মাহমুদের চিন্তা–চেতনার জগতে যে পরিবর্তন ঘটে, তখন থেকে তাঁর কাব্যের উপজীব্য, রূপকল্প, চিত্রকল্প, উপমা ও প্রতীকের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। যেমন ঃ

.... ঝড়ো বাতাসের
ঝাপটা থেকে তোমার উড়ন্ত চুলের গোছাকে
ফিরিয়ে আনো মুঠোর মধ্যে।। বেণীতে বাঁধো
অবাধ্য অলোকদাম।
কেন জিনেরা তোমার কেশ নিয়ে খেলা করবে?
আজ সমুদ্রের দিকে তাকাও। দ্যাখো জোয়ারে ফুলে উঠেছে
দরিয়া। চাঁদের গুঁড়িয়ে যাওয়া প্রতিবিম্বকে নিয়ে
টাকার মতো লোফালুফি করছে উন্মত্ত তরঙ্গের মাতাল হাত।
তোমার আব্রু ঠিক করে নাও। এইতো ছতর ঢাকরা সময়।
কোথায় হারিয়ে এসেছো তোমার বুকের
সেফটিপিন?
আজ ইবলিসকে তোমার ইজ্জত শুঁকতে দিও না।

(নীল মসজিদের ইমাম ঃ বখতিয়ারের ঘোড়া।)

এখানেও নারী আছে। কিন্তু এ নারী নগ্ন দেহের আদিম লালসার প্রতীক নয়, সম্ভ্রমশীলা মহিয়সী নারী। এ নারী কামোত্তেজনা সৃষ্টি করে না, সম্ভ্রম জাগায়। নারীর তিন শাশ্বত রূপ ঃ বধু, মাতা, জায়া। তিন রূপই যেমন প্রেম–প্রীতি– ভালবাসার প্রতীক আবার তেমনি চিরন্তন কল্যাণ ও শান্তি-সুখের শাশ্বত প্রতীক। আল মাহমুদ প্রথম

জীবনে এবং যৌবনে নারীকে শুধুই বধু, প্রেমময়ী কামসঙ্গীরূপে দেখেছেন। এখনো তাই দেখেন। তবে সে প্রেমময়ী বিবসনা রমনী এখন খানিকটা বসনাবৃত মাধুর্যময়ী কল্যাণব্রতী রমণীর রূপ লাভ করেছে। আল মাহমুদের রোমন্টিক কবি-দৃষ্টিতে এখন নারী কখনো সখনো মাতা-জায়ার রূপেও আবির্ভূত হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে তাঁর সুপরিণতির লক্ষণ। আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় নারী ও প্রকৃতিকে উপজীব্য করার বিষয়ে লিখেছেন ঃ

"আমার কবিতার প্রধান বিষয় হলো নারী। আমি এক সময় ভাবতাম একজন কবি-পুরুষের কাছে নারীর চেয়ে সুন্দর আর কী আছে? না, কিছু নেই। পৃথিবীতে যত জাতির কবিতায় যত উপমা আছে আমি আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করে দেখেছি সবই নারীর সাথে তুলনা করেই। দয়িতার দেহের উপমা দিতে কবিরা পৃথিবী নামক এই গ্রহকে চষে ফেলেছেন। এমন নদী, পর্বত বা প্রান্তর নেই যার সাথে কবিরা তাদের প্রেমিকার দেহ-সৌন্দর্যের তুলনা দেননি।

"আমার কবিতার আরেক প্রধান বিষয় হলো প্রকৃতি। আমি নিসর্গরাজি অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা সংগুপ্ত প্রেমের মঙ্গলময় ষড়যন্ত্র দেখতে পাই যা আমাকে জগৎ রহস্যের কার্যকারণের কথা ভাবায়। এক ঝাঁক পাখি যখন গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে বেড়ায়, মাটি ফুঁড়ে বেড়িয়ে আসে পতঙ্গ ও পিঁপড়ের সারি, আর মৌমাছিরা ফুল থেকে ফুলে মধু শুষে ফিরতে থাকে আমি তখন শুধু এই আয়োজনকে সুন্দরই বলি না বরং অন্তরালবর্তী এক গভীর প্রেমময় রমণ ও প্রজনন ক্রিয়ার নিঃশব্দ উত্তেজনা দেখে পুলকে শিহরিত হই।" (কবিতার জন্য বহু দূর, পৃ. ৩২-৩৩)

আল মাহমুদ তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান উপজীব্য প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন ঃ "আমি একদা আমার কৈশোরে প্রকৃতির মধ্যে নিজের তন্ময় মুগ্ধতাকে আবিষ্কার করে মত্ত হয়ে থাকতাম। ট্রেনে কোথাও যেতে একটা পাহাড় বা বেগবতী নদীর দিকে তাকিয়ে এমন পুলক অনুভব করতাম যে, কি আর বলবো! মনে হতো প্রকৃতির দিগন্ত প্রসারিত বিস্তারের মধ্যেই বুঝি জগৎ রহস্যের চাবিখানি আমার জন্য কেউ লুকিয়ে রেখেছে। একদিন আমি তা খুঁজে পাবো। কিন্তু ভ্রমরের মতো প্রতিটি ফুলের প্রস্ফুটনে আমার অনুসন্ধানী মন ঘুরে বেড়িয়েও জগৎ রহস্যের কোনো কিনারা দেখতে পায়নি। বরং রহস্যের জাল আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।... এই রহস্যের কথা আমি আমার কিশোর বয়সের কবিতায় খানিকটা উচ্চারণ করেছি। এই উচ্চারণের মধ্যে শুধু মুগ্ধতাই আছে।" (দিন যাপন, পৃ. ১০)।

কবির বক্তব্য থেকে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা করা চলে। তবে সময় অতিক্রমের সাথে সাথে কবির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুরও ব্যাপ্তি ঘটেছে, বিশেষ করে তাঁর নতুন উপলব্ধি তথা ইসলাম সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন তা তাঁর একাত্তুরের স্বাধীনতা-পরবর্তী কবিতায় বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। অবশ্য নারী ও নিসর্গ এ পর্যায়েও তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান উপজীব্য।

তবে তার উপস্থাপনা ও প্রকাশভঙ্গী হয়েছে ভিন্ন— অনেকটা শ্লীল ও রুচিশীল। এটা তাঁর সুপরিণতিরই লক্ষণ।

আল মাহমুদের একটি উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য হলো তাঁর কবিতার শব্দ চয়ন ও তার কুশলী বিন্যাস। অনেকের ধারণা, কবিতা মূলত শব্দের শিল্প। শব্দ ব্যবহারে সজ্ঞানতা ও তার সুপ্রযুক্ত কুশলী ব্যবহারের উপর কবিতার সাফল্য-সার্থকতা অনেকখানি নির্ভরশীল। কবিতায় অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহারের কোনই অবকাশ নেই। সুনির্বাচিত শব্দের যথার্থ অর্থবহ প্রয়োগেই সার্থক কবিতার সৃষ্টি হয়। এ জন্য মহানবী (সঃ) বলেন ঃ "আশ্‌শেয়রু বিমানঝিনাতিল কালাম, হুসনুহু, কা হুসনেল কালামে ওয়া ক্বাবিহু হুকা কাবিহিল কালাম।" অর্থাৎ কবিতা মূলত কথা বা শব্দ—তার ভালটা ভাল এবং তার খারাপটা খারাপ বা পরিত্যাজ্য। (মিশকাত শরীফ)। মহানবী (সঃ) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন ঃ 'কিছু কিছু কথা বা শব্দ এমন যা জাদুর মত।' (আওন আল বারী, ৬/৯৬)। একথার অর্থ হলো, সুচয়িত অর্থপূর্ণ শব্দের কুশলী বিন্যাস ভাব, কল্পনা, ছন্দ ও আবেগের সাথে যখন সুবিন্যস্ত হয় তখনি তা কবিতার মোহনীয় জাদুতে পরিণত হয়।

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল মাহমুদের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। এক্ষেত্রে তিনি যত না নজরুল-ফররুখের অনুসারী তার চেয়ে জসীমুদ্দীনের অনেক কাছাকাছি। আল মাহমুদ তাঁর কবিতার শব্দ সন্ধানে অভিধান খুঁজে পেরেশান হন না, অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্য গ্রীক বা হিন্দু মিথোলোজি থেকে উপমা খোঁজেন না, আমাদের একান্ত পরিচিত, সহজবোধ্য শব্দের কুশলী ব্যবহারে তাঁর কবি-কল্পনার বর্ণাঢ্য রূপায়ণ ঘটান। বিদেশী, অপরিচিত মিথোলোজি থেকে দুর্বোধ্য উপমা সংগ্রহ না করে তিনি গ্রাম-বাংলার সাধারণ নারী-পুরুষ, তাদের বিচিত্র জীবন, নিসর্গের দৃশ্যপট থেকে সহজ ও সাধারণ উপমা-রূপক-চিত্রকল্প সংগ্রহ করে তাঁর কবিতার বাণী-রূপ নির্মাণ করেন। আল মাহমুদের এ সারল্য ও সহজতা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে তাঁর কাব্যে কোন কৃত্রিমতা নেই, দুর্বোধ্যতা নেই। আবহমান বাংলার সোঁদা মাটির গন্ধ তাঁর কাব্যের শরীরে লেপটানো। যেমন;

"কে জানে ফিরলো কেনো, তাকে দেখে কিষাণেরা অবাক সবাই।
তাড়াতাড়ি নিড়ানির স্তূপাকার জঞ্জাল সরিয়ে
শস্যের শিল্পীরা এসে আলোর উপরে কড়া তামাক সাজালো।
এক গাদা বিচালি বিছিয়ে দিতে দিতে
কে যেনো ডাকলো তাকে; সস্নেহে বললো, বসে যাও,
লজ্জার কি আছে বাপু, তুমি তো গাঁয়েরই ছেলে বটে,
আমাদেরই লোক তুমি। তোমার বাপের
মারফতির টান শুনে বাতাস বেহুঁশ হয়ে যেতো।
পুরনো সে কথা উঠলে এখনো দহলিজে
সমস্ত গাঁয়ের লোক নরম নীরব হয়ে শোনে।"

কত সহজ অনাড়ম্বর আটপৌঢ়ে ভাষা! অথচ কত সুন্দর কাব্যময় চিত্রকল্প। এরকম আরো দু'একটি উদাহরণ ঃ

"গ্রামীণ ব্যাংকের চালে উড়ে এসে বসেছে হুতুম
রৌদ্রঝরা দিন শেষে ধেয়ে আসে মরুর রজনী,
চোর ও শেয়াল ছাড়া আর সবি নিঃসাড় নিঝুম
সিঁদেল ইঁদুর খোঁজে স্বাবলম্বী বিধবার ননী।
পেঁচা তো লক্ষ্মীর পাখি চোরের ওপরে বাটপার
ইঁদুরের রক্ত চেটে পূজো পায় কুশীদজীবীর,
গ্রামীণ ব্যাংকের চালে চমৎকার ইঁদুর আহার
কিষাণীর শূন্য ভাঁড়ে এক ফোঁটা পুঁজির শিশির।"

(খরা সনেট গুচ্ছ-৪, দোয়েল ও দয়িতা)।

অথবা,

"কখন যে কোন্ মেয়ে বলেছিল হেসে ঃ
নাবিক তোমার হৃদয় আমাকে দাও,
জলদস্যুর জাহাজে যেও না ভেসে
নুন ভরা দেহে আমাকে জড়িয়ে নাও।

জল ছেড়ে এসো প্রবালেই ঘর বাঁধি
মাটির গন্ধ একবার ভালবেসে
জল ছেড়ে এসো মাটিতেই নীড় বাঁধি
মুক্তো কুড়াতে যেয়োনা সুদূরে ভেসে।" (সমুদ্র-বিষাদ/লোক লোকান্তর)

আরো একটি উদাহরণ ঃ

"যদি যান,
কাউতলী রেলব্রীজ পেরুলেই দেখবেন
মানুষের সাধ্যমত
ঘরবাড়ী।
চাষা হাল বলদের গন্ধে থমথমে
হাওয়া।
কিষাণের ললাট লেখার মতো নদী,
সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য।" (রাস্তা/লোক লোকান্তর)।

শব্দ ব্যবহারে অনায়াস-সাধ্য সহজ নৈপুণ্য দেখাবার সাথে সাথে উপমা, রূপক ব্যবহারেও আল মাহমুদ বিরল মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও তাঁর কবি-কল্পনার স্বাতন্ত্র্য ও সহজতা সকলকে বিমুগ্ধ করে। যেমন ঃ

'মাটিকে মোরব্বার মত ছিদ্র করে ভরে তোলে নিজেদেরই কবরের ঢিবি।'

(হে আমার আরম্ভ ও শেষ/দোয়েল ও দয়িতা)।

'বাড়ীওলীরা
এখন আমার অক্লান্ত বিচরণশীল উরতের প্রশংসায়
ফুল তোলা বালিশ।
(দৈত্যের বদলে এক পাল তোলা আত্মা/দোয়েল ও দয়িতা)।

'পাতাল রেলের যান্ত্রিক অজগরের উদরে তুর্কী রাতার মশলাদার রানের মত
হজম হতে হতে যখন একটু দুলনিতে দুলছি।'
(লন্ডনের গল্প/দোয়েল ও দয়িতা)

'পিয়ালার মতো দুটি বক্ষপদ্মে উড়ে গেল দৃষ্টির ভ্রমর।"
(অসুখে একজন/কালের কলস)।

'তুমি আমার অসুখ ঘরে বাসক পাতা
অসুস্থতার গন্ধমোছা ঘরের দাওয়া
তুমি আমার বর্ষাজলের সিক্ত ছাতা
উষ্ণ কোন গ্রীষ্মদিনের ঠাণ্ডা হাওয়া।' (বেহায়া সুর/কালের কলস)।

তবে কি প্রার্থনা করবো? না, মৃত্যু তো চেঙ্গিসের
অশ্বের মত দ্রুতগামী, বধির।'
(অন্তরভেদী অবলোকন/সোনালী কাবিন)।

'আর আমার চোখ ছিল গ্লাসে ভিজানো
ইছবগুলের দানার মত জলভরা।
(আমার চোখের তলদেশে/সোনালী কাবিন)।

এ রকম অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। আমাদের পরিচিত পরিবেশ থেকে রূপক, উপমা সংগ্রহ করে আল মাহমুদ তাঁর কাব্যের সুরভিত, মনোরম উদ্যান সাজিয়েছেন। তাঁর কাব্য-ভাষা সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য ঃ

"কবিতা রচনার বেলায় 'আমি আমার নিজের জন্য একটি সুবিধামত ভাষা তৈরি করতে গিয়ে আঞ্চলিক শব্দরাজির সন্ধান পাই। এই শব্দ-সম্ভার জীবন্ত ও বহমান। খুব ব্যাপকভাবে না পারলেও আধুনিক বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রচুর শব্দরাজি আমি আমার রচনায় ব্যবহার করে পরিতৃপ্ত।" (ভূমিকা ঃ আল মাহমুদের কবিতা)।

আল্ মাহমুদ অন্যত্র বলেন ঃ "আমি আমার কবিতার জন্য একটি পছন্দমত ভাষাভঙ্গী উদ্ভাবন করতে গিয়ে আঞ্চলিক শব্দরাজির সন্ধান পাই। অকস্মাৎ আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বাংলা ভাষার সমকালীন সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দরাজি বহু কবির বিচিত্র ব্যবহারে ও যথেচ্ছ আচরণে তিরিশ দশকেই বিস্বাদ, এমন কি পরবর্তী কবিদের জন্য গন্ধহীন পুষ্পের পচা স্তূপে পরিণত হয়েছে। এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দৈনন্দিন ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দের যে অক্ষয় ভাণ্ডার রয়েছে সেখান থেকে

ব্যাপকভাবে শব্দ আহরণ করে সাহিত্য রচনা করতে না পারলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একঘেঁয়েমি কাটবে না। এই আহরণ নির্বিচার হলে চলবে না। প্রতিভাবান কবি ও কথাশিল্পীর অন্তরদৃষ্টি সেখানে একান্ত দরকার।... আধুনিক বাংলা ভাষার চলতি কাঠামোকে পরিত্যাগ করে নয় বরং এই কাঠামোর মধ্যেই আঞ্চলিক শব্দের কাব্যময় প্রয়োগকে নিশ্চিত করতে হবে। তবেই ভাষা লাফিয়ে উঠবে সমুদ্র তরঙ্গের মত।... আমাদের ভাষাও এক স্বতন্ত্র বাংলা ভাষা। আমাদের রাজধানী নগরীকে ঘিরে মহল্লায়-মহল্লায় ইট-কাঠ ও ইমারতের প্রতিটি প্রকোষ্ঠে, সাজানো বিপণীকেন্দ্রে, মাঠে-ময়দানে পাক খাচ্ছে যে নব্য সতেজ শব্দরাজি আর বিচিত্র বাকভঙ্গী যা আধুনিক বাংলা ভাষার কাঠামোর মধ্যেই আঞ্চলিক ও প্রাকৃত শব্দের সচ্ছল গতায়াতে জেট প্লেনের মত গতিশীল, আমরা সেই দ্রুতগামী আধুনিক বাংলা ভাষারই কবি। আমি নিজেও।" (কবিতার জন্য বহুদূর/আল মাহমুদ, পৃ. ৩২)।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আল মাহমুদের কাব্য-ভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গের ভাষা থেকে আমাদের ভাষার একটা পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য দিন দিন আরো বেড়ে যাচ্ছে কারণ আমাদের ভাষা যেখানে আঞ্চলিক ভাষার শব্দরাজিতে পূর্ণ হয়ে ক্রমান্বয়ে সতেজ ও সমৃদ্ধ হয়ে দেশের মানুষ ও মৃত্তিকা সংলগ্ন হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা ততই হিন্দী, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবে দিন দিন তার স্বভাব ও পরিচয় হারিয়ে বসছে। আল মাহমুদ তাই যথার্থই আমাদের আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ব্যবহার করে বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি যথার্থই আমাদের কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে আবুল মনসুর আহমদের মত ঢাকাকে আধুনিক বাংলা ভাষার রাজধানী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এটা এক যথার্থ স্বপ্নদ্রষ্টা কবির সাহসী উচ্চারণ। আল মাহমুদের সবগুলো কাব্যেই এই বিশিষ্ট কবি-ভাষার পরিচয় সুস্পষ্ট।

আধুনিক জীবনে নানা ধরনের অস্থিরতা। আমাদের সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে অনেক কবির কবিতায়ও ভাষা ও চিন্তায় অস্পষ্টতা ও জটিলতা এসেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিকতার সকল লক্ষণ ধারণ করেও আল মাহমুদ এ জটিলতা ও অস্পষ্টতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কয়েকটি উদাহরণ ঃ

১) "বধূবরণের নামে দাঁড়িয়েছে মহামাতৃকূল
গাঙের ঢেউয়ের মতো বলো কন্যা কবুল কবুল।"

২) "নদীর চরের প্রতি জলে-খাওয়া ডাঙার কিষাণ
যেমন প্রতিষ্ঠা করে বাজখাঁই অধিকার তার,
তোমার মস্তকে তেমনি তুলে আছি ন্যায়ের নিশান
দয়া ও দাবীতে দৃঢ় দীপ্তবর্ণ পতাকা আমার।"

৩) "কইরে হারামজাদা, দেখুম আজকা তোর হগল পুংটামি
কোনখানে পাড়ো তুমি জবর সোনার আন্ডা, কও মিছাখোর?

তাজ্জবের মতো তারপর বলেই টানবে লেপ,
পেখম উদাম করে দেখবে এক বেশরম কাউয়ার গতর।"

আল মাহমুদের কবিতায় গ্রাম বাংলা, গ্রামীণ দৃশ্যপট, গ্রামীণ মানুষ সবই এসেছে যেমন অনায়াস স্বচ্ছন্দে, আধুনিক নাগরিক জীবন ও নগর-প্রসঙ্গও এসেছে তেমনি অকৃত্রিম সহজতায়। কবি বলেন ঃ

"স্বপ্নে আমার কুশল পুছে রোজ
ভাল কি আছ? হায়রে ভাল থাকা
নগরবাসী কে রাখে কার খোঁজ।" (এক নদী/সোনালী কাবিন)

উনিশ শো বায়ান্ন সনে ভাষা আন্দোলনের সময় কবি ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কয়েক ছত্র কবিতা লিখে পুলিশের নজরে পড়ে সেই যে গ্রাম ছেড়ে ঢাকা শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারপর এ শহরই হয়েছে তার জীবন-জীবিকার অবলম্বন। কবি এখানেই কাটিয়েছেন তাঁর যৌবনের প্রারম্ভ থেকে সারাটি জীবন। ঘর থেকে বের হয়ে শহরে আসার সে স্মৃতিটা তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে এভাবে ঃ

"ছিটকিনিটা আস্তে খুলে পেরিয়ে গেলাম ঘর
মস্ত বড় শহরটা এই করছিল থর থর।"

নগরবাসী কবি নগরকে যে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে স্বস্তি পেয়েছেন তাও নয়। নগর-জীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, কলুষতা, হৃদয়হীনতা ও ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমি জীবনযাত্রায় কবি প্রায়শই অসহায় ও বিপন্ন বোধ করেন। অনেক সময় তিনি মনে করতে বাধ্য হন যে, তিনি বুঝি এখানকার কেউ নন। কবি তাই লেখেন ঃ

"আপনি উল্টোপথে বাজারে এসেছেন,
এটাতো বেঈমানের গলি।
গাধামুখো পুরুষ আর কুকুরমুখো
কসবীদের বাজার। এখানে সবুজ
কোথায় পাবেন?
আপনি বুঝেছি এ হাটের লোক নন।" (হৃদয়পুর/আমি দূরগামী)

আল মাহমুদের এ জীবনবোধ ও উপলব্ধি সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অন্নদা শংকর রায় বলেন ঃ

"তাঁর কবিতার ভাষা অকৃত্রিম, অনাড়ম্বর, সহজ, সরল, প্রবহমান, সুমধুর। ছন্দের উপর তাঁর অসামান্য দখল। তিনি স্পষ্টভাষী। তাঁর হৃদয় ঠিক জায়গাতেই আছে। গ্রামের জন্য গ্রামবাসী জনগণের জন্য পল্লী প্রকৃতির জন্য তাঁর হৃদয় আকুল। নাগরিক জীবন তাঁকে আকর্ষণ করে না। শহরে তিনি পরবাসী।"

আল মাহমুদের কবি-পরিচয় ও তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য সম্পূর্ণ সঙ্গত ও যথাযথ সন্দেহ নেই। বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদের পরে যে দু'জন কবি সর্বাধিক

খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তাঁরা হলেন শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ। দু'জনেই প্রায় সমসাময়িক। পঞ্চাশের দশকে উভয়ের কাব্য-ক্ষেত্রে আবির্ভাব। দু'জনেই নগরবাসী। তবে একজন নাগরিক কবি, অন্যজন গ্রাম-জনপদের মুক্ত প্রকৃতির অন্তর্লীন স্বভাবের কবি। একজন ইউরোপীয় ভাবধারা ও মানবতাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ, অন্যজন দেশজ চিন্তা-চেতনা, আদর্শ ও ঐতিহ্যে লালিত প্রগাঢ় আন্তরিকতায় দীপ্ত কবিসত্তা–অতএব, জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে তিনিই যে অধিক প্রাধান্য পাবার যোগ্য তা বোধ করি, বলার অপেক্ষা রাখে না। সাহিত্যে গ্রহণযোগ্যতার একটি চিরন্তন মানদন্ড রয়েছে, তা হলো জীবনধর্মিতা–জীবনের সাথে যা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, জীবনের সুখ-দুঃখ, পূর্ণতা-অপূর্ণতা, চাওয়া-পাওয়া, আশা ও স্বপ্নময়তার আশ্লেষে যা সৃষ্ট, তার আবেদন তত স্থায়ী ও ব্যাপক। এদিক থেকে আল মাহমুদ ফররুখ-উত্তর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি বলে অনেকের ধারণা। আল মাহমুদের জীবন-সংশ্লিষ্টতা, ঐতিহ্যপ্রিয়তা, বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা এবং সর্বোপরি অসাধারণ কবি-প্রতিভা, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিজস্ব কাব্য-ভুবন নির্মাণের সক্ষমতা তাঁকে বাংলা কাব্য-জগতে যথারীতি এক মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে।

'লোক লোকান্তর', 'কালের কলস', 'সোনালী কাবিন'-এর আল মাহমুদ আর 'বখতিয়ারের ঘোড়া', 'দোয়েল ও দয়িতা', 'দ্বিতীয় ভাঙন'-এর আল মাহমুদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য সত্ত্বেও যথার্থ কবি-প্রতিভার স্ফূরণে উভয় ক্ষেত্রেই কবি আন্তরিক ও জীবন-স্বভাবে উদ্দীপ্ত। এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'জিজ্ঞাসা' সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়ের একটি মন্তব্য অতিশয় প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ

"পঁচাত্তর সালে আল মাহমুদের সঙ্গে প্রথম চাক্ষুস পরিচয় হবার আগে থেকেই আমি তাঁর কবিতার একজন মুগ্ধ পাঠক। সমকালীন যে দু'জন বাঙালী কবির দুর্দান্ত মৌলিকতা ও বহমানতা আমাকে বার বার আকৃষ্ট করেছে তাঁদের একজন বাংলাদেশের আল মাহমুদ, অন্যজন পশ্চিমবঙ্গের শক্তি চট্টোপাধ্যায়। 'জিজ্ঞাসা' প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় আল মাহমুদের একগুচ্ছ কবিতা আগ্রহী হয়ে প্রকাশ করি। আমার মনে হয়েছে যে, বাংলা কবিতায় তিনি নতুন সম্ভাবনা এনে দিয়েছেন। পশ্চিম বাংলার কবিরা যা পারেননি তিনি সেই অসাধ্য সাধন করেছেন; আঞ্চলিক ভাষা, অভিজ্ঞতা, রূপাবলীকে তিনি নাগরিক চেতনায় সন্নিবিষ্ট করে প্রাকৃত অথচ ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ এক কাব্য-জগৎ গড়ে তুলেছেন। জসীমউদ্দীন এবং জীবনানন্দ উভয়ের থেকেই তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কবি। আল মাহমুদের গুচ্ছ কবিতা প্রকাশের পর অনেক বাংলাদেশী পাঠক পত্র লিখে জানান যে, আল মাহমুদ বর্তমানে ইসলামপন্থী প্রচারক হয়ে উঠেছেন যে, তিনি সরকারের সমর্থক ও প্রগতিবিরোধী, যে সেই কারণে তাঁর প্রতি আমার মত র‍্যাডিক্যাল মানবতন্ত্রীর অনুরাগ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। উত্তরে আমি আল মাহমুদের আরেক গুচ্ছ কবিতা 'জিজ্ঞাসা' তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশ করি এবং পাঠক-পাঠিকাদের জানাই যে, কবির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অংশ ভাগ অথবা তার বিবিধ ক্রিয়াকলাপের সমর্থক না হয়েও তাঁর কবিতা উপভোগ করা সম্ভব। অনুভবের সততায়, কল্পনার মৌলিকতা, শব্দ

ব্যবহারে দক্ষতা, উপমা ও ব্যঞ্জিত বাকপ্রতিমা উদ্ভাবন শক্তি যার কবিতায় প্রত্যক্ষ তার বিশ্বাস ও ব্যবহার যাই হোক না কেন তাঁর কবিতায় সাড়া দেয়া কাব্যানুরাগীর পক্ষে স্বাভাবিক। ঢাকায় পৌঁছার পর বিভিন্ন ছোটখাট আলোচনায় আল মাহমুদ সম্পর্কে বিরূপ কথা শুনি। যাঁরা বলেন, তাঁরা অধিকাংশই তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা অধ্যাপক; কেউ কেউ কবি ও সাংবাদিক। তিনি যে একজন বড় কবি একথা অবশ্য তাঁরা অনেকেই মানেন। কিন্তু তাঁদের আশংকা যে ইসলামী গোঁড়ামি, পশ্চিম এশিয়ার পেট্রো ডলার এবং সামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা এই তিনে মিলে বাংলাদেশের সমূহ ক্ষতি করতে পারে এবং কোন শিল্পী তিনি যত শক্তিশালীই হোন না কেন, যখন ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সামরিক সরকারকে সমর্থন করেন তখন তাঁকে আর শ্রদ্ধা করা চলে না। তাঁদের কথা থেকে এটুকু বুঝতে পারি যে, শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই আল মাহমুদের বিরোধী এবং ঢাকায় বর্তমানে সম্ভবত তিনি নিঃসঙ্গ এবং প্রবহমান প্রধান ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন।" (দ্র. উপমা/আল মাহমুদ সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ. ২৫–২৬)।

নজরুলকেও তাঁর ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য চেতনার কারণে নিঃসঙ্গ করে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিভার সাত রঙা ঔজ্জ্বল্যে সকল বিদ্বেষ প্রচারণাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। অনুরূপ একই কারণে ফররুখ আহমদকেও একঘরে করার চেষ্টা হয়। নজরুলের মত তিনি প্রতিবাদী ছিলেন না কিংবা আত্মপক্ষ সমর্থন বা আত্মপ্রচারণায় তিনি অভ্যস্থ ছিলেন না। আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমানে বলীয়ান ফররুখকে তাই নীরবে-অভিমানে, অনাহার– বিনা চিকিৎসায় অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে বাঙলা সাহিত্যের এক অসাধারণ প্রতিভাকে অকালে ঝরে পড়তে হয়। আল মাহমুদকেও হয়ত একই ভাগ্যবরণে বাধ্য করার চেষ্টা চলে। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে তার প্রমাণ মেলে। বাস্তবে আরো অনেক প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু আল মাহমুদ কিছুটা ভিন্ন ধাঁচের। তাই নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে তিনি বলেন ঃ

"আধুনিক কবির কোন বন্ধু হয় না।... যূথবদ্ধভাবে রাজনীতি, ছিনতাই বা অন্যকিছু চলতে পারে। কিন্তু কবি হবে নিঃসঙ্গ। কবির অনুরাগী কিংবা অনুরাগিনী দু'একজন থাকতে পারে। অবস্থার বিপাকে এক-আধজন প্রেমিকও। কিন্তু কবির সাথে অন্য কবির দিবস যামিনী সৌহার্দ্য রক্ষা কবিতা নির্মাণে দারুণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে (উপমা, ১৯৯৪, পৃ. ১৭)।

অতএব, নিঃসঙ্গতা কবিকে মনঃক্ষুণ্ন করেনি বরং কবির কাব্য-চর্চার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গতা বা অন্যের উপেক্ষা অনেকটা শাপে বর হয়েই দেখা দিয়েছে। এটা যে কোন অভিমানের কথা নয়, তা তাঁর ব্যাপক সৃষ্টি-বৈচিত্র্য থেকে সহজেই ধারণা করা চলে। কবির আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থেকেই যে এরূপ ঘটেছে তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফররুখ আহমদ প্রসঙ্গে কবি বলেন ঃ

"ফররুখ আহমদকে একঘরে করে রাখা, তাঁর সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সাহিত্যিক পরিণাম জানা থাকা সত্ত্বেও আমি ইসলামকেই আমার ধর্ম, ইহলোক ও পারলৌকিক শান্তি বলে গ্রহণ করেছি।" (কবিতার জন্য বহু দূর পৃ. ৩৩)।

তাঁর পেট্রোডলার প্রাপ্তি সম্পর্কিত যে অপপ্রচার সে সম্পর্কে কবি বলেন ঃ

"ইসলাম গ্রহণ করে বুঝেছি, আমি বৈষয়িক দিক দিয়ে খুব বেশী বুদ্ধিমানের মত কাজ করিনি। কারণ পেট্রোডলার দূরে থাক, আমার মত নও মুসলিমদের এ তল্লাটে পেটে পাথর বাঁধার মত অবস্থা প্রায় সবারই।... যারা আমার ইসলাম গ্রহণকে পেট্রোডলারের কারসাজি বলে প্রচার করে এক ধরনের আন্তর্জাতিক বিরূপতা সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছেন তাদের জানিয়ে রাখি, আমার ভাগ্যে এখনও কোনরূপ সিকে ছিঁড়ে নি।" (কবির আত্মবিশ্বাস পৃ. ১১)।

তাই দেখা যায়, আল মাহমুদের নিঃসঙ্গতা তাঁর বিশ্বাসের কারণে। এ বিশ্বাসে তিনি দৃঢ়বদ্ধ, তাঁর আত্মার গভীর থেকে উৎপন্ন এ বিশ্বাস। তাই এ বিশ্বাস তাঁকে ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, পিছু হটার অবকাশ নেই।

আল মাহমুদের কাব্য-কর্মের প্রতি নিবিষ্ট দৃষ্টিপাত করলে এখানে কয়েকটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'লোক লোকান্তর' 'কালের কলস' ও 'সোনালী কাবিন' পর্যন্ত একটি পর্যায়। এখানে নারী ও প্রকৃতি একান্তভাবে তাঁর কবি-কল্পনাকে প্রভাবিত করে রেখেছে। এ পর্যায়ে নারীর দেহগত রূপ-সৌন্দর্য কবিকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছে যে, তাঁর প্রেম যৌনতা ও দেহজ কামনা-বাসনার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তাই এ প্রেম একান্ত বাস্তবসম্মত ও আবেগময়। পাঠকের মনকে তা সহজেই তরলিত করে। আল মাহমুদের প্রকৃতি-প্রেমও একান্ত অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক। বাংলার শ্যামল-সুন্দর প্রকৃতি চিরদিনই এর অধিবাসীদেরকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। বাংলার সবুজ নিসর্গ, ফুল, পাখি, নদী, শ্যামলবরণ নারী সেই চর্যাপদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল কবি-শিল্পী, সংবেদনশীল মানুষকেই কমবেশী আকৃষ্ট করেছে। সকলেই এর রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনায় অকুণ্ঠ। তবে সকলের বর্ণনাই এক রকম তা নয়, আবার সকলের বর্ণনাই সমান মনোমুগ্ধকর তাও নয়। আল মাহমুদ বাংলার কোমল পলিমাটির কোলে বেড়ে ওঠা মানুষ। প্রকৃতির নিবিড় আলো-ছায়া, মেঘ-রৌদ্ররের আনাগোনার মধ্যে আল মাহমুদের দুরন্ত কবি কল্পনার বিকাশ। বাড়ির পাশের তিতাস নদী, নদী-পাড়ের ঘন শ্যামলতা, শালবন-বাঁশবনের ফাঁকে জীর্ণ মায়াবী কুটির, গাছে গাছে ফুল-ফলের বাহার, নানা রঙের পাখিদের কিচির মিচির সবই একান্ত অন্তরঙ্গভাবে আল মাহমুদের কবিতায় ছায়া ফেলেছে।

'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' (১৯৭৬) থেকে 'দোয়েল ও দয়িতা' (১৯৯৭) পর্যন্ত কবিতার যুগকে আল মাহমুদের দ্বিতীয় পর্যায় বলা যায়। ১৯৭৪ সনে কারাবাসের সময় থেকেই আল মাহমুদের চিন্তা-চেতনায় যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তাঁর এ দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্য-কবিতায়। তাঁর এ পর্যায়ের কবি-কর্মে ইসলামী ঐতিহ্য, ভাব-চেতনা ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষঙ্গ স্থান লাভ করেছে। কুরআনের আয়াত, বিভিন্ন কাহিনী, চরিত্র এই পর্যায়ে কবি-কল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোন ক্রমেই আদর্শিক চেতনা তাঁর কবিতার শিল্পগুণ বিনষ্ট করেনি। বরং এই চেতনার ফলে বাংলা কাব্যে বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নানা রূপকল্প, উপমা, অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে।

'দ্বিতীয় ভাঙনে' (২০০০) এসে আল মাহমুদ আবার বাঁক ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এটাকে তাঁর কাব্য-কর্মের তৃতীয় পর্যায় বলা যায়। প্রতিভাবাবান ব্যক্তিরা কখনো এক স্থানে স্থির হয়ে থাকে না বেশী দিন। একবিংশ শতকে আল মাহমুদ হয়ত আরো বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব নিয়ে তাঁর কাব্যের ভুবনকে বিচিত্রতর করে তুলতে পারেন। আল মাহমুদের সেই ক্ষমতা আছে। এ পর্যায়ে আল মাহমুদ অধিকতর ঐতিহ্যসচেতন হয়ে উঠেছেন। মূলত আল মাহমুদের চিন্তা-চেতনায় ইসলামের প্রভাব, তাঁর কাব্য-কবিতায় তার প্রকাশ অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবং সে সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁর বিশ্বানুভূতি। বিশ্ব-পরিভ্রমণ, বহু দর্শন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যে নতুন ব্যঞ্জনা, বক্তব্য ও অনুভূতির সঞ্চার করেছে। এটা তাঁর সুপরিণতিরই সুস্পষ্ট লক্ষণ।

আল মাহমুদ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে ভারত, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সফর করেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি এ পর্যন্ত যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন তা নিম্নরূপ ঃ

১. বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (কবিতা, ১৯৬৮)
২. জয়বাংলা সাহিত্য পুরস্কার, কলকাতা (কবিতা, ১৯৭২)
৩. জীবনানন্দ দাশ স্মৃতি পুরস্কার (কবিতা, ১৯৭৪)
৪. সুফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য স্বর্ণপদক (ছোটগল্প, ১৯৭৬)
৫. বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার (কবিতা, ১৯৮০)
৬. শিশু একাডেমী (অগ্রণী ব্যাংক) পুরস্কার (ছড়া কবিতা, ১৯৮১)
৭. আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার (ছড়া কবিতা, ১৯৮৩)
৮. অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (কবিতা, ১৯৮৩)
৯. কাফেলা সাহিত্য পুরস্কার, কোলকাতা (কবিতা, ১৯৮৪)
১০. হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (ছোট গল্প, ১৯৮৪)
১১. একুশে পদক (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, কবিতা, ১৯৮৬)
১২. ফিলিপ্স সাহিত্য পুরস্কার (কবিতা, ১৯৮৭)
১৩. নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (কবিতা, ১৯৯০)
১৪. বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই- সাহিত্য পুরস্কার- ১৯৯১

আব্দুল মান্নান তালিব

আব্দুল মান্নান তালিবের জন্ম ১৫ মার্চ, ১৯৩৬ সনে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার অর্জুনপুর গ্রামে। পিতার নাম তালেব আলী মোল্লা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৫০ সনে ম্যাট্রিক, জামেয়া আশরাফিয়া, লাহোর থেকে ১৯৫৭ সনে দওরা-ই-হাদীস ও ১৯৬৬ সনে ঢাকা বোর্ড থেকে এইচ.এসসি পাশ করেন। বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী, আরবী, উর্দু ও ফারসী এই ছয়টি ভাষায় তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন।

আব্দুল মান্নান তালিবের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় শিউড়ির 'জিয়া উল ইসলাম' পত্রিকায়। স্বরচিত কবিতা ছাড়াও কাব্যানুবাদে তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হয়। লাহোর থাকাকালে তিনি কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদের বহু কবিতা উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে সেখানকার বিভিন্ন পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন। ইকবালের ফারসী কাব্য 'রমূযে বেখূদী'র ব্যাখ্যাসহ বাংলা অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেন। করাচীর 'ইকবাল একাডেমী'র তত্ত্বাবধানে ইকবালের আরো একটি কাব্য ও বহু সংখ্যক কবিতার তিনি অনুবাদ করেন। ১৯৫১-৭১ পর্যন্ত সময়ে তিনি কাব্য-চর্চায় বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তীতে এক্ষেত্রে ভাটা পড়ে, কারণ তখন তিনি মননশীল রচনা, অনুবাদ, গবেষণা, শিশুতোষ রচনা ও শিশু-কিশোরদের উপযোগী পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নে বিশেষ মনোযোগী হয়ে পড়েন।

আব্দুল মান্নান তালিবের কবি-খ্যাতি খুব একটা বিস্তৃতি লাভ করেনি। এর দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমতঃ তিনি মাত্র নির্দিষ্ট দু'একটি পত্রিকায়ই লিখেছেন, দুর্ভাগ্যবশত যার প্রচার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। ফলে বৃহত্তর পাঠক সমাজ তাঁকে জানার তেমন সুযোগ পায়নি। দ্বিতীয়ত তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত কবিতা চর্চা করলেও এ পর্যন্ত তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। একাধারে দারিদ্র্য এবং কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকদের অনীহাই হয়ত এজন্য দায়ী। তাঁর নিজের নির্লিপ্ত মানসিকতাও এ ব্যাপারে কম দায়ী নয়।

দারিদ্র্য এবং নানা প্রতিকূলতার সাথে নিরন্তর সংগ্রাম করে পথ চলেছেন আবুল মান্নান তালিব। পশ্চিম বঙ্গের বৈরী পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে আদর্শগত-প্রাণ তালিব নিজের বিশ্বাস ও দ্বীনী কাজের সুবিধার্থে জীবনে কয়েকবারই হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন– পশ্চিমবঙ্গ থেকে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে, সেখান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে, এখান থেকে আবার পশ্চিমবঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত আবার স্বাধীন বাংলাদেশে হিজরত করেন। বিভিন্ন সময় জীবন-জীবিকার তাগিদে তিনি বিভিন্ন ধরনের কর্মে নিয়োজিত থাকেন। তবে সব কাজের মূল ধরন হলো সাংবাদিকতা ও সাহিত্য-সাধনা। নীচে এর বিবরণ দেয়া হলো ঃ

- সাময়িকপত্র "জিয়াউল ইসলাম" বার্ষিকী, ১৯৫২, সম্পাদক, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ
- সহ-সম্পাদক, উর্দূ দৈনিক– "রোজনামা তাসনীম," লাহোর,১৯৫৭-৫৯
- সহ-সম্পাদক, "দৈনিক ইত্তেহাদ," ঢাকা, ১৯৫৯-৬০
- সভাপতি, পাক সাহিত্য সংঘ, ঢাকা, ১৯৬১-৭১
- সহ-সম্পাদক ও পরে সম্পাদক সাপ্তাহিক "জাহানে নও" ১৯৬২-৬৬
- রিসার্চ স্কলার, ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭-৭১
- সম্পাদক, মাসিক পৃথিবী, ১৯৬৯-৭১
- ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, সাপ্তাহিক মীযান, কলিকাতা ১৯৭৩-৭৫
- রিসার্চ স্কলার, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৭৫-৮৫
- সম্পাদক, ত্রৈমাসিক ও মাসিক কলম, ১৯৭৭-৯৪
- সম্পাদক, মাসিক পৃথিবী, ১৯৮১-১৯৯৯
- সম্পাদক, শাহীন শিবির, দৈনিক সংগ্রাম, ১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭৭-৮২
- কলামিষ্ট ও ফিচার এডিটর, দৈনিক সংগ্রাম ১৯৮৩ –
- পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৭ –

উপরোক্ত বিবরণ থেকে জানা যায়, অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী তিনি সাংবাদিকতা পেশা, গবেষণা ও সাংগঠনিক কাজের সাথে জড়িত। তাঁর সকল কাজের পেছনে একটি মহৎ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কাজ করছে। তাঁর সাংবাদিকতা করার পেছনে যে প্রধান তাগিদ কাজ করেছে তা হলো, পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ সাংবাদিকতার মাধ্যমে একটি মানবিক কল্যাণময় সমাজ বিনির্মাণ। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবন শুধুমাত্র গতানুগতিকভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটা তাঁর জীবনের এক নিরবচ্ছিন্ন মিশন। এ মিশন এক নতুন আলোর শপথে দীপ্ত। আব্দুল মান্নান তালিব সে আলোর শপথে উদ্দীপ্ত এক প্রাণময় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি নিজে দারিদ্র্য ও বিপদসংকুল সাংবাদিকতার বন্ধুর শ্বাপদঘেরা জনারণ্যে পথ করে নিয়েছেন তাই নয়, আরো অনেককেই সে পথে চলার পথ নির্দেশনা দিয়েছেন, হাতে ধরে অনেককেই একত্রে পথ চলার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাই সাংবাদিক হিসাবে তাঁকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন আছে।

গবেষক হিসাবেও তিনি মৌলিকত্বের দাবীদার। বিভিন্ন বিষয়কে তিনি গতানুগতিকতার উর্ধ্বে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার পক্ষপাতি। তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ইসলামের মূলনীতির দ্বারা পরিচালিত। দীর্ঘদিন যাবত মুসলিম সমাজে জ্ঞান-সাধনার অভাব, ইজতিহাদের দ্বার অনেকটা রুদ্ধ থাকায় এবং নানা সংস্কার ও গোড়ামীর কারণে মুসলমান সমাজে ইসলামের নামে অনেক অনৈসলামী রসম-রেওয়াজ, চিন্তাধারা ও জীবনধারা চলে আসছে। আব্দুল মান্নান তালিব এসব ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালা তুলে ধরার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তাই শুধু গতানুগতিকভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ না করে তিনি খোলা মনে মৌলিক ও আসল বিষয় ও প্রকৃত সত্য সন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। এক্ষেত্রে তিনি অনেকটা মুফতী বা মুহাদ্দিসের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। এ দায়িত্ব পালনে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন আধুনিক কতিপয় বিখ্যাত যুগান্তকারী জ্ঞান-সাধকের নিকট থেকে। এঁদের মধ্যে মহাকবি আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল, শহীদ হাসানুল বান্না, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী ও ডক্টর ইউসুফ আল কারদাভী প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীতে এঁরা ইসলামী জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছেন এবং শহীদ হাসানুল বান্না ও মওলানা মওদূদী বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নিশানবরদার হিসাবে বিশ্বব্যাপী অগণিত অনুসারী সৃষ্টি করে একবিংশ শতকেও সে আন্দোলনকে এক অপ্রতিহত গতি দানে সক্ষম হয়েছেন।

আব্দুল মান্নান তালিব তাঁদেরই নিষ্ঠাবান অনুসারী এবং বিশেষত সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। তাঁর সাহিত্য-কর্ম, বিশেষত মৌলিক প্রবন্ধ রচনায়, এর সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। অনুবাদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিবেচনা করলেও এ কথার সত্যতা প্রতিভাত হয়। নীচে তালিবের সাহিত্য-কর্মের বিবরণ প্রদত্ত হলো ঃ

মৌলিক রচনাবলী

প্রবন্ধগ্রন্থ ঃ ১. অবরুদ্ধ জীবনের কথা, ১৯৬২, ২. মুসলমানের প্রথম কাজ, ১৯৭৫, ৩. বাংলাদেশে ইসলাম, ১৯৭৯, ৪. ইসলামী সাহিত্যঃ মূল্যবোধ ও উপাদান, ১৯৮৪, ৫. আমল ও আখলাক, ১৯৮৬, ৬. ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন, ১৯৮৭, ৭. ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তার বিকাশ, ১৯৮৮, ৮. সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা ঃ ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট, ১৯৯১, ৯. ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন, ১৯৯৪, ১০. সত্যের তরবারি ঝলসায়, ২০০০, ১১. আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম ২০০১

সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ১২. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, ১৯৬৯, ১৩. সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, ১৯৮২, ১৪. সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, ১৯৯৬, ১৫. রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খণ্ড, ১৯৮৫, ১৬. মুসলিম শরীফের মুকদ্দমা, ১৯৮৬, ১৭. নির্বাচিত গল্প, ১৯৮৫, ১৮. সত্য সমুজ্জ্বল, ১৯৮১, ১৯. রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা, ১ম খণ্ড, ১৯৯৫

শিশু-কিশোর সাহিত্য ঃ ২০. সহজ পড়া, ১৯৮২, ২১. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা, ১ম ভাগ, ১৯৮০, ২২. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা, ২য় ভাগ, ১৯৮১, ২৩. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা, ৩য় ভাগ, ১৯৮২, ২৪. ইসলাম শিক্ষা, ১ম ভাগ, ১৯৭৬, ২৫. ইসলাম শিক্ষা, ২য় ভাগ, ১৯৭৬, ২৬. এসো জীবন গড়ি, ১ম ভাগ, ১৯৭৬, ২৭. এসো জীবন গড়ি, ২য় ভাগ, ১৯৭৫, ২৮. পড়তে পড়তে অনেক জানা, ২০০০, ২৯. মা আমার মা, ২০০১, ৩০. আমাদের প্রিয় নবী, ১৯৭৫, ৩১. মজার গল্প, ১৯৭৬, ৩২. কে রাজা? ১৯৮১, ৩৩. হাতিসেনা কুপোকাত, ১৯৯০, ৩৪. আদাবু আরাবীয়া, ১৯৮৪

অনুবাদ সাহিত্য ঃ ৩৫. খতমে নবুওয়াত, ১৯৬২, ৩৬. পয়গামে মোহাম্মদী, ১৯৬৭, ৩৭. ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ, ১৯৬৪, ৩৮. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, ১৯৬৫, ৩৯. ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন বীমা, ১৯৬৬, ৪০. ইসলামের সমাজ দর্শন, ১৯৬৭, ৪১. সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, ১৯৭৯, ৪২. আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি, ১৯৭৬, ৪৩. আত্মশুদ্ধি কিভাবে? ১৯৭৬, ৪৪. ভাষাভিত্তিক জাহেলিয়াতের পরিণাম, ১৯৭৫, ৪৫. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি, ১৯৬৮, ৪৬. মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী, ১৯৮২, ৪৭. মহররমের শিক্ষা, ১৯৭৭, ৪৮. ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী, ১৯৭৫, ৪৯. কুরবানীর শিক্ষা, ১৯৭৬, ৫০. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, ১৯৬৮, ৫১. রাসায়েল ও মাসায়েল, ২য় খণ্ড, ১৯৯১, ৫২. যরবে কলীম, ১৯৯৪, ৫৩. সীরাতে সারওয়ারে আলম, ১ম খণ্ড, ১৯৮১, ৫৪. রাসায়েল ও মাসায়েল, ৩য় খণ্ড, ১৯৯১, ৫৫. রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা, ১৯৯৪, ৫৬. রিয়াদুস সালেহীন, ২য় খণ্ড, ১৯৮৬, ৫৭. রিয়াদুস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, ১৯৮৬, ৫৮. রিয়াদুস সালেহীন, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮৭, ৫৯. ইরান বিপ্লব ঃ একটি পর্যালোচনা, ১৯৮২, ৬০. সহীহ আল বুখারী, ৪থ খণ্ড, ১৯৮২, ৬১. তাফহীমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, ১৯৮৯, ৬২. তাফহীমুল কুরআন, ১৯ খণ্ড, ১৯৯১, ৬৩. তাফহীমুল কুরআন, ২য় খণ্ড, ১৯৯৩, ৬৪. তাফহীমুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, ১৯৯৪, ৬৫. তাফহীমুল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, ৬৬. তাফহীমুল কুরআন, ৫ম খণ্ড, ৬৭. তাফহীমুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৮. তাফহীমুল কুরআন, ৭ম খণ্ড, ৬৯. তাফহীমুল কুরআন, ৮ম খণ্ড, ৭০. তাফহীমুল কুরআন, ৯ম খণ্ড, ৭১. তাফহীমুল কুরআন, ১০ম খণ্ড, ৭২. তাফহীমুল কুরআন, ১১ম খণ্ড, ৭৩. তাফহীমুল কুরআন, ১২ম খণ্ড, ৭৪. তাফহীমুল কুরআন, ১৩ম খণ্ড, ৭৫. প্রত্যয়ের সূর্যোদয়, ২০০০

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহের তালিকা থেকে সাহিত্যিক আব্দুল মান্নান তালিবের একটা মোটামুটি পরিচয় লাভ করা যায়। এর দ্বারা তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতা সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। মননশীল মৌলিক রচনা, সম্পাদনা, শিশুতোষ রচনা, অনুবাদ, কবিতা ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাঁর বহুমুখী প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় বহন করে। অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে, অবিচল নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশককাল ধরে পঁচাত্তরটি গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে তিনি

বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তা আমাদেরকে বিস্ময়-আনন্দে নিরতিশয় অভিভূত করে। ফলে কৌতূহলী পাঠকের শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে তিনি স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

আব্দুল মান্নান তালিবের মৌলিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'বাংলাদেশে ইসলাম' একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। লেখকের ইতিহাস-দৃষ্টি এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসা আমাদেরকে অনেক অজানা বিষয়ের সন্ধান দিয়েছে। আমরা যতটা জানতে পেরেছি তার চেয়ে আমাদের জিজ্ঞাসাকে তিনি অধিক জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছেন। সেদিক দিয়ে তিনি ইতিহাস-পাঠকের সামনে এক নতুন দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস এক জটিল বিষয়। কারণ যাঁরা এ ইতিহাস লিখেছেন তাঁরা নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে পারেননি অধিকাংশ ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান–তাদের সম্পর্কে, তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, জীবনায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে ইতিহাস রচয়িতাগণ-দুর্ভাগ্যবশত যারা প্রায় সকলেই অমুসলমান–যথাযথ, তথ্য–পূর্ণ ও প্রমাণসাপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ পেশ করতে পারেননি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা অসত্য, বিভ্রান্তিকর ও বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মুসলমান ও ইসলামের নামে কলংক লেপনের অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছেন। তাই অনেক সময় তাঁদের লেখা থেকে মুসলমান ও ইসলামের সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধান করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এহেন অবস্থায় আব্দুল মান্নান তালিব অসংখ্য বাংলা, ইংরাজী, উর্দু, আরবী, ফারসী গ্রন্থ এবং দুষ্প্রাপ্য নানা তত্ত্ব-তথ্য, দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে 'বাংলাদেশে ইসলাম' নামক তাঁর মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেন।

'ইসলামী সাহিত্য ঃ মূল্যবোধ ও উপাদান' এবং 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' গ্রন্থ দুটিও অত্যন্ত মূল্যবান দুটি গবেষণা-প্রসূত মৌলিক গ্রন্থ। ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মহানবী (স.) স্বয়ং এ জীবন বিধানের ভিত্তিতে এক অনন্য আদর্শ সমাজ পরিগঠন করেন। ইসলামের মহান চার খলীফা (রা.) মহানবীর (স.) পদাংকানুসরণ করে সেই আদর্শ সমাজকে আরো সম্প্রসারিত ও মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করান। সে সমাজে আল কুরআনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা, শাসন-ব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা, সামাজিক অন্যান্য সকল ব্যবস্থাপনা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি পরিচালিত ও সম্পাদিত হতো। আল কুরআনের ভিত্তিতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ এ সকল ক্ষেত্রে নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু খুলাফায়ে রাশিদার পর খিলাফতের বদলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাসহ সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শ চরমভাবে উপেক্ষিত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, অমুসলমানদের রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা, শাসন-ব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা, সামাজিক

রীতিনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি সবই মুসলমানরা অনুসরণ করতে শুরু করে। এসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিজস্বতা বলতে, স্বাতন্ত্র্য বলতে, বৈশিষ্ট্য বলতে তেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। শুধুমাত্র মসজিদে যাওয়া, নামায-রোজাসহ কতিপয় বুনিয়াদী ইবাদত ও অর্থ না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত ব্যতীত মুসলমানদের চোখে পড়ার মত আর কোনই বৈশিষ্ট্য থাকলো না। অথচ মুসলমানরা এমন এক জাতি যার জীবনায়নের সকল ক্ষেত্র অন্য সকল জাতি থেকে স্বতন্ত্র, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সর্বোত্তম। মুসলিম জাতি তাদের এই স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলীর কারণে এক সময় সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল আর এই স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলী বিসর্জন দেয়ার ফলে তারা দীর্ঘকাল বিজাতির গোলামী করতে বাধ্য হয়। আজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি-আদর্শের কথা আমরা বিস্মৃত হয়ে পড়েছি। উদাহরণস্বরূপ সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে ইসলামের সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে, অমুসলমানদের সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে মুসলমানদের সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য তা বর্তমানের অধিকাংশ মুসলিম-রচিত কাব্য-উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি পাঠ করে বোঝার উপায় নেই।

আব্দুল মান্নান তালিব কুরআন-হাদীসের নীতিমালার ভিত্তিতে ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ, উপাদান ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও ধারণা উপরোক্ত গ্রন্থ দুটিতে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গ্রন্থ দুটিতে অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণতা ও নতুন বিবেচনার অবকাশ থাকলেও এ যুগে বাংলা ভাষায় এসব বিষয়ে তিনি যে আলোচনার সূত্রপাত করে দিক-নির্দেশকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে আরো ব্যাপক আলোচনা-গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তবে আব্দুল মান্নান তালিবের উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় এ বিষয়ে নতুন গবেষকদের অনেক চিন্তার খোরাক যোগাতে সক্ষম হবে। তাঁর অন্যান্য মৌলিক রচনাবলীতেও বহু মৌলিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছে।

শিশু-কিশোর সাহিত্যের রচয়িতা হিসাবেও আব্দুল মান্নান তালিবের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। শিশু-কিশোররা জাতির ভবিষ্যত। তাদের মন-মানসিকতা অনুযায়ী রুচিশীল সাহিত্য সৃষ্টি করার গুরুত্ব অপরিসীম। তাদেরকে সঠিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করা, মহৎ ও উন্নত জীবন গঠনে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা শিশু-সাহিত্যিকের গুরু দায়িত্ব। আব্দুল মান্নান তালিব এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আনজাম দিয়েছেন। তাঁর শিশুতোষ রচনায় আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য—মূল্যবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে। উন্নত আদর্শ ও নৈতিকতার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্য রচিত। শিশু-কিশোরদের উপযোগী ভাষা ব্যবহার, কাহিনী অবলম্বন ও পরিমল আনন্দ প্রদানের জন্য রচিত তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্য ও বিভিন্ন পাঠ্য-পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদক হিসাবেও আব্দুল মান্নান তালিবের অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা সর্বাধিক। আরবী, উর্দু বিভিন্ন ভাষার ৪১টি মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তিনি। এর মধ্যে তাফহীমূল কুরআন, বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ, সীরাতে সারওয়ারে আলমসহ মওলানা মওদূদীর বিভিন্ন আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অনুবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাঁর অনুবাদের ভাষা মূলের ন্যায় সহজ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে আব্দুল মান্নান তালিবের অবদান চিরভাস্বর, অমলিন ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই।

সাহিত্য-সংগঠক হিসাবেও আব্দুল মান্নান তালিবের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ১৯৬১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় তরুণ সাহিত্যিকের উদ্যোগে পাক সাহিত্য সংঘ নামে যে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়, তরুণদের অনুরোধে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ষাটের দশকে রুচিশীল সাহিত্য নির্মাণে গঠনমূলক বলিষ্ঠ আন্দোলন পরিগঠনে পাক সাহিত্য সংঘের বিশেষ অবদান ছিল। অতঃপর ১৯৮৭ সন থেকে বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, গবেষণা, প্রকাশনা, মননশীলতার বিকাশ, সুস্থ সৃজনশীল সাহিত্য নির্মাণে বাংলা সাহিত্য পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আব্দুল মান্নান তালিবের অবদান সর্বাধিক।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মূল্যবান অবদানের জন্য আব্দুল মান্নান তালিব ১৯৯৪ সালে "বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিস স্কুল, দুবাই" সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

আশির দশকের কবি মোশাররফ হোসেন খান

আশির দশকে এক ঝাঁক তরুণ কবি বিপুল সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন। তাঁরা অনেকেই সময়ের কাঁধে ভর করে সমান তালে চলতে পারেননি, তবে কেউ কেউ উৎরে গেছেন এবং বিদ্যুৎ চমকে আলোকিত করেছেন সাহিত্যের দিগন্ত। তাঁদের প্রতিভা এবং প্রতিশ্রুতির চমক আমাদের বিস্ময়-পুলকে বিমুগ্ধ করেছে। শুধু গতানুগতিক পঙতিমালা রচনায়ই নয়, শিল্প-রীতির ক্ষেত্রে তাঁদের নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভাব, বিষয়, উপাদান, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের অভিনবত্ব ইতোমধ্যেই পাঠকের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিরিশের কবিরা এক সময় যেমন আঙ্গিক ও বিষয় নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রীতি-নীতির অনুসরণ করে কাব্য-ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধারার প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, আশির দশকের তরুণ কবিরাও তেমনি বহু ক্ষেত্রে নতুনত্বের প্রয়াসী। তবে একটি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। তিরিশের কবিরা প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে ইংরেজী সাহিত্যের আদলে নতুনত্ব সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। আশির দশকের কবিরা সেক্ষেত্রে পুরাতন কোন কিছু বর্জন বা ইংরেজী সাহিত্যের অনুসরণ না করেই কিছুটা নতুনত্বের প্রয়াসী।

তিরিশের কবিরা কাব্যের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুন গদ্য-ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার, শব্দ, রূপক, উপমা, প্রতীকের বিচিত্র প্রয়োগ এবং কিছুটা ভাব, বিষয় ও জীবন-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনয়নে সমর্থ হন। আশির কবিরাও কাব্যের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত। শব্দ, রূপক, উপমা, প্রতীকের ব্যবহারে তাঁরা গভীর অভিনিবেশী। তবে মনে হয়, ধীরে ধীরে গদ্য ছন্দ থেকে তাঁরা অন্তঃমিলের দিকে ফিরে আসতে আগ্রহী। এজন্য পাঠক হয়তো তাঁদের কবিতায় অনেকটা স্বস্তিই বোধ করে।

কিন্তু আশির কবিরা যে জন্য অধিক জনপ্রিয়তা দাবী করতে পারেন সেটা হলো তাঁদের ভাব, বিষয়, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির বলিষ্ঠ জীবনধর্মী প্রকাশ। আশির কবিরা আরো একটি ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারেন, সেটা হলো তাঁদের ঐতিহ্য-প্রীতি। এঁদের অনেকেই ঐতিহ্য-সচেতন। তাঁদের শব্দ-ব্যবহার থেকে শুরু করে ভাব, বিষয়, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি প্রকাশের ক্ষেত্রেও ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ অন্বেষণে তাঁরা সতত ব্যস্ত। এটা তাঁদের কাব্যের এক বিস্ময়কর আনন্দ ঝংকার যা হৃদয়কে আপ্লুত করে এক চিরায়ত স্বপ্ন-কল্পনা ও নিশ্চিন্ত আশ্বস্ততায়। আশির কবিরা বয়সে অনেকটা নবীন হলেও তাঁদের অনেকেই অভিজ্ঞতায় প্রবীণ এবং সৃষ্টি-কৌশলে কখনো কখনো প্রাজ্ঞতার ছাপ রেখে চলেছেন। এঁদের সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি, তবে এঁরা কেউ কেউ পাঠক-মনে যে পরিমাণ আগ্রহ-ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছেন, তাতে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা-বিবেচনার সূত্রপাত হওয়া আবশ্যক বলে আমার ধারণা।

আগেই বলেছি, আশির অনেক কবির মধ্যে কয়েকজন তাঁদের প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য নিয়ে পাঠকের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন। এঁদের একজন হলেন মোশাররফ হোসেন খান। সাহিত্যের বিচিত্র অলি-গলিতে স্বনামে-বেনামে মোশাররফ হোসেন খানের বর্ণাঢ্য উপস্থিতি, তবে প্রধানতঃ তিনি কবি। তাঁর প্রতিভার মূল স্রোতধারা কবিতার পলি কেটে কেটে প্রখর গতি বেগে স্বচ্ছন্দে প্রবহমান। তবে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যেমন প্রবন্ধ, গল্প–জীবন-কাহিনী রচনায়ও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এখানে প্রদত্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা থেকে তাঁর বহুমাত্রিক প্রতিভার একটা পরিচয় পওয়া যাবে। বয়সের বিবেচনায় এ তালিকাকে হ্রস বলা যায় না; বরং তাঁর সৃষ্টির মুখরতারই এটা প্রমাণ বহন করে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে ঃ

কবিতা ঃ (১) হৃদয় দিয়ে আগুন (২) নেচে ওঠা সমুদ্র (৩) আরধ্য অরণ্যে (৪) বিরল বাতাসের টানে (৫) পাথরে পারদ জ্বলে (৬) ক্রীতদাসের চোখ (৭) বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা (৮) নতুনের কবিতা প্রভৃতি।

ছোটগল্প ঃ (১) প্রচ্ছন্ন মানবী (২) সময় ও সাম্পান, (৩) ডুবসাঁতার।

জীবনীগ্রন্থ ঃ (১) হাজী শরীয়তুল্লাহ (২) সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর।

কিশোর উপন্যাস ঃ (১) বিপ্লবের ঘোড়া (২) সাগর ভাঙার দিন।

কিশোরতোষ ঃ (১) সাহসী মানুষের গল্প ১ম ও ২য় খণ্ড, (২) অবাক সেনাপতি (৩) রহস্যের চাদর।

সম্পাদনাগ্রন্থ ঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান।

মোশাররফ খানের কাব্যে সর্বদা একটি সযত্ন প্রয়াস লক্ষণীয়। গভীর নিষ্ঠা, একান্ত কাব্য-মগ্নতা এবং ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ-স্বচ্ছন্দতা তাঁর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে আমার মনে হয়েছে। কবিতা যেন তাঁর নিকট এক অনায়াম শিল্প-কর্ম, ভাবের তরীতে, অন্তহীন

দিগন্তে স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তবে এ বিচরণ উদ্দেশ্যহীন নয়, এক প্রাণোচ্ছল গতিমান জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ, দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিরহ, ঘাত-অভিঘাত, স্বপ্ন-কল্পনার সজীব, অনবদ্য প্রকাশ তাঁর সৃষ্টি-কর্মকে সর্বদা দীপ্ত জীবন-রসে উজ্জীবিত করে রেখেছে। যেমন,

সারা রাত কাল কেটেছে বিনিদ্রায়
জানিনে কখন চলে গেছে রাতের ট্রেন
সারা রাত ছিল কাল বৃষ্টিমুখর।

স্মৃতিরা এসেছিল কাল রাতে চুপে চুপে
বলেছিল কানে কানে ঃ চলে গেছে
সেই মেয়ে দূর দেশে, যে নাকি এসেছিল
এমনই শাওন রাতে হৃদয়ের টানে।
(কাল রাতে॥ নেচে ওঠা সমুদ্র)

অনেক দিন প্রদীপ্ত আলোর মুখ দেখিনি
তীর্যক শিখা রশ্মিও আমার চোখে পড়েনি
প্রভাত আসবে কিনা তাও বলতে পারিনে
তবে রাত ও সূর্যকে বিদীর্ণ করে এবার
দেখতে চাই পৃথিবী; হোক না তার জ্বলন্ত -
ঝলসানো পোড়া মুখ।
(সিদ্ধান্ত॥ নেচে ওঠা সমুদ্র)

শব্দ, রূপক, উপমা, প্রতীকের ব্যবহারে মোশররফ হোসেনের সতর্ক প্রয়াস লক্ষণীয়। সুনির্বাচিত শব্দের কুশলী প্রয়োগে তার কাব্য–ভাষা সুষমাণ্ডিত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আলংকারিকেরা কবিতাকে 'শব্দের শিল্প' বলে থাকেন । ইংরেজ সমালোচক Coleridge-এর ভাষায় কবিতা হলোঃ 'Best words in the best order'– 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেনঃ 'আশ্‌শেয়রু বিমান ঝিনাতিল কালাম' অর্থাৎ 'কবিতা সুবিন্যস্ত শব্দের সমষ্টি'। (মিশকাতশরীফ)। এ দিক দিয়ে মোশাররফ হোসেন শব্দ নির্বাচনে ও তার সুপ্রযুক্ত বিন্যাসে যথার্থ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে সদা সচেষ্ট বলে মনে হয়। দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক ঃ

১. পৃথিবীর পিঠে ঝরে যখন সোনালী রোদ
মানুষেরা চেয়ে চেয়ে দেখে আকাশের ছাদ
আনন্দের জোনাকিরা কীভাবে ছড়িয়ে যায়
উৎসবের শিশির সবুজের গালিচায়।

কী আশ্চর্য! শকুনেরা তখনো খুঁজতে থাকে
আঁধার ভাগাড়ে শব; শবের দুর্গন্ধ দেহ।
(শকুন ॥নেচে ওঠা সমুদ্র)

২. সন্তাপ দহনে জ্বলে ক্ষয়িষ্ণু নগর।
পাপের ছেনিতে কাটে বিষাক্ত জীবন
রক্তের নদীতে ভাসে স্বপ্নের ফানুস
ত্রাসের নগর যেন ক্ষুধার্ত কুকুর।

পাপিষ্ঠ নগর থেকে পালাও মানব
চলো যাই লাভা ছেড়ে অরণ্যের কাছে
যেখানে রয়েছে জেগে মমতার চাঁদ
যেখানে রয়েছে প্রাণ-প্রেমের স্বভাব।
(বিপন্ন নগরী ॥পাথরে পারদ জ্বলে)

চারপাশে দাবদাহ, শকুনের চিৎকার
নখের আঁচড়ে রক্ষাক্ত পৃথিবী
অস্তিত্বের প্রলম্ব স্মারক
পালাও পালাও বলে
নিয়ত শাসিয়ে যায় দাঁতাল প্রবাহ

আমি তো গ্রহের ওপর বেঁধেছি বাসা
ধারণ করেছি বুকে সকল পর্বত
পাঁজরে নিয়েছি তুলে ঝড় আর দুর্ধর্ষ প্লাবন
এই তো দাঁড়িয়ে আছি
আগ্নেয়গিরির চূড়ার ওপর
(প্রতিকূলে ॥ পাথরে পারদ জ্বলে)

৪. তোমাকে দেখিনি। তবু জানি তোমার অস্তিত্ব ভাসে।
যত দূরে যাই কিংবা যেদিকে ফেরাই দুটি চোখ
সেখানেই আছো তুমি, মিশে আছো ভূলোক-দ্যুলোক।
তোমার নামের জ্যোতি আঁধারেও অবিরাম হাসে।

দিয়েছো অঢেল তুমি হে মালিক! শীতল বাতাস,
বৃক্ষলতা, জমিনের জরিপাড়, ঘাসের বিছানা—
আমাকে দিয়েছো খুলে রহমের দিগন্ত সীমানা।
মাথার ওপরে ছাদ, কারুকাজ-সুনীল আকাশ।
(তোমার নামের ঢেউ ॥ক্রীতদাসের চোখ)

রূপক, উপমা, প্রতীকের ব্যবহারে মোশাররফ হোসেন খানের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে তিনি গতানুগতিকতার গন্ডী অতিক্রম করে কবি-কল্পনার কুশলী সৌকর্যের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। দু'একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি সহজবোধ্য হবে।

বিলের দুর্লভ কালো জলের মতো দু'বাহুতে মেখে নিয়ে সময়
আর নক্ষত্রের প্রদীপ্ত রশ্মি তীক্ষ্ণ দু'চোখে সুরমার মতো এঁটে
নরোম ঘাসের গালিচায় বসে তুমি যখন আকাশের দিকে চাও
তখন আকাশ লজ্জিত হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চায় নাকি?
(স্বর্ণালী দু'টি চোখ॥নেচে ওঠা সমুদ্র)

জীবনের বালিশ ফেটে বেরিয়ে যাচ্ছে ক্রোধের তুলো
(শিকার॥নেচে ওঠা সমুদ্র)

বামপাশে ঘুমিয়ে পড়েছে শতাব্দীর মহাকাল
ডানপাশে দীর্ঘতম সিঁড়ি, অসীম শূন্যতা
মাঝখানে ঝুলন্ত প্রহর, সময়ের পেন্ডুলাম

ভয়ংকার ঘন্টাধ্বনি বেজে যায় এক দুই তিন
ঝরে যায় কালের শরীর থেকে নিয়মের পাতা
(শতাব্দীর পিঠ থেকে॥পাথরে পারদ জ্বলে)

নৈঃশব্দের কোমর পেচিয়ে ঝুলে আছে
বিধবা প্রহর
মাথার উপর বাস্তুহারা মেঘ
সমুদ্র উপচে পড়ে বৃষ্টির ক্রন্দন
(দ্রোহের প্রশ্বাস॥পাথরে পারদ জ্বলে)

দুঃসহ নীরবতার মধ্য দিয়ে হেঁটে যায় আলম্ব আঁধার
উন্মুখ ছায়ার মাঝে পড়ে থাকে ক্লান্ত জিহ্বা
জিহ্বার সড়ক বেয়ে হেঁটে যায়-
শাদা বরফের মতো পর্বত সময়
(দরোজা খোলার পর॥পাথরে পারদ জ্বলে)

মৃত নক্ষত্রের চোখে নেকড়ের ছায়া

বারুদের শিঙে ঝুলে আছে বিপন্ন পৃথিবী
রোমশ গ্রহের ভেতর প্রাচীন পুরুষের চিৎকার
আগুনের টিলার ওপর—
তবুও বেঁধেছে বাসা মোমের পাখিরা

সৌরতাপে গলে পড়ছে মেঘের চর্বি
নির্মম পাতিলে পোড়ে জোছনার দেহ
পুড়ে যায় ইতিহাস কালের মাংস
(আগুনের টিলা॥পাথরে পারদ জ্বলে)

মেঘের গম্বুজ ফেটে নেমে আসে আলোর মিছিল।
আকাশ নীলিমা আর পৃথিবীর সবুজ উঠোন
শিহরিত তার স্বরে। পাহাড় সমুদ্র উপবন
একে একে খুলে দেয় দীপ্তিমান জোছনার খিল।
(মুহাম্মদ (সা)॥ক্রীতদাসের চোখ)

এভাবে অনেক উদাহরণ দেয়া যায়, যেখানে মোশাররফ খান উপমা, রূপক, প্রতীকের ব্যবহারে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ ও উজ্জ্বল। মোশাররফ হোসেনের শব্দ-চয়ন ও রূপক-উপমা-প্রতীক নির্মাণ কৌশলে প্রায়শই ঐতিহ্যের আমেজ পরিলক্ষিত হয়। তবে এটা সব সময় অতটা স্পষ্ট নয়; কিন্তু তার ভাব, বিষয়, উপাদান ও সমগ্র কাব্য-পরিমন্ডলে ঐতিহ্যের একটা সতেজ, প্রাণোচ্ছল, বলিষ্ঠ প্রকাশ সুস্পষ্ট। এটা ক্রমান্বয়েই আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এটা তার কাব্যের একটি উজ্জ্বল দিক। তাই মোশাররফ হোসেনকে একজন ঐতিহ্যবাদী কবি বলা যায়। আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবন-বিশ্বাসের এক শাশ্বত, প্রাণবন্ত চেতনা তার কাব্য-কৃতি ও তার সমগ্র পরিমণ্ডলকে ঐশ্বর্যময় ঋদ্ধতা দান করেছে। ফলে তার কাব্যের আবেদন হয়েছে ব্যাপক ও গভীর। যে কোন সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়িত্বের জন্য এই বিশেষ গুণটি অত্যাবশ্যক। তাই সঙ্গতভাবেই আশা করা যায়, মোশররফ হোসেন সাময়িকতার গণ্ডীকে অতিক্রম করে এমন একটি অবস্থানে এসে পৌঁছেছেন, যেখান থেকে তাঁর কাব্যের আবেদন কালাতীতকে হয়তো এক সময় স্পর্শ করে যাবে। তার শেষদিকটায় দুটি কাব্যগ্রন্থ 'পাথরে পারদ জ্বলে' এবং 'ক্রীতদাসের চোখ' পাঠ করে আমার মধ্যে এরকম একটা অনুভূতিই সৃষ্টি হয়েছে। প্রাঞ্জলতা, পরিপক্কতা ও ঐতিহ্যবোধ তার এ দুটি কাব্যকে এক বিশেষ উজ্জ্বলতা দান করেছে। প্রাঞ্জলতা ও পরিপক্কতা যেখানে তার ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচায়ক, ঐতিহ্যবোধের ক্ষেত্রে তিনি সেখানে তাঁর পূর্বসূরী, বিশেষতঃ নজরুল-ফররুখের নিকট অবশ্যই ঋণী। তবে কবির ব্যক্তিগত অনুভব, ভাব-চেতনা ও জীবনাদর্শকে এক্ষেত্রে যথাযথ বিবেচনায় আনতে হবে।

আধুনিক বাংলা কাব্যে কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শের প্রথম উজ্জ্বল পথিকৃৎ। ফররুখ আহমদ তাতে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছেন। ভাব, ভাষা, বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি একান্তভাবে এবং খানিকটা ভিন্ন স্বাদের পরিপূর্ণ ইসলামী ঐতিহ্যের প্রাণময় কবি-সত্তা। এদিক থেকে তাঁকে 'শায়েরুর রাসূল' বা 'রাসূলের কবি'

খ্যাতি প্রাপ্ত হাস্‌সান বিন সাবিত-এর যোগ্য উত্তরাধীকারী বলে আখ্যায়িত করা যায়। কবি মোশাররফ হোসেন খানও এই আলোকিত ধারার এক নবীন উত্তরসূরী। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল– আশির দশকের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ কবিই এই ধারার অনুসারী। এদের মধ্যে বিশেষভাবে যাদের নাম উল্লেখ করা যায়, তারা হলেন ঃ আব্দুল হালীম খাঁ, আব্দুল হাই শিকদার, মতিউর রহমান মল্লিক, হাসান আলীম, সোলায়মান আহসান, আসাদ বিন হাফিজ, মুকুল চৌধুরী, আহমদ আখতার, তমিজউদ্দিন লোদী, বুলবুল সরওয়ার প্রমুখ। এখানে মোশাররফ খানের ঐতিহ্য-চেতনাসমৃদ্ধ কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত হলোঃ

তুমি প্রার্থনা করো
আর পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্য
অলৌকিক পাথর ভেদ করে খুলে দাও
সাহসের সহস্র ঝরণা
যেন প্রতিটি মুমিনের প্রচণ্ড করাঘাতে খুলে যায়
একেকটি মহাদেশের দুর্ভেদ্য দুর্গ
একেকজন মুমিন যেন হয়ে যায় একেকটি ওহুদ পর্বত
হে রাসূল, আমরা পেতে চাই আর একটি বদর

হে রাসূল, প্রিয়তম রাসূল
একটি বদরের জন্য
একটি চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য
একজন মেহেদী ও ঈসার জন্য
কতকাল! আর কতকাল আমরা অপেক্ষা করবো
হে রাহমাতুল্লিল আলামিন
(রাসূলের প্রতি॥ক্রীতদাসের চোখ)

এখানে মোশাররফ হোসেন ঐতিহ্যকে শুধু ধারণ করেননি, ঐতিহ্যকে জীবন্ত অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানের গ্লানিময় জীবন থেকে মুক্তির জন্য স্বীয় গৌরবময় ঐতিহ্যকে আগামী দিনের অনিবার্য বিপ্লবের অমোঘ হাতিয়ার বানিয়েছেন। ঠিক এ রকমই আরো কিছু লাইন ঃ

বস্তুতঃ এরা কেউ ওমরের ধারালো তরবারিতে বিশ্বাসী নন
... ...
সাফ কথা বলতে আমি জিহাদে বিশ্বাসী
ধরেই নিয়েছি, খন্দকের মতো মরিচা খুঁড়ে যুদ্ধের কলা-কৌশল

রপ্ত করতে হবে এবং বহমান রক্তসাগর থেকে
মৃত লাশ সরিয়ে পবিত্র আবাসটুকু রক্ষা করতে হবে

এই বিশ্বাসে যারা বিশ্বাসী তারা ঈমানের সবর তাজল্যিতে
বুঁদ হয়ে হেরেমের অভ্যন্তরে বেহেশত খোঁজেন না
বরং সাহস এবং বলিষ্ঠ বাহুর জন্য প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করেন
তাছাড়া রণবিদ্যায় অধিক কুশলী হবার জন্যে
ওমরের উগ্রতা হামযার দৃঢ়তা খালিদের যুদ্ধ নিপুণতা এবং
মুহাম্মদের (সা) সৈনিক জীবন থেকে অস্ত্র চালানোর
কলা-কৌশল করায়ত্ত করেন

(আরাধ্য কাফন /ক্রীতদাসের চোখ)

মোশাররফ হোসেন একজন ঐতিহ্যানুসারী বিশ্বাসী কবি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে একজন ধর্ম-কর্ম-বর্ণ-গোত্র-অঞ্চল নির্বিশেষে মানুষের কবি— সেকথাটিও তার কাব্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মূলতঃ একজন প্রকৃত মুসলিম, প্রকৃত মানুষও। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, প্রকৃত মুসলমান না হয়ে প্রকৃত মানুষ হওয়া অসম্ভব। মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই মহান স্রষ্টা তাঁর দ্বীন বা জীবন-বিধান প্রেরণ করেছেন। যারা এই দ্বীন নিষ্ঠার সাথে পালন করেন, তাঁদেরকে মুসলমান বলা হয় এবং তাঁরাই প্রকৃত মানুষও বটে। স্রষ্টার বিধান অনুসরণ না করে যারা অন্য কোন বিধান বা মতাদর্শ অনুসরণ করেন, তাঁরা নিজেদেরকে যতই 'ধর্মনিরপেক্ষ,' 'প্রগতিবাদী,' 'মানবতাবাদী' ইত্যাদি বিশ্লেষণে বিশেষিত করুক না কেন, প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন তাঁদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। যতভাবেই টানা হোক না কেন, সরল রেখা একটাই, অন্যসব রেখাই কম-বেশী বক্র। প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্যও তেমনি স্রষ্টার দেয়া বিধানের কোন বিকল্প নেই। ঐতিহ্যবাদী কবি মোশাররফ হোসেন খান তাই বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়ে দ্ব্যর্থহীন বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন ঃ

আফ্রিকার যে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করা হলো তাদেরও ছিল
রক্ত মাংস হাড় হাড্ডি জীবন এবং যৌবন। আগুন আগুন বলে যে সব
কাফ্রি শিশুরা আজ চোখ ঢাকে মায়ের স্তনে; তারাও স্বাধীনতায় ব্যাকুল
আর যেসব বাস্তুহারা যাযাবর এখনো বন কিংবা সমুদ্রচারী তাদের কাছে
যুদ্ধ ও সংগ্রাম ছাড়া কোন কর্মসূচী নেই।

(সাদা গম্বুজ ॥নেচে ওঠা সমুদ্র)

টিভির পর্দায় ভেসে ওঠা 'রুট্‌সে'র ক্রীতদাস।
ওদের শরীরে দগদগে ক্ষতের স্মারক।
কী ভয়ংকর, কী বীভৎস অসহায় করুণ চাহনি।

হতভাগ্য ক্রীতদাস!

হোক না সে আফ্রিকান কিংবা অন্য যে কোনো দেশের
তবুও ওরা মানুষ। মানুষ এবং আদমের উত্তরাধিকার
ওরা আমার ভাই।
(ক্রীতদাসের চোখ।।ক্রীতদাসের চোখ)

মোশাররফ হোসেন মূলতঃ বিশ্বাসী কবি। তাঁর সবগুলো কাব্যেই এই বিশ্বাসের অন্তরঙ্গতা পরিস্ফুট। বিশেষতঃ তার-'ক্রীতদাসের চোখ' এক্ষেত্রে একটি ক্লাসিক উদাহরণ। বিশ্বাসের প্রাণবন্ত চেতনার সাথে কাব্যিক বাঙময়তার যখন সমন্বয় ঘটে তখন তা যে কী অপরূপ কাব্য-সম্ভারে পরিণত হয় তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো এই কাব্যটি। মোশাররফ খান এখানে সত্যিই অনবদ্য হয়ে উঠেছেন। এখানে কবি হিসাবে তার প্রতিশ্রুতি এবং পরিণতি স্পষ্ট অবলোকন করা যায়। আশা করা যায়, নিবিড় সৃষ্টিমুখর মোশাররফ খান আমাদেরকে আরো অনেক, অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ উপহার দেবেন এবং সঙ্গতভাবেই এটাও আশা করা যায় যে, আরো অনেক ভাল এবং উন্নত মানের কাব্যও তিনি উপহার দেবেন কিন্তু তবু এই কাব্যগ্রন্থটির মূল্য, গুরত্ব ও তাৎপর্যময় বৈশিষ্ট্য কখনো ছোট করে দেখা যাবেনা— তাঁর সমগ্র সাধনার ক্ষেত্রে 'ক্রীতদাসের চোখ' একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিশ্বাসী কবিদের চারটি গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে (সূরা আশ-শুআরা, আয়াত-২২৭)। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

এক. তাঁরা আল্লাহয় বিশ্বাসী বা ঈমানদার
দুই. তাঁরা সৎকর্মশীল
তিন. তাঁরা আল্লাহকে স্মরণকারী
চার. তাঁরা সব রকম শোষণ-জুলুম, অন্যায়-অবিচার ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে সর্বদা উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদী।

আমার ধারণা, মোশাররফ খানের সমগ্র কাব্য-সাধনায় এই চারটি গুণেরই সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। এদিক দিয়ে মোশাররফ হোসেন হাস্‌সান বিন সাবিত, কাব বিন মালিক, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, লাবীদ বিন রাবীয়া প্রমুখ সাহাবা কবি এবং আধুনিক বাংলা কাব্যের কালজয়ী প্রতিভা ফররুখ আহমদের যোগ্য উত্তরসূরী। মোশররফ এক প্রত্যয়দীপ্ত বিশ্বাসী কবি। তাঁর কবিতায় এর সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। কবি তাঁর বিশ্বাসের দাবী হিসাবে প্রচন্ড প্রতিবাদী। সমাজ ও জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে যে ব্যাপক শোষণ, জুলুম, অন্যায়, অবিচার. অনিয়ম, অনাচার চলছে তার বিরুদ্ধে কবির প্রচণ্ড ঘৃণা, প্রতিবাদ, প্রতিরাধ ও দ্রোহ শাণিত কৃপাণের ন্যায় ঝল্‌সে উঠেছে। কবি তার দ্রোহের বহ্নিতে পৃথিবীকে পরিশুদ্ধ ও আলোকোজ্জ্বল করে তুলতে চান। এদিক দিয়ে মোশররফ খান যথার্থই একজন বিদ্রোহী মু'মিন কবি। এখানে তাঁর কবিতা থেকে

কতিপয় উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

একটা সাগর মৈথুনে ফুঁসে উঠছে দেখ প্রতিবাদ সয়লাব
পাহাড় চূর্ণে জ্বলে উঠছে দেখ প্রতিবাদের লাল শিখা
প্রতিটি যুবকের লোমকূপ থেকে নির্গত হচ্ছে দেখ ক্রোধের বারুদ
আর সব ক'টি ক্রোধসঙ্গমে জন্ম নিচ্ছে প্রতিশোধের বুলেট।
(শিকার॥ নেচে ওঠা সমুদ্র)

আমি দেখেছি আমার জীবনকে
শোষকের রাজপ্রাসাদে লাশের মতো

অতঃপর বাঘের মতো

এখন আমার রক্তে তা দেয়
বিদ্রোহ
বিপ্লব
এবং যুদ্ধ
আমার রক্তে এখন '
যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো প্রতিশব্দ নেই।
(আমার রক্তে এখন॥নেচে ওঠা সমুদ্র)

হে অদৃশ্যের মালিক
বসনিয়ার প্রতিটি শহীদের হাড়কে বানিয়ে দাও তুমি
একেকটি লক্ষ্যভেদী কামান
বন্দী শিবিরের প্রতিটি মজলুমের নিঃশ্বাস যেন হয়ে যায়
একেকটি গেনেড
ধর্ষিতা রমণীর প্রতিটি অশ্রুকণা যেন হয়ে যায়
একেকটি এটোম
বসনিয়ার ক্রন্দনরত প্রতিটি অসহায় শিশুকে বানিয়ে দাও তুমি
ধ্বংসের মিসাইল, অদৃশ্যের আবাবিল
(অগ্নিগর্ভা বসনিয়া॥পাথরে পারদ জ্বলে)

চেচনিয়া জ্বলছে!
যদিও তাদের নেই মার্কিন স্টিঙ্গারের মতো ক্ষেপণাস্ত্র।
তবুও তাদের হাতে আছে এমন এক অদৃশ্য অস্ত্র—
যা সহস্র ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়েও হতে পারে ভীষণ ভয়ংকর।
সেই অলৌকিক অত্যাধুনিক অস্ত্রের নাম— বিশ্বাসের দাবানল।

দ্যাখো, চেচনিয়ার সকল উপত্যকা থেকে আজ
জ্বলে উঠছে সেই বিশ্বাসের আগ্নেয়গিরি।
গ্রোজনি এখন সাহসের স্তম্ভ, দ্রোহের স্ফুলিঙ্গ।

চেচিন থেকে– ক্রেমলিন
বাংলাদেশ থেকে— পৃথিবীর শেষ অবধি
যতোদিন না হয় প্রশান্ত—বিশ্বাসের অধিগত
দ্রোহের আগুনে ততোদিন জ্বলতে থাকবে—
পাহাড় সমুদ্র এবং প্রতিটি অজেয় পর্বত।
(চেচনিয়া '৯৫ ॥পাথরে পারদ জ্বলে)

তন্দ্রার আচ্ছাদন ছিঁড়ে এসো আমরা জেগে উঠি।
এসো আমরা গড়ে যাই আর এক পৃথিবী। গড়ে যাই
প্রজন্মের সাহসী তুফান। এ পৃথিবী অনেক প্রাচীন
ঝিনুক আধার। এ পৃথিবী ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে হয়েছে
নিঃশেষ।
(পাথরে পারদ জ্বলে॥ পাথরে পারদ জ্বলে।

আমি তন্দ্রার কাফন ছেড়ে জেগে উঠছি এবং
এভাবে বিস্তারিত হচ্ছি। দু'হাতে ভেঙ্গে যাচ্ছি বিনাশী প্রহর!
আমার চারপাশে বিরুদ্ধ বাতাস।
তবুও দাঁড়িয়ে আছি।
তবুও দাঁড়িয়ে আছি— বিশাল হিমালয়।
তবুও টান টান— অসীম পর্বত।
তবুও ফলবান বৃক্ষ আমি আশ্চর্য পৃথিবী।

চারপাশে বিরুদ্ধ বাতাস। হিংসার দাবদাহ। তবুও
সকল রক্তচক্ষু ভেদ করে
প্রতিকূলের ছাদ ফুঁড়ে
আমার বাহু দু'টি স্পর্শ করেছে
সীমাহীন সীমানা।
এবং দেখ বৈরী হাওয়া, দেখ পৃথিবী—
সকল বিরুদ্ধতার আচ্ছাদন ছিঁড়ে
আমার বিদ্রোহী কেশরাশি
কীভাবে আকাশ ছুঁয়ে যায়।
(পাথরে পারদ জ্বলে ॥ পাথরে পারদ জ্বলে)

হে রাসূল দেখ-
বারুদ থেকে উৎক্ষিপ্ত
তোমার উম্মাতের সর্বশেষ শিশুটিও এখন
শত্রুর সম্মুখে জ্বলন্ত লাভা, অনড় পর্বত
তোমার প্রতিটি যুবকই এখন
কাফেরের জন্য অভ্রান্ত কামান

এবং দেখ
আমাদের মায়েরা কোমল শিশুর পরিবর্তে
প্রসব করছে এখন একেকটি লক্ষ্যভেদী এটোম
পৃথিবীর প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষের এখন
একটিই মাত্র নাম জিহাদ।
(জিহাদ ॥ ক্রীতদাসের চোখ)

এবং আমরা এখন একটি অমীমাংসিত যুদ্ধের টিলায়
সম্মিলিত উল্কাপিন্ড, নক্ষত্রের ঘোড়া।
চেয়ে দেখ, আমাদের দুর্বিনীত মস্তকের চূড়া স্পর্শ করে গেছে
ভোরের সাহসী সূর্য।
ঐ মস্তকগুলো আর পরাজিত হবেনা কখনো।

আমাদের হাতগুলো কঠিন প্রস্তর।
ঐ বিক্ষুব্ধ চোখগুলো দুর্ধর্ষ এটোম।
কী আশ্চর্য!
মানুষ কি হতে পারে মানুষের দাস?
দাসের শৃংখল ভাঙ্গার জন্যই তো আমরা—
আমাদের শাণিত সংগ্রাম।
(ক্রীতদাসের চোখ॥ক্রীতদাসের চোখ)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সূরা নিসার ৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ "তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে সে সব দুর্বল নর-নারী ও শিশুর পক্ষে লড়াই করছো না, যাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে লোকেরা শোষণ, পীড়ন ও অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাচ্ছে?"

মোশাররফ হোসেন আল্লাহর যথার্থ হুকুমবরদার ঈমানদার কবি হিসাবে সকল অন্যায়-অবিচার, শোষণ-জুলুম, অমানবিকতার বিরুদ্ধে এক প্রচন্ড প্রতিবাদী কণ্ঠ। তার প্রতিবাদের ভাষা গোলা-বারুদ-কামানের চেয়েও শক্তিশালী, প্রলয়ংকরী। তিনি প্রকৃত অর্থেই বিদ্রোহী। তবে তার বিদ্রোহী সত্তার মধ্যেও দেখা যায় এক আশ্চর্য সংযম,

বিশ্বাসের অমিত তেজে দীপ্তমান প্রাণাবেগে পূর্ণ মু'মিনের সুস্পষ্ট লক্ষ্যপথে পৌঁছবার সুগভীর আকুতি। কবি কখনো তার আলোকিত বিশ্বাস ও লক্ষ্যের দিগন্ত রেখা থেকে এতটুকু বিচ্যুত হননি। বরং তাঁর প্রতিবাদের ভাষা যত তীব্র হয়েছে, তার বিশ্বাসের দৃঢ়তাও তত দীপ্তিমান হয়েছে। কবির দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীতে যত পাপ, অনাচার, শোষণ-জুলুম, অবিচার- অমানবিকতা তা সবই স্রষ্টার শাশ্বত বিধান অনুসরণ না করার ফলে। এ পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করার জন্য মহান স্রষ্টার ন্যায়ানুগ মানবিক বিধান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু মানুষের শাশ্বত বিধান দুনিয়ায় কখনো আপনা আপনি কায়েম হয় না, তার জন্য প্রয়োজন অজস্র ত্যাগ-তিতীক্ষা, প্রাণান্তকর সংগ্রাম, জীবন দান। সংগ্রামের রক্ত-রঞ্জিত, উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ পথেই যুগে যুগে সাফল্যের দিগন্ত-রেখা উন্মোচিত হয়েছে। এজন্য মু'মিনকে প্রস্তুতি নিতে হয় এবং প্রতি মুহূর্তে জিহাদের জন্য ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করতে হয়, এমন কি শাহাদতের আবেকাওসর পান করার জন্যও সুতীব্র বাসনা জাগ্রত করতে হয়। এই জিহাদ শুধু যুদ্ধের ময়দানে নয়; জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন। কবিদের জিহাদ হলো তাঁদের শানিত কবিতা আর তাঁদের অস্ত্র হলো রক্ত-ঝরা ক্ষুরধার কলম। মহানবী (স) যেমন বলেছেন ঃ "ইন্নাল মু'মেনী ইউযাহেদু বি সাইফিহী ওয়া লিসানিহি"– অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তি তার তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করে,তার কথার দ্বারাও যুদ্ধ করে (মিশকাত শরীফ)। এই হাদীসের শেষাংশে আছে ঃ "যার হাতে আমার প্রাণ-সে মহান সত্তার কসম, তোমরা যে কাব্যাস্ত্র দিয়ে ওদের আঘাত করছো তা তীরের আঘাতের মতোই প্রচণ্ড।" মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস ঃ "যে ব্যক্তি কাফিরদের বিরুদ্ধে ভাষার মাধ্যমে জিহাদ করলো সেই তো মু'মিন।"

ইসলামের কলম-সৈনিক হিসাবে মোশাররফ হোসেন তাঁর শাণিত কাব্যাস্ত্র দিয়ে যথার্থই জিহাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তার হৃদয় প্রকৃত মু'মিনের হৃদয়, কাব্যের খড়গ-কৃপাণ হাতে যথার্থ মুজাহিদের মত তিনি পৃথিবীর যত আগাছা-কুগাছা, অন্যায়-অসত্য, জুলুম-শোষণের মূলোচ্ছেদ করে ঈমানদীপ্ত নতুন আলোকিত পৃথিবী গড়ার সাধনায় নিমগ্ন। পূর্বে আশির দশকের আরো যে কয়জন কবির নামোল্লেখ করেছি, তারাও কম-বেশী এই একই পথের দৃপ্ত অভিযাত্রী। তাই মোশাররফ খান একা নন, তবে তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে দুরন্ত পথে বাধার বিন্ধাচল পেরিয়ে লক্ষ্য পথে উপনীত হতে তাকে আরো দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে।

কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা স্বপ্নাচারী। তাঁরা অনেকটা স্বপ্ন-কল্পনার অধিবাসী। তাঁরা নিজেরা স্বপ্ন দেখেন, অন্যদেরকেও স্বপ্ন দেখান। তাঁদের স্বপ্ন-কল্পনাটাই এক সময় কোন একটা ফর্মে বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। তাই এ জন্য তাঁদেরকে অনেকে বলেন স্বপ্নদ্রষ্টা। মহানবীও (সাঃ) বলেছেন ঃ "ইন্না মিনাশ্‌শিরি হিকমাহ"– অর্থাৎ নিশ্চয়ই অনেক কবিতা হলো হিকমত (হযরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণিত বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লিখিত

হাদীস)। হিকমত হলো এমন একটি জ্ঞান, কৌশল ও অন্তঃদৃষ্টি যা মহান অল্লাহতা'য়ালা সাধারণত তাঁর নবী-রাসূল ও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ প্রিয় বান্দাদেরকে দিয়ে থাকেন। বিশ্বাসী কবিরাও অনেক সময় এই হিকমত রূপ বিশেষ নিয়ামত পেয়ে থাকেন.। সে ক্ষেত্রে তাঁরা যথার্থই স্বপ্নদ্রষ্টা কবি হিসাবে সমাদৃত হন।

মহাকবি ইকবাল ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং বিশেষতঃ উপমহাদেশে মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে যে রূপরেখা দিয়েছিলেন, সে জন্যই তাঁকে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি বলা হয়। নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের পুনঃর্জাগরণের এবং ইংরেজের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে যে স্বাধীনতার দুর্মর স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে জন্যই নজরুল আজ স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসাবে সমাদৃত এবং ফররুখ মুসলিম রেনেসাঁর অমর কবি হিসাবে চির বরণীয়। আজ ইতিহাসের এমন এক ক্রান্তিকাল সমুপস্থিত যখন একমাত্র ইসলাম কায়েমের মাধ্যমেই আমাদের তথা বিশ্বের সকল নির্যাতীত মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি সম্ভব। মোশাররফ খান এবং পূর্বোদ্ধৃত আশির দশকের কবিরা এবং তাঁদেরও আগের আল মাহমুদ, আফজাল চৌধুরী প্রমুখ কবিরা সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। তাঁদের এ স্বপ্ন আরো গাঢ় হোক, একদিন এ স্বপ্ন আপামর মুক্তিকামী সাধারণ মানুষের স্বপ্নে পরিণত হোক, তারপর তা সত্যে পরিণত হোক, স্বচ্ছন্দ-উদার চিত্তে এই প্রত্যাশাই আমরা আজ ব্যক্ত করতে চাই।

কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা সাধারণত সত্য-সুন্দর-কল্যাণের সাধক। মোশাররফ হোসেন খান তেমনি একজন আত্মমগ্ন নিবিষ্ট কবি। তারুণ্যের প্রাণোচ্ছল দীপ্তি তাঁর চোখে-মুখে, সৃষ্টি-মুখরতায় তিনি নিয়ত আনন্দ-চঞ্চল। তাই বাস্তবের দুঃখ-বেদনা, ঘাত-অভিঘাত তাকে আলোড়িত করে। অনুভূতির প্রগাঢ়তায় কখনো তা তাঁর কাব্য-ভাষায় বিদ্যুতের মত চমকে ওঠে। কবির সাধনা— এ দুঃখ-বেদনার একদিন অবসান ঘটবে, বিশ্বাসের আলো দিয়ে নিবিড় তিমিরাবরণ ভেদ করে সত্য-সুন্দর-কল্যাণের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে উঠবে। তাই হতাশার মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ের অভিব্যঞ্জনা তাঁর কাব্যে পরিস্ফুট। ভবিষ্যতে মোশাররফ হোসেন খান বৈচিত্র্যে, দীপ্তিতে, গভীরত্বে, ব্যাপকত্বে আরো অধিক সৃষ্টি-মুখর হয়ে উঠুক, এই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য

অনেক কিছুর মতই সাহিত্যেরও একটি ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। অন্য অর্থে এটাকেই সাহিত্যের ইতিহাস বলে আখ্যায়িত করা হয়। নদী যেমন বাঁকে বাঁকে মোড় নিয়ে পাহাড়-উপত্যকা পেড়িয়ে বিভিন্ন জনপদ, বনজঙ্গল-সমতল বেয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়, সাহিত্যও তেমনি নানা পথ, সমাজের ভাঙ্গা-গড়া, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার উত্তুঙ্গ পথ বেয়ে অনুভূতির আবেগে সিক্ত হয়ে নিজস্ব পথ ও পরিচয় খুঁজে নেয়। সুদূর অতীতকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বিগত পাঁচ-ছয় দশকের প্রবহমান ধারাকে লক্ষ্য করলেই আমাদের সাহিত্যের বিচিত্র পট-পরিবর্তন ও বিভিন্ন প্রভাব ও পরিচিতির বিষয় সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব।

চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন সাহিত্যে জাগরণমূলক চেতনা, নিজস্ব আদর্শ, ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র ভাব-দ্যোতনা সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। দীর্ঘকাল থেকে বিদেশী ইংরেজের শাসন-শোষণ-বঞ্চনা, হিন্দুদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব, ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬ সনে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯১১ সনের বঙ্গভঙ্গ রদ, ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি একের পর এক অসংখ্য ঘটনামালা আমাদের জাতীয় জাগরণের মূলে যেমন কাজ করেছে, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বতন্ত্র ধারা ও স্রোত-প্রবাহ নির্মাণেও তেমনি তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে আমরা এটা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করি যে, হিন্দুদের থেকে সর্বদিক দিয়ে আমরা একটি স্বতন্ত্র, আলাদা জাতি এবং এই প্রবল আত্মোপলব্ধির কারণেই এক স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্র-সত্তা প্রতিষ্ঠার তাগিদে আমরা অর্থাৎ সর্বভারতীয় মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তান সৃষ্টির কাজে সর্বাত্মকভাবে আত্মনিয়োগ করি। এই সময় থেকে আমরা এটাও উপলব্ধি করি যে, এক ভাষা-ভাষী হলেও বাঙালী মুসলমান ও বাঙালী হিন্দুর চিন্তা-চেতনা, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন-সাধনা সবই স্বতন্ত্র এমনকি,

বহুক্ষেত্রে তা সাংঘর্ষিক। ভাষার ক্ষেত্রেও এটা উপলব্ধি করা গেল যে, আমাদের ভাষা-সম্পদ, উপমা, প্রতীক, রূপকের ব্যবহার এমনকি, অভিব্যঞ্জনা ও দ্যোতনার ক্ষেত্রেও তা বহুলাংশে স্বতন্ত্র। এ কারণেই মুসলিম-প্রধান পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ ও হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত। এ সময় যেসকল কবি-সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন এবং আমাদের জাতীয় জাগরণ ও আশা-অভীপ্সার কথা তাঁদের সাহিত্যে রূপায়িত করেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন হলেন ঃ মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৮–১৯১২), মোহাম্মদ কাজেম অল কোরেশী ওরফে কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫১), শেখ আব্দুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), শেখ রেয়াজউদ্দীন আল মাশহাদী (১৮৬০-১৯১৯), মোজাম্মেল হক (নদীয়া) (১৮৬০-১৯৩৩), মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন (১৮৬০-১৯২৩), মুনশী মেহের উল্লাহ (১৮৬১-১৯১৪), মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), মোজাম্মেল হক, (বরিশাল) (১৮৭০-১৯১৮), আব্দুল করীম সাহিত্য-বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), আব্দুল গফুর সিদ্দিকী (১৮৭২-১৯৫৯), মতিউর রহমান খান (১৮৭২-১৯৩৭), মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৭৭-১৯৫৯), রোকেয়া সাখাওত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬), একরাম উদ্দীন (১৮৮২-১৯৩৮), শেখ ফজলুল করীম (১৮৮২-১৯৩৬), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০), মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন (১৮৮৯-১৯৯৪), এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), ডা. লুৎফর রহমান (১৮৯১-১৯৩৭), শাহাদৎ হোসেন (১৮৯২-১৯৫৩), কাজ আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪–১৯৭০), শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪), ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), আবু কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭–১৯৭৮), মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৯৯৮-১৯৭৪), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

উপরোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কেউ কেউ উনবিংশ শতকে সাহিত্য-চর্চা শুরু করলেও তাঁদের অধিকাংশের সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত বিংশ শতকের গোড়ার দিকে। তবে নজরুলের আবির্ভাবের পর থেকে তিনিই ছিলেন এঁদের সকলের মধ্যমণি। শুধু মুসলিম বাংলা সাহিত্যই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে নজরুলের এক বিশেষ অনন্য স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে।

আমাদের জাতীয় জাগরণ, ভাষার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়-ধর্মীয় চেতনার প্রধান উদ্গাতা হলেন নজরুল। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ প্রান্তে তাঁর বর্ণাঢ্য আবির্ভাব। তাঁর লেখার মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়ে যায়। নির্যাতিত, হতভাগ্য মজলুম মানুষের কথা তিনি যেমন বলেছেন, তেমনি

পরাধীনতার জিঞ্জির মুক্ত হওয়ার কথাও তিনি যেভাবে বলেছেন, সেভাবে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ কখনো বলেনি। এভাবে সর্বশ্রেণীর মানুষের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি হতে পেরেছেন তিনি। এছাড়া, আরো যে কয়টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি চিরস্মরণীয় তার মধ্যে মুসলিম নবজাগরণের প্রাণ-প্রবাহ সৃষ্টি ও মুসলমানদের নিজস্ব ভাষার গৌরবময় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। নজরুল ঘুমন্ত, অধঃপতিত মুসলিম জাতির প্রাণে একদিকে নতুন প্রাণের সঞ্চার করলেন, অন্যদিকে তেমনি মুসলমানদের ছয়শো বছরের গৌরবময় ভাষা-সাহিত্যের ঐতিহ্য, শব্দসম্পদ, ভাব, বিষয়, বাগ্‌ধারা ইত্যাদি সবকিছুর আধুনিক রূপায়ণ ঘটালেন।

নজরুল বাংলা সাহিত্যে যে স্বতন্ত্র প্রাণবন্ত ধারার সৃষ্টি করেন, চল্লিশের দশকে সেই ধারার মূল প্রাণ-পুরুষ হলেন ইসলামী রেনেসাঁ ও ঐতিহ্যের কালজয়ী অমর শিল্পী কবি ফররুখ আহমদ। তাঁর সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা এই ধারাকে নানাভাবে উজ্জীবিত ও অব্যাহত রেখেছেন তাঁরা হলেন ঃ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মুজিবুর রহমান খাঁ, কবি বেনজীর আহমদ, বেগম সুফিয়া কামাল, তালিম হোসেন, কবি মোফাখ্‌খারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল হাশেম, মঈনুদ্দীন, শাহেদ আলী, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, আজিজুর রহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। তবে চল্লিশের দশকে আমাদের সাহিত্যের মূলধারার পাশাপাশি আরো দুটি ধারার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ দুটি ধারার একটিকে সমন্বয়বাদী এবং অন্যটিকে সমাজতান্ত্রিক ধারারূপে আখ্যায়িত করা যায়। তবে চল্লিশের প্রবল জাতীয়তাবাদী চেতনা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের উচ্চ কলরোলে এ দুটি ধারার কোনটিই মুসলিম সমাজ-মানসে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি।

সমন্বয়বাদী চিন্তা-চেতনার মূল উদ্ভাবক ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)। ইংরেজী শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাবে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুরা অনেকেই খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। তাই হিন্দু ধর্মকে রক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ প্রথা, নানা কু-প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে উপনিষদের হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয়ে রামমোহন 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে এক নতুন ধর্মমত সৃষ্টি ও তার প্রবর্তন করেন। রামমোহন ও তাঁর সহযোগী উচ্চ শিক্ষিত এবং ধনাঢ্য অনেক হিন্দু এই নতুন সমন্বয়বাদী ধর্মমতের প্রচারে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করার ফলে হিন্দু-সম্প্রদায়ের ব্যাপকভাবে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়া বন্ধ হলেও ব্রাহ্মধর্ম তেমন বিস্তার লাভ করেনি। অন্য ধর্মের লোক দূরে থাক, হিন্দুধর্মের খুব কম সংখ্যক লোকই এই ধর্মমত গ্রহণ করে। তবে হিন্দুধর্মের বিদগ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের চিন্তা-চেতনায় এর অনিবার্য প্রভাব লক্ষণীয়। বরীন্দ্রনাথ

ঠাকুর নিজেও 'এক দেহে লীন' হওয়ার এই সমন্বয়বাদী চিন্তাধারার একজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। কংগ্রেসের একটি বৃহৎ অংশ, যার নেতৃত্বে ছিলেন মোহন চাঁদ করম চাঁদ গান্ধী, এই সমন্বয়বাদী আদর্শ তাদের দলীয় তথা জাতীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ইসলামী আদর্শের কারণে এই সমন্বয়বাদী চিন্তাধারা মুসলিম সমাজে দীর্ঘকাল প্রবেশাধিকার লাভ করেনি। ১৯২৬ সালে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' গঠিত হয়। এই সমিতির মুখ্য লক্ষ্য ছিল রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়বাদী চিন্তা-দর্শন ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা। রামমোহন ছিলেন সমিতির আদর্শ ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর সমন্বয়বাদী চিন্তাধারা ছিল সমিতির মূল লক্ষ্য। কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী আনোয়ারুল কাদির, কাজী মোতাহার হোসেন, আব্দুল কাদির, মোতাহার হোসেন চৌধুরী, দিদারুল আলম, আবুয্‌যোহা নূর মোহাম্মদ প্রমুখ ছিলেন এই সমিতির নেতৃত্বের অগ্রভাগে। ইসলামী আদর্শপুষ্ট মুসলিম সমাজে এই সমন্বয়বাদী চিন্তাধারা তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি। তবে এ সব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হতাশ হয়ে তাঁদের প্রচেষ্টা বন্ধও করেননি। পাকিস্তান আন্দোলন যখন জোরদার হয়ে ওঠে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা যখন অনিবার্য সম্ভাবনার রূপ লাভ করে তখন কংগ্রেসের সহযোগিতায় চল্লিশের দশকে এই সমন্বয়বাদী চিন্তা-চেতনা আবার মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে। সে সময় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে না হলেও সাহিত্যের মূলধারার সাথে এই সমন্বয়বাদী ধারার একটি ক্ষীণ প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়।

চল্লিশের দশকে আর একটি ধারারও ক্ষীণ প্রভাব আমাদের সাহিত্যে পরিলিক্ষিত হয়। সেটা হলো কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের প্রভাব। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবার পর বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের (প্রথমাবস্থায় এটাকে কমিউনিজম হিসাবে প্রচার করা হলেও পরবর্তীতে কৌশলগত কারণে এবং প্রচারের সুবিধার্থে এটাকে সমাজতন্ত্র রূপে আখ্যায়িত করা হয়) চিন্তা-চেতনা বাংলাদেশে প্রবেশাধিকার লাভ করে। কিন্তু নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বাংলার মাটিতে কখনো তেমন একটা সুবিধা করতে পারেনি। তবে কৌশল হিসাবে সমাজতন্ত্রীরা সব সময় সমন্বয়বাদীদের সাথে হাত ধরাধরি করে এবং তাদের প্রশ্রয়ে নিরাপদে পথ চলার প্রয়াস পায়। ফলে চল্লিশের দশকের দিকে তাদের একটা ক্ষীণ প্রভাব আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। এমনকি, এই সময়কার উজ্জ্বলতম কবি-প্রতিভা ফররুখ আহমদও প্রথম জীবনে বামপন্থী আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। অবশ্য এই মানবতা-বিরোধী আদর্শের প্রতি মোহ-মুক্তি ঘটতে তাঁর বিলম্ব ঘটেনি। মোট কথা, চল্লিশের দশকে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ইসলামী আদর্শ-ঐতিহ্যপুষ্ট মূলধারার পাশাপাশি উপরোক্ত দুটি ধারার প্রভাবও আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তার ক্ষেত্রে কম-বেশী লক্ষণীয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কয়েকটি নতুন মাত্রা যোগ হয়। এগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো নিম্নরূপ ঃ

এক– বাঙালী মুসলমানদের কয়েক শো বছরের সাধনার ফসল যাকে 'বটতলার সাহিত্য', 'দোভাষী পুঁথি সাহিত্য', 'মুসলমানী বাংলা সাহিত্য' ইত্যাদি তুচ্ছাত্মক শব্দে বিশেষিত করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অপাংতেয় করে রাখা হয়েছিল এবং সেই সাথে ইংরেজ-আমলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে কলেজের ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের দ্বারা আমাদের সমৃদ্ধ ভাষার ঐতিহ্যকে পর্যন্ত বিকৃত-বিলুপ্ত করা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর আমাদের এই সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

প্রাচীন পুঁথি তথা মুসলমানদের মধ্যযুগীয় সমৃদ্ধ সাহিত্য-সম্পদ আহরণে অপরিসীম সাধনা ও সর্বাধিক অবদান রাখেন সুপণ্ডিত আব্দুল করীম সাহিত্য-বিশারদ। এক্ষেত্রে আরো যাঁদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন ঃ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর গোলাম মকসুদ হিলালী, ডক্টর এনামুল হক, অধ্যাপক আব্দুল হাই, অধ্যাপক আদম উদ্দীন, সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, ডক্টর আহমদ শরীফ, ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, অধ্যাপক আবু তালিব প্রমুখ খ্যাতনামা মনীষী ও গবেষকগণ। পল্লীকবি জসীম উদ্দীন ও ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের কবি-ভাষা, ভাব-কল্পনা ও বর্ণনায় এই ভাষা-সম্পদ প্রাণবন্ত রূপ লাভ করে। ইতোপূর্বে কথা-সাহিত্যে মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের বিভিন্ন জনপ্রিয় উপন্যাসে এই বিশেষ ভাষা-সম্পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অতঃপর যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম-এর যথার্থ সার্থক ব্যবহারে আমাদের নিজস্ব লুপ্ত-প্রায় সমৃদ্ধ ভাষা-সম্পদের ঐশ্বর্য সম্পর্কে আমরা সম্যক অবহিত হই।

দুই– নতুন রাষ্ট্র গঠন ও স্বাধীনতা লাভের উদ্দীপনায় ইসলামী আদর্শ ও ভাব-চেতনা ব্যাপক স্ফূর্তি লাভ করে। এ উদ্দীপনায় তাড়িত হয়ে আমাদের সাহিত্য নির্মাণের তাগিদে এমন কি প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত অস্বীকার করার উদাত্ত আহ্বান ঘোষিত হয়। এতে আমাদের আত্ম-প্রত্যয় ও বিশ্বাসের সাহসী উচ্চারণ গভীর তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। ইতোপূর্বে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির কর্ম-কেন্দ্র ছিল কলকাতা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সে কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় নতুন রাজধানী ঢাকায়। নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, নাট্য-চর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয় ঢাকাকে কেন্দ্র করে। সেই সাথে দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত-অবজ্ঞাত বাংলাদেশের মানুষের জীবনচিত্র, দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-হাসি-কান্না, ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবন-ভাবনা, স্বপ্ন-কল্পনা ইত্যাদি নিয়ে রচিত হয় গল্প-কবিতা, নাটক-নভেল, ছড়া-ব্যঙ্গ এবং আরো বিচিত্র সাহিত্যের নতুন আলোকজ্জ্বল সুদীপ্ত ভুবন। কবিতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক উজ্জ্বল ও উদ্দীপনাপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ফররুখ আহমদ, গোলাম মোস্তফা, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, সুফিয়া কামাল, আহসান হাবীব, সানাউল হক, মোফাখখারুল ইসলাম, আবুল হোসেন, বে-নজীর আহমদ, আবুল হাশেম, মঈনুদ্দীন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আব্দুর রশীদ খান, মোফাখ খারুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার, মতিউল ইসলাম প্রমুখ। কথাশিল্পে আবুল ফজল, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, শাহেদ আলী, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, শওকত ওসমান

প্রমুখ। প্রবন্ধ ও রস-রচনায় মওলানা আকরম খাঁ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, মুজিবুর রহমান খাঁ, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, অধ্যাপক আব্দুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন প্রমুখ। নাটকে নূরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ। ১৯৪৯ সনে ফজলুল হক মুসলিম হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খ্যাতনামা নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখের 'বিরোধ' নাটকটির মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ পরবর্তীকালে যে স্মৃতিচারণ করেন তা থেকেই ঢাকা-কেন্দ্রিক এই নতুন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন-বিকাশের ধারণা লাভ করা যায়। তিনি লিখেছেন ঃ

"হল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে 'বিরোধ' এর নির্বাচন করেছিলেন সর্বজনমান্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর নাকি যুক্তি ছিল ঃ মুসলমান সমাজ নিয়ে মুসলমান রচিত এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটির মঞ্চায়ন প্রয়োজন। এর পরিকল্পনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় পরলোকগত দু' শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সর্বজনাব মুহম্মদ আব্দুল হাই (বাংলা বিভাগ) ও জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা (ইংরেজী বিভাগ)। শেষ পর্যন্ত জনাব মুহম্মদ আব্দুল হাই সাহেব একাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। কার্জন হলে স্টেজ বেঁধে মঞ্চস্থ হচ্ছে 'বিরোধ'। নাট্যারম্ভে হলের প্রভোস্ট ডক্টর আব্দুল হালিম মঞ্চে এসে হাত জোড় করে (আক্ষরিক অর্থেই) দর্শকবৃন্দের কাছে অনুরোধ জানালেন, এই প্রথম মুসলমান সমাজের উপর একজন মুসলমান নাট্যকারের পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে। দর্শকদের চোখ-কানের অভ্যাসে হয়তো বিসদৃশ নাড়া লাগবে। তারা যেনো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি নিয়ে নাট্যাভিনয়ের পুরোটাই দেখে যান। অর্থাৎ বিরক্ত হয়ে চলে না যান।" (আসকার ইবনে শাইখ ঃ বাংলা মঞ্চনাট্যের পশ্চাৎভূমি ঃ সাত রং প্রকাশনী, ঢাকা, একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ পৃ. ৯৬-৯৭)

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা ও লেখক ওবায়দুল হক সরকারের মন্তব্যটিও স্মরণীয় ঃ "মঞ্চ ছিল হিন্দুদের দখলে। মঞ্চে প্রবেশ করতে হলে হিন্দু হয়ে প্রবেশ করতে হতো। মঞ্চে এতোকাল চরিত্রগুলো ধূতি-নামাবলী জড়িয়ে 'জয় মা কালী' বলে এসেছে, দর্শকদের চোখ-কান তাতেই অভ্যস্ত, হঠাৎ করে পায়জামা, পাঞ্জাবী, টুপী পরিহিত চরিত্র দেখলে চোখে ধাক্কা খাওয়ার কথা। আমি ১৯৪৪ সালে পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া শহরে প্রথম মঞ্চে পদার্পণ করি। দেশ ভাগের (১৯৪৭) পূর্বে ও পরেও কিছুকাল ধূতি-নামাবলী জড়িয়ে মঞ্চে উঠে 'দুর্গা' 'দুর্গা' করেছি। আসকার ইবনে শাইখই প্রথম সুযোগ করে দিলেন মুসলমান হয়ে মঞ্চে প্রবেশ করার। নাটক জীবনের প্রতিচ্ছবি, বিশ্বের সর্বত্র সত্য হলেও, এদেশে সত্য ছিল না। এদেশে নাটক দেখলে মনেই হতো না যে দেশে মুসলমান বলে কেউ আছে, মনে হতো দেশবাসীর শতকরা ১০০% ভাগই হিন্দু। বাস্তবে অবশ্য ভিন্ন। অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানদের হার ছিল শতকরা ৫৪% জন, আর বাকী ৪৬% জন ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়। বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কোন ঠাঁই ছিল না সেদিনের দেশীয় নাটকে মুসলমান ছিল

অপাংক্তেয়। আসকার ইবনে শাইখ, নূরুল মোমেন প্রমুখ প্রথম মুসলমান চরিত্রকে বরণ করে নিলেন মঞ্চে।" (মহান বিজয় দিবস ঃ ওবায়দুল হক সরকার ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭)।

এভাবে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর আমাদের নাটক, নাট্য-মঞ্চ, গল্প-উপন্যাস, ছড়া-কবিতা, চিন্তা-মনন প্রভৃতি সব কিছুতেই মুসলমানীত্ব ফিরে এল– এটা ছিল আমাদের জীবন-বাস্তবতার স্বতঃস্ফূর্ত অনিবার্য প্রকাশ। এভাবে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর রাজধানী ঢাকা হলো আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের নতুন কেন্দ্র। বাংলা ভাষারও নতুন কেন্দ্র বা ঠিকানা হলো ঢাকা। ঢাকাকে কেন্দ্র করেই শুরু হলো আমাদের ভাষা-সাহিত্য চর্চার নবযাত্রা।

তিন– পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত। ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। ১৯৪৭ সনের পয়লা সেপ্টেম্বরে গঠিত 'তমদ্দুন মজলিশে'র নেতৃত্বে যে ভাষা-সচেতনতা গড়ে ওঠে ক্রমান্বয়ে তা ভাষা-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। বায়ান্নর ফেব্রুয়ারীতে চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে। ভাষা-আন্দোলনের মূল স্থপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেম। আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্বে ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, আবুল হাশিম, আতাউর রহমান খান, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক গোলাম আযম, শেখ মুজিবুর রহমান, নূরুল হক ভূঁইয়া, শামসুল আলম, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ফররুখ আহমদ, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, আব্দুল লতিফ, কাজী গোলাম মাহবুব, আব্দুর রহমান চৌধুরী, অলি আহাদ, নঈুদ্দিন আহমদ, শাহেদ আলী, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মৌলবী ফরিদ আহমদ, তাজউদ্দিন আহমদ, কমরুদ্দিন আহমদ, আব্দুল গফুর, সানাউল্লাহ নূরী, মোহাম্মদ তোয়াহা, আব্দুল মতীন, গাজীউল হক, ফরমান উল্লাহ খান প্রমুখ।

ভাষা আন্দোলন সর্বশ্রেণীর বাংলাদেশীর সমর্থন লাভ করায় এটা এক অপ্রতিরোধ্য গণ-আন্দোলনের রূপ লাভ করে। ভাষা আন্দোলনই প্রথম আমাদেরকে অধিকার-সচেতন করে তোলে এবং শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, চাকুরী-বাকুরী, দেশরক্ষা, সামরিক, প্রশাসনিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও আত্ম-সচেতনতাবোধের সৃষ্টি হয়। এর সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক রূপরেখা ফুটে ওঠে ২৭শে নভেম্বর, ১৯৪৮ সন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে প্রদত্ত মানপত্রে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা সমগ্র ছাত্র-সমাজের পক্ষ থেকে প্রদত্ত উক্ত মানপত্রের রচয়িতা ছিলেন তৎকালীন সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আবদুর রহমান চৌধুরী (পরে বিচারপতি) এবং অনুষ্ঠানে পাঠ করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে মানপত্রটি অর্পণ করেছিলেন তৎকালীন ডাকসুর

সাধারণ সম্পাদক ছাত্র-নেতা গোলাম আযম (পরে অধ্যাপক)। এই ঐতিহাসিক দলিলে শুধু বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার দাবী নয়; সর্বক্ষেত্রে জনসংখ্যানুপাতে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভাষা আন্দোলনের সফল পরিণতি লাভের পর পরবর্তীকালের সকল জাতীয় আন্দোলন ঐ মানপত্রে বর্ণিত রূপরেখা অনুযায়ীই পরিচালিত হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি, বাঙলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা, বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন, অধ্যক্ষ আবুল কাসেমের উদ্যোগে বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও পরবর্তীকালে জাতীয় পর্যায়ে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, শিক্ষা আন্দোলন, আউয়ুব-বিরোধী আন্দোলন,কপ, পিডিপি, ছয়দফা, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, স্বাধীনতা সংগ্রাম–পর্যায়ক্রমে এ সকল আন্দোলন, সংগ্রাম ঐ রূপরেখারই পরিণত, সময়োচিত ফলশ্রুতি যার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অনিবার্যভাবেই এসব আন্দোলন-সংগ্রামের কম-বেশী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চাশের দশকে বিশেষভাবে এবং পরবর্তীকালেও এটা লক্ষ্য করা যায়।

একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ সারা পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় বিশ/বাইশ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে যার মধ্যে শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ বাংলাদেশের বাসিন্দা। পৃথিবীর ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলার স্থান সপ্তম। সহস্রাধিক বছরের এই পুরাতন সমৃদ্ধ ভাষা পৃথিবীর একটি মাত্র দেশ-অর্থ্যাৎ বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সাথে বাংলাভাষার মর্যাদা,বিকাশ ও সমৃদ্ধির অবিচ্ছদ্য সম্পর্ক। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা আজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ, গৌরবময় পাদপীঠ। সাথে সাথে একথাও স্মর্তব্য যে, পৃথিবীতে আমরা একটি মাত্র জাতি যে তার মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য অনেক ত্যাগ ও সংগ্রাম করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাজা রক্তের বিনিময়ে তার ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে এনেছে। ভাষার জন্য এ মহান আত্মত্যাগের অনন্য স্মৃতির স্মরণে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সনের ডিসেম্বরে সর্বসম্মতভাবে ২০০০ সন থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণা করে। তাই ন্যায্যতই ঢাকা আজ শুধু বাংলাদেশেরই রাজধানী নয়, বাংলা ভাষারও রাজধানী। ঢাকাকে কেন্দ্র করেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা স্ফূর্তি লাভ করবে এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ভবিষ্যত সম্ভাবনাও ঢাকাকে কেন্দ্র করেই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে।

প্রথমাবস্থায় ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন পূর্বোক্ত মূলধারার অগ্রবর্তী ব্যক্তিগণ। পরবর্তীতে এ আন্দোলন ব্যাপক গণ-ভিত্তি লাভ করার সাথে সাথে সর্বশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ এতে সামিল হয়। ফলে সমন্বয়বাদী ও সমাজতন্ত্রীগণও এগিয়ে আসেন এবং ক্রমান্বয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, মূলধারার ব্যক্তিগণ এক সময় অবহেলিত-অবজ্ঞাত হতে থাকে, পরবর্তীতে উড়ে এসে জুড়ে বসা লোকেরাই এর সকল কৃতিত্ব ও সুফল ভোগ করতে থাকে। সেই সুবাদে সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনেও মধ্য-

পঞ্চাশ থেকে সমন্বয়বাদীগণ এবং তাদের ছত্র-ছায়ায় সমাজতন্ত্রীগণ বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে। যে হিন্দু-কংগ্রেস প্রথম থেকেই মুসলমানদের স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চরম বিরোধিতা করে এসেছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে তারা মনে-প্রাণে কখনো মেনে নিতে পারেনি। তাই সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানের মূলভিত্তি মুসলমানদের আদর্শ, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার বিরুদ্ধে তারা সূক্ষ্ম, সুচতুর ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ ষড়যন্ত্রের পাতানো ফাঁদে পা দেয় অনেকে, কেউ জেনে, কেউ না জেনে। তাই সমন্বয়বাদীরা এ সময় থেকে আমাদের জাতীয় তথা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে, সমন্বয়বাদীদের দোসর সমাজতন্ত্রীরা সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের আদর্শিক দ্বন্দ্ব ও নেতৃত্বের কোন্দলের কারণে দ্বিধা-বিভক্ত ও দুই শিবিরে ভাগ হয়ে পড়ে। বিভক্ত হলেও তদের স্ব স্ব উৎসমূল থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পাওয়ায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে তারা কাজ শুরু করে। ফলে মধ্য-পঞ্চাশ থেকে তারা আমাদের জাতীয় জীবনে তেমন একটি স্থান করে নিতে সক্ষম না হলেও আমাদের সহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে করতে সক্ষম হয়। এভাবে মধ্য-পঞ্চাশ থেকে মূলধারার পাশাপাশি সমন্বয়বাদী তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং সমাজতন্ত্রীগণ পাশাপাশি কাজ করতে থাকে।

ষাটের দশকে আমাদের সাহিত্যে পাশ্চাত্যের বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যের এবং আমাদের সংস্কৃতি-চিন্তায় পাশ্চাত্যের বিশেষতঃ আমেরিকার এ্যাংরি ইয়ংম্যান ও কাউবয় সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভাব আসে সাধারণতঃ আঙ্গিক শিল্প-রীতি ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে। একদল তরুণ কবি-সাহিত্যিক এ সময় আমাদের সনাতন সাহিত্য-ধারা, শিল্প-রীতি ও চিন্তা-চেতনায় একটি পরিবর্তন ও নতুনত্ব নিয়ে আসার প্রয়াসে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এটাকে স্বভাব-প্রকরণে অনেকটা তিরিশের অনুবর্তন বলা যায়, তবে এটাকে তিরিশের হুবহু অনুসরণ বলা হয়তো ঠিক হবে না। তিন দশকের ব্যবধানে চিন্তা-চেতনা, অভিজ্ঞতা-অভিব্যঞ্জনা ও পরিবেশগত অনেক পরিবর্তন ইতোমধ্যেই সাধিত হয়েছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ সময়ে নতুন মাত্রা যোগ হয় যা মূলতঃ বস্তুগত চিন্তা-চেতনা ও অনেকটা হতাশা থেকে উদ্ভূত। পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে যে নব জীবন, সুখী-সুন্দর, ভবিষ্যত গঠনের প্রত্যাশা ও স্বপ্ন-কল্পনা ছিল, আদর্শহীন, নৈতিকতাবিবর্জিত, স্বার্থপর, নেতৃত্বের কারণে অচিরেই তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তাই সকলের মধ্যেই বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে তা এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, হতাশা ও বিভ্রান্তির শিকার হয় তারা অনেকেই। হতাশা থেকে আসে অবক্ষয়, মূল্যবোধের নিদারুণ সংকট। ষাটের দশকের সাহিত্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্য-পঞ্চাশ থেকে শুরু করে পুরো ষাটের দশকে অনেক তরুণ লেখকের মধ্যেই এই অবক্ষয়, মূল্যবোধের সংকট ও পাশ্চাত্যের প্রভাবে অশ্লীলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

ষাটের দশকে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আর একটি মাত্রা যোগ হয়। প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এর উদ্ভব। ১৯৬০ সনে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী

উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে সমন্বয়বাদীরা রবীন্দ্র-প্রশস্তি ও রবীন্দ্র-স্তব-স্তুতির এক অভূতপূর্ব প্রবণতা প্রদর্শন করে এমন কি, রবীন্দ্রনাথকে তারা 'আমাদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ' বলে দাবী করে। এতে ইসলামী আদর্শ-ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সচেতন মহল স্বভাবতই প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। তারা রবীন্দ্রনাথকে বড় কবি, এমনকি, বংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে মর্যাদা দানে দ্বিধা না করলেও বেদ-উপনিষদের দর্শনে প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সহস্রাধিক বছরের লালিত গৌরবান্বিত ঐতিহ্য-সংস্কৃতির অবিচ্ছদ্য অংশ হিসাবে মানতে রাজী নয়। এ মতদ্বৈধতার কারণে ষাটের দশকের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চিন্তায় দুটি সুস্পষ্ট ধারা সৃষ্টি হয়। মজার ব্যাপার হলো, এ সময় সমাজতন্ত্রীরা এ বিষয়কে কেন্দ্র করে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের বেশীর ভাগ রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদীদের অনুগত দোসর মনে করলেও এদের একটি ক্ষুদ্র অংশ সমন্বয়বাদীদের সপক্ষে অবস্থান নেয়। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ দ্বন্দ্ব চলে একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত। এ দ্বন্দ্বের এখনো অবসান ঘটেছে বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ইতিহাসের এক অতি স্মরণীয় ও গুরত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অনিবার্য পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ও তৎকালীন পাকিস্তানী হঠকারী রাজনৈতিক-সামরিক নেতৃত্বের অবিমৃশ্যকারী ভূমিকার কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের উপর আকস্মিক বর্বরোচিতভাবে আপতিত হলেও স্বাধীনতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাংক্ষা আমাদের চেতনায় স্ফূরিত হয়ে ওঠে অনেক আগে থেকেই। একথা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের আকাংক্ষা প্রমূর্ত হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সনের ২৭শে নভেম্বর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রদত্ত মানপত্রে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। উক্ত মানপত্রে বর্ণিত রূপরেখা অনুযায়ী পরবর্তীকালের সকল আন্দোলন পরিচালিত এবং তারই চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়। বিগত দশকগুলোতে আমাদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও ইতিহাসের গতিধারা এ রূপরেখা অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছে।

দীর্ঘ নয় মাস রক্তাক্ত সংগ্রামের পর ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতার নতুন সূর্য উদিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নৈতিক, সামরিক, বস্তুগত ও অন্যান্য সহযোগিতা থাকার কারণে সাময়িকভাবে হলেও সমন্বয়বাদীরা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করে। সে সুযোগে তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের একটি পুরনো গানকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত করে। আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও এ সময় সমন্বয়বাদী ধর্মনিরপেক্ষ তথা ইসলাম-বিরোধী ভাবধারা প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে। গণতন্ত্রহীন, একদলীয় একনায়কত্বের কবলে স্বাধীন, সুস্থ চিন্তা-চেতনা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ রহিত

হয়। ফলে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এ সময় মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনী ওসমানী বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর এম.এ. জলিল প্রমূখের সাহসী কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী চেতনার মূলে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে।

পঁচাত্তরের আগষ্ট বিপ্লব ও সাতই নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লব জাতীয় চৈতন্যকে এক প্রত্যয়ী ও ইতিবাচক ভাবধারায় নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করে। শাসনতন্ত্র সংশোধন করে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে 'বিসমিল্লাহ', 'আল্লাহর সার্বভৌমত্ব' ইত্যাদি ইতিবাচক জাতীয় আদর্শ ও বিশ্বাসের কথা সংযোজিত এবং একদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হওয়ায় জাতীয় চিন্তা-চেতনায় নতুনভাবে সুস্পষ্ট ইতিবাচক মাত্রা যোগ হয়। এর কিছু পরে শাসনতন্ত্র আবার সংশোধন করে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করা হয়। সত্তর ও আশির দশকে আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই এ সবের শুভ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ফলে সত্তর দশকের শেষ দিক থেকে, বিশেষ করে আশির দশকে সাহিত্য-সৃষ্টিতে এক স্বচ্ছ জোয়ার সৃষ্টি হয়। জাতীয় ক্রান্তি কালে মূল্যবোধের অবক্ষয় তথা জাতীয় মূলধারার বিলুপ্তির যে আশংকা দেখা দিয়েছিল, তা অনেকটা বিদূরীত হয়। ফলে সমন্বয়বাদী সবল ধারার পাশাপাশি এ সময় একদল আদর্শবাদী, ঐতিহ্য-সচেতন কবি-সাহিত্যিকের প্রতিশ্রুতিময় আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেনঃ খোন্দকা আশরাফ হোসেন, আশরাফ আল দীন, আব্দুল হাই শিকদার, মতিউর রহমান মল্লিক, হাসান আলীম, কামাল মাহমুদ, মোশাররফ হোসেন খান, আব্দুল হালিম খাঁ, মুকুল চৌধুরী, সোলায়মান আহসান, তমিজ উদ্দীন লোদী, ফরিদ কবির, রেজাউদ্দিন স্টালিন, বুলবুল সরওয়ার, খসরু পারভেজ, আসাদ বিন হাফিজ, মসউদ-উশ-শহীদ, আহমদ আখতার, আহমদ মতিউর রহমান, গোলাম মোহাম্মদ প্রমুখ। কুয়াষার কালো মেঘ কেটে কেটে তাদের অভ্রভেদী অভিযাত্রা অব্যাহত থাকে নব্বুইয়ের দশকেও এবং একুশ শতকের শুরুতেও তাদের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে, নতুন আশা, উৎসাহ ও প্রত্যাশায় তা আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে।

ইতোমধ্যে আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়। নব্বুই দশকের শুরুতে কমিউনিজমের জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়াসহ সমগ্র পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের আকস্মিক পতন ও ক্ষুদ্র, নিরস্ত্র আফগান মুজাহিদদের হাতে সোভিয়েত রাশিয়ার পরাজয়ে ও আফগানিস্তান থেকে তাদের অবমাননাকর পশ্চাৎপসরণ ও সোভিয়েত রাশিয়ার বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আমাদের দেশেও সমাজতন্ত্রীদের স্বপ্ন-সাধ ভেঙ্গে চুরমার হয় এবং তারা বিভিন্ন শক্তি-শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের অধিকাংশ সমন্বয়বাদীদের দলে যোগ দেয় অথবা ধর্মনিরপেক্ষ ব্রাহ্মণ্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত হয়। মূলতঃ ইসলামের বিরোধিতার জন্য তারা যে কোন আদর্শ ও সুবিধাবাদী চক্রে যোগদানে দ্বিধাহীন। তাদের নিজেদের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে হতাশ হবার ফলে বিভিন্ন সময়

বিভিন্ন সরকারের ছত্রছায়ায় তাদের ইসলাম-বিরোধী ভূমিকা বিভিন্নভাবে বিশেষতঃ সাহিত্য-সংস্কৃতি-সাংবাদিকতা, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-যুবকদের মধ্যে তারা অব্যাহত রাখার প্রয়াস পায়। এ নেতিবাচক, বিদ্বিষ্ট ভূমিকা আমাদের সমাজে, বিশেষভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্পষ্ট বিভাজন, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি সংশয় সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

নব্বই দশকে মূলধারা, সমন্বয়বাদী ধারা এবং সে সাথে বর্ণচোরা বামপন্থী সমাজতন্ত্রী ধারা আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নব্বই দশকের শুরু থেকেই একটি নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের কালো মেঘ আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রকে দারুণভাবে কলুষিত ও বিভ্রান্ত করে তোলে। এ জন্য প্রধানত দায়ী আদর্শহীন, লক্ষ্যহীন, দূরদৃষ্টিহীন ব্যর্থ রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এরা জতীয়তাবাদের দোহাই দিলেও জাতীয় আদর্শ, জাতীয় চেতনা ও ভাবধারা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন অথবা অজ্ঞ। ফলে নব্বই দশকের প্রথম থেকেই তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সরকারের ছত্রছায়ায়, কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যক্ষ মদদে হঠাৎ করে বিজাতীয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট হয়ে অসংখ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদর্শহীন নৈরাজ্য সৃষ্টির ব্যাপক প্রয়াসে লিপ্ত হয়। রেডিও, টিভি , নাট্যমঞ্চ, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, শিক্ষাঙ্গন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী, শিক্ষাবিদ, কবি-সাহিত্যিক সুকৌশলে আমাদের আদর্শ-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালায়।

এছাড়া, জাতীয় আদর্শ-ঐতিহ্য-ভিত্তিক সুস্থ মানবতাবাদী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরো যেসব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তার মধ্যে অশ্লীল, অনৈতিক সাহিত্যের সয়লাব, সীমান্তের ওপার থেকে বাধাহীনভাবে চরিত্র-বিধ্বংসী জাতীয়-চেতনা বিরোধী অসংখ্য সস্তা বই এসে বাজার ছেয়ে ফেলে। এ বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন আমাদের মনন ও চেতনাকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। উপরন্তু, আমাদের কাগজ-শিল্পে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে, কাগজের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি করে প্রকাশনা শিল্পকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করা হয়, কাগজ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিদেশের উপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়। প্রকাশনার ক্ষেত্রে সৃষ্ট কৃত্রিম সংকটের কারণে আমাদের কবি-সহিত্যিকগণ লেখার উৎসাহ হারিয়ে বসেন। সাহিত্য-চর্চায় বিঘ্ন ঘটে এবং পাঠকগণ কলকাতার সহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে। কলকাতার লেখক–প্রকাশকগণ সর্বোতোভাবে এ সুযোগ লুফে নেয়।

এ অসুস্থ, নৈরাজ্যকর, সংকটকালে পশ্চিমা রুশদীর মত এখানেও তসলিমা নাসরিনদের আবির্ভাব ঘটে। তবে কথা আছে, 'ইসলাম জিন্দা হোতা হায় হর্ কারবালা কি বাদ'। তাই তসলিমা নাসরিন ও একদল কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধজীবী-সাংবাদিক যখন দেশী-বিদেশী কিছু সংখ্যক পত্রিকায় ও লেখায় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মহলের উস্কানী ও মদদে নবী-রাসূল-আযান ও ইসলামী আক্বিদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানতে

থাকে তখন বাংলাদেশের আপামর তৌহিদী জনতা গর্জে ওঠে। এভাবে জমাট কুয়াষার কালো ছায়া কিছুটা অপসৃত হয়।

এরপর আসে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন। সনাতন সমন্বয়বাদী এবং স্বাধীনতার পরবর্তী একনাকয়ত্ববাদীরা সাহিত্য-সংস্কৃতি, পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টিভি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তারে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত। তারা ক্ষমাতাসীন হবার পর থেকেই সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নানাবিধ সভা-সেমিনারের নামে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক শিল্পী ভাড়া করে এনে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-চর্চার কেন্দ্রগুলোকে বিজাতীয় ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনায় কলুষিত করে তোলে। মঙ্গল প্রদীপ, উলু ধ্বনি, শিখা প্রজ্জ্বালন ইত্যাদি বিজাতীয় সংস্কৃতির চর্চার দ্বারা আমাদের সহস্র বছরের লালিত, গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতির পবিত্র অঙ্গনকে পাপবিদ্ধ করে। দেড় হাজার বছর পূর্বে জাহিলিয়াতের যুগে যে পৌত্তলিক মুশরিকী সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে মুসলমানগণ এক আলোকোজ্জ্বল, উন্নত সংস্কৃতির দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে চমৎকৃত করে দিয়েছিল এবং এক সুখী, সুন্দর, শান্তিপূর্ণ কল্যাণময় সমাজ গড়ে তুলেছিল, যা আজো সমগ্র বিশ্বের জন্য দীপ্ত অনুপ্রেরণা স্বরূপ। আধুনিক জহিলিয়াতের ধ্বজাধারীগণ সেই একই পৌত্তলিক-মুশরিকী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন দ্বারা আমাদের ঈমান-আক্বীদা ও আলোকিত সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনষ্ট করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এ অপসংস্কৃতির আগ্রাসন যে কোন উপায়ে সর্বশক্তি দিয়ে রুখতে মূলধারার সচেতন ব্যক্তিরা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তারই ফলে একবিংশ শতকের উষা-লগ্নে আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়। এক বিংশ শতকের সূচনা লগ্নে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

একটি বিষয় সংশ্লিষ্ট সকলকে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে যে, আদর্শ-ঐতিহ্যহীন কোন জাতি কখনো আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এক সময় অর্থহীন বিবেচিত হয় যদি তার পেছনে আদর্শিক ভিৎ ও ঐতিহ্যিক চেতনা সুদৃঢ় না থাকে। ইংরেজ আমলে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলেও আমাদের আদর্শিক ও ঐতিহ্যিক স্বাতন্ত্র্যের কারণে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য বা পরিচয় ছিল এবং সে কারণেই 'পাকিস্তান' নামে মুসলমানদের স্বতন্ত্র, সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ কথা অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত না হলে 'বাংলাদেশ' নামের স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনো প্রতিষ্ঠিত হতো না । অবশ্য একথাও সত্য যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু কংগ্রেস এবং তাদের দোসর বেনিয়া ইংরেজদের যৌথ ষড়যন্ত্রের কারণে আমরা খণ্ডিত বাংলাদেশ পেয়েছি। নতুবা ন্যায়সঙ্গতভাবে কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম নিয়ে তৎকালীন ভারতের পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার কথা ছিল।

এখন যারা আমাদের সুস্পষ্ট জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র আদর্শ-ঐতিহ্যিক পরিচয়কে মুছে ফেলতে চায় তারা মূলতঃ আমাদের স্বধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে জ্ঞাতে অথবা

অজ্ঞাতে কাজ করে চলছে। গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢেলে গাছের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়াস অর্থহীন বাতুলতা মাত্র। এ মৌলিক বিষয়টি সকলকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে। স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার প্রত্যেকের মৌলিক নাগরিক অধিকার। কিন্তু জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে ভিন্ন মতের অবকাশ নেই। কোন রাষ্ট্র সে যত সভ্য, গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারের প্রবক্তাই হোক না কেন, এ ধরনের ভিন্ন মত প্রকাশের আত্মঘাতি অধিকার কখনো কাউকে দেয় না।

একটি দেশের যেমন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা থাকে, তেমনি থাকে একটি আদর্শিক ভিত্তি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক মূল্যবোধ ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক জীবন-প্রবাহ। এগুলোর যথাযথ বিকাশ ও পরিচর্যার মাধ্যমেই জাতীয়-ভিত্তি পরিপুষ্ট হয়, জাতির আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা সুদৃঢ় হয়। বিশেষতঃ সাহিত্যের মধ্যে যেমন ব্যক্তি-জীবনের প্রতিফলন ঘটে তেমনি জাতীয় আশা-আকাংক্ষা-উদ্দীপনা ও ভাব-মূর্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই সাহিত্যে আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় প্রত্যাশার প্রতিফলন একান্ত বাঞ্ছনীয়, বিদেশী-বিজাতীয় ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত জাতীয় ভাবধারাপুষ্ট সাহিত্য সৃষ্টিতে কবি-সাহিত্যিকদের সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা অত্যাবশ্যক।

অতএব, এই মৌলিক বিষয়ে সকলকে অবশ্যই একমত হতে হবে। আমাদের জাতীয় আদর্শ ইসলাম, আমাদের স্বতন্ত্র ইতিহাস-সভ্যতা, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনৈতিক অধিকার ও সার্বভৌমত্ব এ আদর্শের ভিত্তিতেই নির্মিত ও স্থাপিত সে ব্যাপারে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশও নেই। তাই আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলন, চর্চা ও বিকাশ এ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত।

সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান অবলম্বন ভাষা। ভাষার ক্ষেত্রেও আমাদের সমৃদ্ধ, স্বতন্ত্র, উজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। সে ঐতিহ্যের লালন ও অনুসরণ করে আমাদের নিজস্ব ভাষা-সাহিত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে একবিংশ শতকের কবি-সাহিত্যিকেরা দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করা যায়।

"বাংলাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পর সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এক ব্যাপক ও সর্বাত্মক পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম শাসনামলে বাঙালীরা ধর্মের ক্ষেত্রে পেল অসংখ্য জাতি-ভেদ বিশিষ্ট, মানুষের মনগড়া প্রথা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম বা ধর্মসমূহের পরিবর্তে স্রষ্টার মনোনীত এক উন্নত সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিপূর্ণ মানবিক ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম। সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তারা পেল ইসলামের সাম্য, শান্তি, ন্যায়নীতি ও সকল প্রকার অন্যায়, পাপাচারমুক্ত এক কল্যাণময় সমাজ, যেখানে মানুষ একমাত্র তার মহান স্রষ্টার গোলাম, অন্য কারো নয়। এভাবে, মানুষের এক অসাধারণ মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। সংস্কৃতি বলতে আগে যেখানে ছিল অশ্লীল গান-বাজনা, অবাধ যৌন-সম্ভোগ ও কামোত্তেজনাকারী নানাবিধ কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং নীতি-নৈতিকতাবিবর্জিত আচার-অনুষ্ঠান সেখানে তার পরিবর্তে ইসলাম নিয়ে এল স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস, পরকালের প্রতি আস্থাপূর্ণ এক পরিচ্ছন্ন, নির্মল, সুরুচিপূর্ণ সুষ্ঠু জীবনাচারবিশিষ্ট উন্নত মানবিক সংস্কৃতি যার স্পর্শে সমগ্র জীবনায়নে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সংঘটিত হলো।"

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
রফিকুল্লাহ গাজালী